রহিম-ই-ইয়ার-এর আজান

অরিজিৎ সিংহ

রহিম-ই-ইয়ার-এর আজান

পরিবেশক
সান্যাল এণ্ড কোম্পানী
১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মৃত্যুঞ্জয় সেন কর্তৃক মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, বারুইপুর, ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত ও উত্তম দাশ কর্তৃক মহাদিগন্ত মুদ্রণী, বারুইপুর, ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ লেখক, প্রচ্ছদশিল্পী অরুণকুমার বসু

উৎসর্গ :

সর্বসুখবঞ্চিতা, চিরদুঃখিনী, মমতা-
ময়ী এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী আমার মা-কে

লেখক

কৃতজ্ঞতা

শত ব্যস্ততার মাঝখানে অতি যত্নসহ এই বইখানির সম্পাদনা এবং আনুষঙ্গিক সকল প্রকার যোগাযোগ করে প্রভূত সাহায্য করেছেন আমার অগ্রজপ্রতিম পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁর আন্তরিক উৎসাহই আমাকে এ গ্রন্থ প্রকাশে প্রলুব্ধ করেছে।

*

আর যিনি পরম আত্মীয়ার মত এই বইখানি মুদ্রণের সকল দায়িত্ব নিজের কাঁধে চাপিয়ে এ কার্য সুসম্পন্ন করলেন তিনি কবিপত্নী শ্রীমতী মালবিকা দাশ। এই বিদ্যুৎ-ছাঁটাই-এর দিনে 'মহাদিগন্ত' অসাধ্য সাধন করেছে।

লেখক

কৈফিয়ৎ

স্মৃতিতে ধরে রাখার মত দৃষ্টি যখন পেলাম। তখন সবকিছু মনের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। বয়সও অবশ্য নেহাৎ-ই ছিল কম। আর তাছাড়া তার প্রয়োজনও ছিল না। কারণ, ছিল না হারিয়ে ফেলার ভয়।

রাহুল-প্রতাপ পরগণা! যতটুকু মনে পড়ে সেখানে একটা বিশাল স্বপ্ন-সৌধ ছিল। যার উত্তরে গগনভেদী সুরূপ সোমেশ্বর-শৃঙ্গ। ঘন নীল। তারই নীচে উত্তাল তরঙ্গ, পর্বতমালার তিনদিক ব্যাপী সবুজ দিগন্ত। এরই মাঝে পথ করে করে দক্ষিণে প্রসারী সোমেশ্বর-দুহিতা, গুণেশ্বরী। শীতে শঙ্খিনী-শীর্ণকায় কিন্তু স্রোতস্বিনী, খরতমা। বর্ষায় উদ্ধতযৌবনা বন্যার তাথৈ নৃত্যে মাতোয়ারা, ভীষণা!

তবু গুণেশ্বরীর কুলুকুলু ডাক, বকুলতলার ঘাট, কাঁকন-গাছের ঝোপ, দিগন্ত বিস্তৃত বালিয়াড়ী মনটাকে কোথায় উধাও করে নিয়ে যায়। অন্যদিকে যতদূর চোখ যায়, সবুজ বনানীর ফাঁকে ফাঁকে হরিৎ শষ্য ক্ষেত্র। উত্তুরে হাওয়ায় অপক্ক ধান্য ভারে অবনত—ঈষৎ আন্দোলিত। সর্বত্র শুধু সৌন্দর্য, শুধু রূপ। আকাশে প্রকৃতিতে। বর্ষার কালো মেঘে, শরতের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে, কিম্বা হেমন্তের শিশিরে।

কত প্রশ্ন জাগত মনে! নিজেই তার মনগড়া জবাব করতাম। সমবয়েসের আরও একটি পুরুষ বন্ধুর অভাবে, সময়টা মোটামুটি একাই কাটত। স্বপ্ন-পুরীর আনাচে-কানাচে কী যে রহস্য লুকিয়ে থাকত, তারই খোঁজে সদাই ব্যস্ত থাকতাম। রহস্যটা আজও অজানাই থেকে গেছে। শুধু একজন আমার সব প্রশ্নের জবাব দিতে সদাই প্রস্তুত থাকতেন। কিন্তু তাঁকে এতো কম সময়ের ভেতর কিছুই বলা হত না। তিনি বেশীর ভাগ সময়টাই থাকতেন বিরাট একটা শহরে দূরে অনেক দূরে। সেখানে এমন স্বপ্নসৌধ নাকি হাজার হাজার আছে। এটা বুঝতাম, এই মানুষটি খুবই সম্মানীয় ব্যক্তি। সবাই বেশ একটা তফাৎ রেখে এঁর সঙ্গে মিশতেন, কথা বলতেন। কলকাতা থেকে বড় বাড়ীর এই জ্যাঠামণি এলেই তাঁর কাছ থেকে কোন এক 'দুরূহ' ব্যাপার-এর মীমাংসা করে নিতে হবে—এই আশায় দিন গুণতাম। জ্যাঠামণি যখন এসে 'আশাবরী'র পিঠ থেকে নামতেন, বাবা এগিয়ে যেতেন। আমি দূর থেকে দেখতাম। সিঁড়িতে তিনটে ধাপে পা দিতেই বাবা ছুটে

১

গিয়ে ও'র পায়ে লুটিয়ে পড়তেন। জ্যাঠামণি নীচু হয়ে বাবাকে বুকে তুলে নিতেন। বাবা আবার নত হতেন; উনি আবার তুলে নিতেন। দু'ভায়ের এই কিছুকাল তফাতে থাকার পর মিলন দৃশ্য দেখতে আমার ভীষণ ভাল লাগত। ও'র বিশ্রামের পর আমি কাছে যাওয়ার অনুমতি পেতাম। আর তারপর মার কাছে ঘুমানো ছাড়া অন্য সময়টা ও'র আশেপাশেই ঘুরতাম। আর চলত আমার প্রশ্নবাণ।

সকালের কাজের পর প্রত্যহ একবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে 'মায়ের বাড়ী' দর্শন করতে যেতেন জ্যাঠামণি। অষ্টধাতুর 'দশভুজা মূর্তি' বহুকাল অন্তর্ধান করেছেন কিন্তু সে ঘরে এখনো তাঁর শূন্য আসনে পূজা, ভোগ সবই দেয়া হয়। এ'র পাশেই ৺লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ। জ্যাঠামণি আমাকে জানিয়েছিলেন এই ৺লক্ষ্মীনারায়ণ-ই আমাদের প্রথম পুরুষ সাতশ' বছর আগে তাঁর গুরুর কাছ থেকে পেয়ে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। পেছনে সাক্ষী অশোকগাছ অশোক মঞ্জরীতে শোভিত। একা কখনো এখানে এলে মনে হত ৺দশভুজার ঘরে কে যেন প্রচণ্ড বিদ্রূপের অট্টহাসিতে ফেটে ফেটে পড়ছে, পেছন থেকে ভেসে আসত অশোক গাছের ভয়াল দীর্ঘশ্বাস। ভয়ে পাশের মন্দিরে চলে যেতাম। সেখানে অনেক শান্তি। এই শিলাখণ্ডটি আমার কত কাছের, কত আপনার জন! এর কাছে সাতশ' বছর ধরে আমার সব কজন পূর্বপুরুষ জানিয়েছেন তাঁদের অন্তরের কথা। এ তাঁদের সবাইকে দেখেছে, কত ঘটনার সাক্ষী, এটা ভাবতেই আশ্চর্য লাগে! এসব ছেড়ে ফেলে দিয়ে, কোন এক শতাব্দীতে আমারই এক পূর্বপুরুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মানুষ যে ঈশ্বরকে কতভাবে পেতে চায় বুঝতে পারি না! সেই থেকে একই রক্তের দু'টি ধারা প্রবাহিত। একে, অন্যের কত কাছের, অথচ, কত দূরেরও!

আরেকজন আমাকে অসম্ভব রকম প্রশ্রয় দিতেন তিনি আমার দাদামশাই। মামাবাড়ীতে বছরের যে ক'টা দিন থাকার অনুমতি মিলত—সে ক'টা দিন সোনার অক্ষরে জ্বলজ্বল করে। এখানে অবাধ স্বাধীনতা। সমবয়সী মামার সাহচর্যে চলতো বিভিন্ন উৎসাহব্যঞ্জক পরিকল্পনা ও তার নিষ্পত্তি। বিরাট সরোবরে সন্তরণরত হংস পরিবার সহ দু'বেলা স্নান, পেছনের বাগানে গিয়ে আনারস বাগানে রাম-রাবণের যুদ্ধের মহড়া—একটা দারুণ উত্তেজনা প্রবাহ। মাঝে মাঝে দুপুরে জোর করে ঘুমাতে যেতে হত দালানের ফরাসে—প্রচণ্ড বকুনির ভয়ে। ক'টা দিন ছুট্ করে পালিয়ে যেত। তারপর আবার বন্দী দশা।

ধীরে ধীরে দেখলাম কলকাতায় যাঁরা থাকতেন তাঁরা আর ভুলেও ওদিক

মাড়ান না। আত্মীয় স্বজনেরা একে একে সবাই চলে গেলেন। বাবা, মা আর বোন ছাড়া এতো বড় বাড়ীটাতে আর কেউ নেই! একজন বুড়িকে জানতাম, সবক'টি ছেলে মরে যাওয়ায় বুক চাপড়ে হা-হা করে কাঁদত, কিন্তু চোখ দিয়ে জল ঝরত না তার। শুকিয়ে গিয়েছে অনেকদিন। খালি বাড়ীটাকেও আমার মনে হ'তো সবাইকে হারিয়ে, ওই বুড়িটার মতই হা-হা করে উঠ্ছে। খাঁ খাঁ করছে হাড়-পাঁজড়া। রঙমহলে ছুঁচো পড়ার শব্দ শোনা যায়। নিঃশব্দে কপাট্ ঠেলে নীচের দরবার ঘরে ঢুকে দেখতাম অশরীরী ছায়া জাফ্‌রিকাটা ভেণ্টিলেটর দিয়ে হাওয়া এসে ঝাড়লণ্ঠনটাকে একটু দুলিয়ে দিয়ে যায়। লম্বা লম্বা আতসকাঁচগুলো টুং-টাং, টুং-টাং শব্দের করুণ মূর্চ্ছনা তোলে। আমার মনে হতো ওরা যেন মাথা নেড়ে আমাকে কেঁদে কেঁদে বলছে 'না, তুমি যেওনা, আমাদের ছেড়ে তুমি চলে যেও না ···'। আমার খুব কষ্ট হত। বাড়ীটার সর্বত্র অভিমান-ভরা মুখের অভিব্যক্তি। প্রতিটি ইঁট-পাথর, আঁকড়ে ধরার জন্য হাত বাড়াচ্ছে। ছুটে পালিয়ে আসতাম ভেতরের মহলে।

একদিন আমাদেরও চলে আসতে হলো সবকিছু ছেড়ে। সব কটা শিকড় উপড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে। অজানার পথে, নিঃস্ব, রিক্ত হৃতসর্বস্ব হয়ে। স্বপ্নপ্রাসাদ ছেড়ে একেবারে শুষ্ক প্রাণহীন মাতৃনেত্রহীন এই আবাল্য চমকানো নাম—কলকাতাতে। উত্তরের বারান্দা দিয়ে পাহাড়ের হাতছানি, গুণেশ্বরীর কূল, ফুলের বাগান, চিরসবুজ বন, সব কোথায় হারিয়ে গেল। আমিও হারিয়ে গেলাম। কর্কশ বাস্তব এসে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তুলল সবাইকে। একে একে সব বিসর্জন গেল। বাবা হারালেন সম্মান, মা তাঁর স্বাস্থ্য আর শেষ সম্পদটুকু। তবে কলকাতা অনেক কিছু শেখাল। দুঃসময় ছাড়া প্রকৃত বন্ধু-পরিচয় ঘটে না। অর্থ যার নেই তার কোন মূল্য নেই এখানে। কোন সামাজিক মর্যাদা পর্যন্ত থাকে না।

আর দেখলাম নতুন একটা জগতের মানুষ। যাদের পরিচালনা 'মস্তিষ্ক' করে না করে কতকগুলি রাজনীতিবিদ্! এদের কোন সত্তা নেই, আছে ঝাণ্ডার রঙ্। অকাতরে বুলেট্ খেয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। কেন মরল সেটা না বুঝেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এদের কাছের থেকে, দূরের থেকে খুব লক্ষ্য করতাম। আর তাই, যখন লিখতে বসলাম, তখন কিছুতেই এই প্রতিবেশীদের ফেলে দিতে পারলাম না। গুণেশ্বরী নদী, সোমেশ্বর শৃঙ্গ, ঝাড়লণ্ঠনের নিশ্চুপ কান্না, কিছুই ভাষায় এলো না আমার। যাদের দেখলাম, যাদের বুঝলাম, আর যাদের আজও চিনিনি শুধু তাদের কথাতেই আমার খাতাটার কলেবর বৃদ্ধি হতে থাকল।

ছোটবেলায় মা আমাকে একটা ছোট নোটবই দিয়েছিলেন। তার প্রথম পাতায় একছত্র কবিতাও লিখে দিয়েছিলেন। সেটা আমার আজও মনে আছে—

'দিলাম আনি এ-খাতাখানি
খোকন সোনার ছোট্ট হাতে
মুক্তার মত আখর যত
সাজিয়ে দিও সকল পাতে।'

মুক্তার মত আখর কিছুতেই হলো না। তবে পাতার পর পাতা এখনো সাজিয়েই চলছি।

বাবা রবীন্দ্রনাথ থেকে আবৃত্তি করতেন। 'দেবতার গ্রাস' শুনতে শুনতে চোখের কোণায় জল চলে আসত। আজকাল আর অত সহজে চোখে জল আসে না। কতক-কতক অনুভূতিগুলো কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে। চারপাশের সবাইকে দেখি, কেমন কথাগুলো উল্টো করে অর্থ করে। সোজা কথাটাকে কিছুতেই সোজা রাখতে চায় না। কেন ? মানুষের মনগুলো কি দিনকে দিন পাল্টে যাচ্ছে ? কিছুতেই একটা স্থির পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। না চিন্তার, না চলার। এটাই আশ্চর্য্য !

অন্যকথায় চলে গেলাম। যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা একটা কৈফিয়ৎ। পাঠককে এ কৈফিয়ৎ দেয়াটা কর্ত্তব্য মনে করি। গেল দশকের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ বাংলার কিছু কিছু ঘরে যে চিত্র দেখা গেছে এটা তারই একটা ধারাবিবরণী। বাংলা বলতে পশ্চিম-বাংলা বলছি। আর ঘর বলতে সেই সব ভাঙাঘরের অধিবাসীদের কথা জানাচ্ছি যাদের একদিন সব ছিল ওপার বাংলায়। যাদের এখন সবকিছুই নতুন করে শুরু করতে হয়েছে। যে জীবন-যাত্রার কোন পশ্চাৎ-উপস্থাপনা নেই। তিরিশ বছরের মাথায় এসে, হাত পেতে, যে সহানুভূতি নিতে হয়েছে, তা যদি ক'টা দিন আগেও পাওয়া যেত ! কত পরিবার কোন অতলে হারিয়ে গেল ! তারা এসে ভিক্ষা-পাত্র নিয়ে আর দাঁড়াল না। অসম্মানের বোঝা নিয়ে নিঃশেষ করে ফেলল নিজেদের ! তবু 'আত্মসম্মানে' ভরা শেষ ক'টা দিন পুত্র-কন্যার সম্মুখে 'বাবা' বলে পরিচয় দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার শেষ ক'টা দিন, যারা পেল, তাদের হয়তো ভাল লাগবে এ-কাহিনী।

সেই ঘটনাকে সাজাতে যে ক'টি চরিত্রের সমাবেশ ঘটাতে হয়েছে তাদের কারোরই বাস্তবের অস্তিত্ব নেই। যদি নেহাৎ-ই কোন মিল খুঁজে পান সেটাই স্বাভাবিক হবে। এই কারণে, যে আমার চিত্র অঙ্কন সার্থক হয়েছে ! প্রয়োজনে স্থান, কাল ও পাত্রদের যেমন খুশী সময় মত নিয়ে এসেছি সেটা

অন্যায় হলেও, গল্পের কারণে আশা করি মানিয়ে নেবেন। ভাষাজ্ঞান না থাকায়, প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের যে শব্দ চয়ন পছন্দ হয়েছিল, সেগুলো পুনরায় ব্যবহার করেছি। ঋণ স্বীকার করি।

(পূর্ববাংলার শব্দে-'স' শেষে থাকলে সেটা ইংরেজী 'এস্'-এর মত উচ্চারণ হবে।)

অরিজিৎ সিংহ

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৫৯

১

ট্রেনের গতিবেগ টর্ণেডোর মত। কিন্তু, চিন্তার গতিবেগ তত নয়। এ অনেকটা পিঁপড়ের ঝোলাগুড় চাটার মত। খাচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। অথবা, দূর থেকে দেখা পিঁপড়ের সারির মতন, একটা লম্বিত বক্ররেখা মাত্র। কাছে না এলে তার অগ্রসর হওয়া বোঝা শক্ত। এবং যতগুলো এগোচ্ছে ঠিক ততগুলোই পেছোচ্ছে। যেন অঙ্কশাস্ত্রের ভাষায় এ এক শূন্য অবস্থা। একটু বাদে বাদেই দূরে—পেছনে ফেলে আসা স্মৃতিগুলো ভিড় জমায়। স্টেশনে ঠেলাঠেলি করে যে ক'টি পারে উঠে পড়ে। সেই কটি কিছুদূর চল্‌ল। পরের স্টেশনে তারা নেবে গেল। উঠ্‌ল আর কটি—এই রকম।

বোম্বের পথ দীর্ঘ। চলাকালীন সঙ্গীদল বিচিত্র কাকলিতে মুখর করে তুলেছে। রিজার্ভ'ড্ কম্পার্ট্‌মেণ্ট্। সর্বভারতীয় সমন্বয় ঘটেছে এখানে। ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মিলিত গুঞ্জনে আর ট্রেনের নিজস্ব গতিজনিত হাহাকার—মিলেমিশে একটা ঐকতান উঠছে। কখনো চড়া সুরে, কখনো বা ঈষৎ হ্রস্ব।

যার যার নিজস্ব সম্পত্তিগুলো গুছিয়ে গাছিয়ে, গুণে গেঁথে রাখছে জানালার কাছ থেকে সরিয়ে—পাছে খোয়া যায়। স্লীপারে রাত্রিবেলা কেউ জানালা খোলে না, এটা খেয়ালই নেই হয়তো। কেউ কেউ এরই মধ্যে বেডিং খুলেবিছিয়ে, জুতো-মোজা, জামা-প্যাণ্ট ছেড়ে, লুঙ্গি পরে ব্ল্যাঙ্কেটের তলায় অর্ধেক সেঁদিয়ে - অন্য সবাইকার দিকে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। যেন, কী একটা করে ফেলেছে এমন চোখের ভাব।

আমার সংলগ্ন বার্থে একটি মহিলা। পঞ্চাশোত্তীর্ণা। মালকোছা দিয়ে সবুজ শাড়ীটা পরা। মাদ্রাজী এবং কন্‌জার্ভে'টিভ্। আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর দুটি অনূঢ়া কন্যা এবং তাঁর গম্ভীরতম স্বামী—কপালে তিলক। একনাগাড়ে বার্থ রিজার্ভে'শন পায়নি। অদলবদল করে কাছাকাছি আসতে চেষ্টা চালিয়েছে বারকয়েক। আমাকে কেন জানি না, একবারও বলেনি। ট্রেনে চলার মজাই এই—একবার গুছিয়ে বসলে কেউ আর নড়তে চায়না। নানারকম অসুবিধের কারণ জানায়। আপাততঃ আমার লোয়ার বার্থে কন্যাদু'টি বসে বসে সঙ্গে আনা ঘরের তৈরী সাউথ-ইণ্ডিয়ান্ ডিশ্ খালি করছে। আমি অন্য কোণায় বসে আছি চুপচাপ। উল্টোদিকে একটি

কমবয়সী পাঞ্জাবী ভদ্রলোক, একা, আধশোয়া ; দৃষ্টি, তেলেগু কন্যাদু'টির প্রতি। সেও গিলছে।

দূরে একটা জোর তর্কের আওয়াজ আসছে। বোধ হয়, একই বার্থে দুটো টিকিট অধিকারীর চিরন্তন বচসা। কারণ নাইট্ কণ্ডাক্টর ওখানেই দাঁড়িয়ে, এবং সমস্যার একটা সমাধান করতে চেষ্টা করছে। দূরপাল্লার ট্রেনে আজও এই অবাঞ্ছিত ঘটনাটি ঘটে থাকে, এক-আধটা। অভিযোগ খুব একটা করা হয় না দপ্তরে। কারণ, পথের গণ্ডগোল, কিঞ্চিৎ সাময়িক মনোমালিন্যের পর, পথেই রয়ে যায়। একে টেনে হিঁচড়ে কেউ আর খাতা-পত্তরে জমা করে না। একজনের জীবনে সীট্ রিজার্ভেশনের পর দু'জন দখলদার হয়েছে, এমন নজীর একবারই ঘটে। ভাগ্যিস !

২

রাত হলো। এরপর গেলে হয়তো খাবার কিছুই পাব না। জার্নিতে সঙ্গে করে খাবার নেয়া আমার ধাতে আসে না। ডাইনিং কার অভিমুখে যাত্রা করলাম। ব্যালান্স রেখে দুলে দুলে হেঁটে ভেস্টিবিউল্ সীস্টেমে ঢুকতে যাচ্ছি পেছন থেকে কনুইয়ে চাপ্ পড়ল,

—'কোথায় চল্লেন ?'

অনেকক্ষণ বাদে মাতৃভাষাটা কানে মধুবর্ষণ করলো। গলার স্বর যাচ্ছে পিলে চমকানো। বাক্যের অধিকারীকে একনজরেই চিনলাম। চক্রবর্তী। দার্জিলিং মেলে অনেক বছর নাইট্ কণ্ডাক্টর ছিলেন ফার্স্ট ক্লাসে।

—'এখানে বদলি হলেন কবে ?' যথাসম্ভব পরিচিতির হাসি মুখে ফুটিয়ে বলি।

—'লাস্ট মান্থ থেকে। এদিকে 'গণ্ডগোল' অনেক বেশী।' পূর্ব বাংলার উচ্চারণের মায়া কাটাতে পারেননি আজও। তামাশা ছাড়া আর কীই বা আছে, নিজের বলে জাহির করবার মত ?

আরও কিছু বলার আগেই দণ্ডায়মান ক্ষুদ্র জনতা থেকে ছিলার মতন ছিটকে বেরিয়ে এলেন একটি তন্বী, সুবেশা এবং ফরাসী কোন সেন্টে সৌরভা-বিহ্বলা। সোজা আমার দিকেই তাক্ করে বললেন,

—'দেখুন তো কি বিপদ, আমাদের তিনটে বার্থ রিজার্ভ করা আজ ক'দিন আগে, আর ইনি পরশু টিকেট কেটেছেন, দুটো একই নাম্বারে পড়েছে।' এক নিশ্বাসে বলে চলেন। এতক্ষণ বারবার বলে মুখস্থ হয়ে গেছে সন্দেহ নেই।

—'এ'কে কি করে বোঝাই, আপনি একটু বলবেন ?'—নাইট কণ্ডাক্টর য'াকে সমীহ করে কথা বলে, তিনি কিছু একটা করবেন আশা আছে; দ্বিতীয়ত বাঙালী।

বিদ্রোহী উত্তর ভারতীয়টি দু'হস্তে ধৃত সদ্যজাতকে তার মায়ের কোলে অর্পণ করে নিজের পকেট থেকে আড়াইটি টিকেট আমার চোখের খুবই বিপজ্জনক সান্নিধ্যে এনে দুলিয়ে দুলিয়ে বল্লেন,

—'তো আপ্ই ইয়ে রেলওয়ে কোম্পানীকো ম্যানেজার হে'! তো গাড়ী রোখিয়ে, হামলোগ, বামাল উতার যাতা হু'।' এমন মুখোমুখি আক্রমণে একটু বেসামাল হয়েছিলাম নিশ্চয়ই·

বঙ্গললনা বললেন। 'দেখলেন কি পিন্‌চিং ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে এটা ?' ফু'সছেন ভদ্রমহিলা।

—'দেখি আপনার টিকিটগুলো !' উনি চাইবার আগেই. চক্রবর্তী তার হস্তধৃত টিকিটগুলো সহাস্যে মেলে দেয়। তিনটে টিকিট। দুটো মিঃ এবং মিসেস্ পি.বি. সিংহীর নামে, তৃতীয়টির মালিকের পুরো নামটাই খোদাই, মিস্ বন্দনা সিংহী, বয়স আটাশ। ম্যাটার অব্ কো-ইন্সিডেন্স-টা হলো উত্তর ভারতীয় মিস্টার ও মিসেস্ হচ্ছেন পি. বি সিং এ'দের সাথে অর্ধ টিকিট—'বেবী' বয়স দু'মাস। ফাস্ট' পারসন্-এর অহং শব্দটি করেছে গোলমাল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই সীট রিজার্ভেশন ক্লার্ক চারজন প্রাণীকে দু'জনে রূপান্তরিত করে ফেলেছেন · এবং সেটা মিস্টার এণ্ড মিসেসের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। ত'াদের বাচ্চা দুজনের—সরি, একজন এ্যাডাল্ট্—পুরো নাম থাকায় ও দু'টো ঠিকই আছে।

—'আপনি হাওড়া স্টেশনে এলোট্‌মেণ্ট্‌কে বললেন না ?' বন্দনা সিংহীকে বলি।

—'সময় পেলাম কোথায়। এসে তখন পাঁচমিনিট সময়, বাইরের নাম দেখেই লাগেজ্ তুলিয়ে কুলি-বিদায় করতেই, টেন ছেড়ে দিল। তখন কি জানি আমাদের বার্থের অন্য ভাগীদার থাকবে ?' খুবই রেগেছেন সন্দেহ নেই। চক্রবর্তীর দিকে তাকিয়ে বলি—'বুকিং ক্লার্ক গোলমাল করে ফেলেছে, নাম্বারটা মিলিয়ে দেখেছেন ?'

—'হ্যাঁ। মিস্টার এবং মিসেস্ সিং-এর নাম্বারটা উঠেছে ঠিক, সিরিয়ালি পরেরটা মিস্ বন্দনা সিংহী। বেবী—টু ক্যারী। তার মার সাথে থাকবে, সীট্ নেই আলাদা।' চক্রবর্তী হাতের লিস্ট দেখে দেখে উত্তর দেন। মুখে বিদ্রুপের, অপ্রস্তুতের হাসি মেশানো।

অনেক কষ্টে মিণ্টার সিংকে বোঝাতে গেলাম—এ'রা কলকাতার

২

রেসপেক্টবল্ ফ্যামিলির লোক তাছাড়া বয়স হয়েছে, একটু কষ্ট মেনে নিয়ে নিজেরাই সাজিয়ে বসা যায়, অন্যদিন তারও এই বিপদ হতে পারে ইত্যাদি···।

উত্তর হলো 'থোরী ম্যায় ডাস্টবিন্সে আ রহা হু' ।'

—'!!' ওকে ছেড়ে ওর মিসেসের কাছে আর্জি রাখলাম। 'কুছ্ বুরাহ্ না মানিয়ে তো এক্ বাত্ কহু', ভাবিজী?' গলায় যতটা সম্ভব 'ফ্যামিলিয়ার টোন্টা' ধরে রেখে, অগ্রসর হই। 'ইন্ লোগোকো দেখিয়ে, আপ্কা পিতা মাতা য্যায়সী····· ইত্যাদি' ঢঙে। কাজ হলো এতেই। মিসেস্ সিংহী বাচ্চাটাকে পরম আত্মীয়ের মত নিজের কাছে শোয়ালেন, তাতে মিসেস সিং যারপরনাস্তি খুশী হয়ে বন্দনাকে নিয়ে একটি বার্থ্ শেয়ার করতে চাইলেন। অর্থাৎ, বাকী দুটো দ্বিধাগ্রস্ত পুরুষ, বাকী বার্থটির শেয়ার করা উচিত। বাদ সাধলেন মিস্টার সিং। —'নেহী, হাম্ দোনো একই বার্থ্পর্ শো যায়েংগে। হাম্কো ইধারই রহ্না হ্যায়।' তাহলে বন্দনাকে তার বাবার সাথে ওপরে উঠে শুতে হয়। লোয়ার বার্থ্টার দিকে করুণ চাহনি ছুঁড়ে দিয়ে উনি আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। এই ব্যবস্থা করতে করতে কুড়ি মিনিট কাবার! আরও চাইতে গেলে ঘাড় ধরে না নাবিয়ে দেয়। চট্ করে বললাম—

—'আসুন আমার সাথে।'

—'কোথায়?'

—'এদিকে।' টেনে টেনে পা ফেলে আবার ফিরে আসি আমার লোয়ার বার্থে। কন্যাদুটি তখনও সেটা দখল করে চাপাস্বরে, দিশি ভাষায় মায়ের সংগে গল্প চালাচ্ছে। গম্ভীর বাবাটি ঘুমে অচৈতন্য, এরই মধ্যে! আশে-পাশেও অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছে, বা চেষ্টা করছে। ওদের মধ্যে ছোট কন্যাটি স্পষ্ট ইংরাজীতে প্রশ্ন করল,

'উই আর এগ্জস্টেড্ অব ওয়াটার্' পাশে রাখা তামার পাত্রটা দেখাল। আমি কিছু বলার আগেই, উল্টো দিক থেকে অধীর কন্ঠে উত্তর হলো, 'আই হ্যাভ, আই হ্যাভ।' পাঞ্জাবীটি! কন্যা জননীর মুখ শুকিয়ে গেছে। কন্জার্ভেটিভ্ ব্রাহ্মণ। যার তার ছোঁয়া জল খান না। ট্রেনেও না! আমি আমার ওয়াটার ক্যারীয়ারটা মেয়েটির হাতে ধরিয়ে বললাম, ইট্ ইজ্ ফুল্ উইথ্ ক্যাল্কাটা কর্পোরেশন্ ডু ইউ টেক্?' মেয়েটি রসিকা। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলো—'উই টেক্ ক্লোরিন্, গ্ল্যাড্লি।' আমার সঙ্গিনীও মৃদু মৃদু হাসছেন। আমার স্যুট্-কাম্-ব্রিফ্কেস্টা বার্থের তলায় ঠেলে দিয়ে বলি,—'শুয়ে পড়ুন।'

অবাক হয়ে বললেন, 'আর আপনি! রাতটুকু দাঁড়িয়েই কাটাবেন

বুঝি ?'

—'না। বহুদিন ট্রেনে ট্রাভেল করেছি, একরাতও ঘুমোতে পারিনি।'

—'যাঃ, তাও কি হয় ?' রীতিমত ধমক দিলেন ছোট্ট সিংহীটি।

—'কথা বাড়াবেন না। আমি ডাইনিং কারে যাচ্ছি। রাতটা ওখানেই কাটিয়ে দেব। অসুবিধা কিছু হলে, শেষরাতে আপনাকে তুলে দিয়ে, আমি সটান শুয়ে পড়তে একটুও লজ্জিত হব না। বাই দ্য ওয়ে, আপনাদের খাওয়া হয়েছে ?'

ঘাড় কাত করে উনি সম্মতি জানালেন। অর্থাৎ, খেয়েই ট্রেনে উঠেছেন। আমি, একটুও না দাঁড়িয়ে ডাইনিং-কার অভিমুখে ছুটলাম। পথে আড়চোখে দেখে গেলাম, সিং আর কেশর মিলে কেমন কমন ফ্যামিলি গড়ে ঘুমের আয়োজন করেছে !

৩

ডাইনিং কার প্রায় ফাঁকা। দূরে দূরে কেউ কেউ বসে শেষ সুখটান দিচ্ছে সিগারেটে ! ছোকরা-গোছের ম্যানেজারকে দেখে বলি,—'আই ওয়াণ্ট্ সামথিং টু বাইট্। হোয়াট ক্যান ইউ অফার ?' একটু সমঝে নিয়ে উত্তর দিল,—'আভি সব কুছ খতম্ হো গিয়া সাব্। আপ ইতনি দের কিয়া ! বৈঠিয়ে পুছকে আতা।'

বাঁদিক ঘেঁসে জানালা দিয়ে দূরে দৃষ্টিটা ছুঁড়তে চেষ্টা করি। ভেতরে তীব্র আলো থাকায়, বাইরের কিছুই বোধগম্য হলো না। আরও একটা ডাইনিং কার-এর প্রতিবিম্ব দেখা গেল, পাশাপাশি কাঁচের জানালার ওপর একটি বেয়ারার রূপ ফুটে উঠতেই, ডানদিকে তাকাই। আমার পায়জামা পাঞ্জাবী পরা দীর্ঘ চেহারাটা দেখে একটা স্যালুট ঠুকে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বলে,

—'দের্ হো গিয়া সাব। ডিনার টাইম্ খতম্ হোনে সে আদমী কোই কাম নেহী করতা হ্যায়, উধর।'

—'ওহি সার্ভ কর দো।' কণ্ঠের অধিকারী পূর্বের সেই ম্যানেজার ! 'ওহি'-টা কী, জিজ্ঞেস করি বেয়ারাকে। ও লজ্জিতভাবে বলে,

—'হ্যায় স্রেফ হাফ বউল চিকেন্ স্যুপ, এক প্লেট টোম্যাটো সেলাড অউর ব্রেড্।'

—'ফার্স্ট ক্লাস ডিনার, জলদি লাও।' সোল্লাসে বলি। ম্যানেজার হেসে ওঠে। ওকে পাশে বসিয়ে এটা ওটা জিজ্ঞেস করে, আসল কথায়

আসি। রাতটুকু ডিনার কারেই যদি থাকি! ও অবাক হয়। রিজার্ভেশন্ আছে কিনা জিজ্ঞাসাও করে ফেলে। জানায়, একটু পরেই লাইটগুলো নিবিয়ে দেয়া হবে। নীল আলো এক-আধটা জ্বলবে শুধু। আমার আপত্তি নেই, সুতরাং ওদেরও ক্ষতি নেই।

রূপোলি রিবন দেয়া এক স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাসের জল এবং আট পীস্ ব্রেড্ দিয়ে খাদ্যটুকু ড্রেণ করে দিতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। পুরো গ্লাস ঠাণ্ডা জলটা এক নিঃশ্বাসে পান করতে করতে মনে হলো, জলের ক্যারীয়ারটা দক্ষিণী কন্যাদ্বয়ের হেফাজতে। ওই অবস্থায় জলটা না দিয়ে পারলাম না। কিন্তু; না দিলেই বোধ হয় ভাল হতো। কন্‌জার্ভেটিভ জননীর জাতটা মারলাম না তো! এখন খচখচ করছে মনটা। কারোর ধর্মীয় সংস্কার-এ আঘাত করতে আমার মন ওঠে না। বেয়ারাটি এসে দাঁড়ায়, বিল মেটাই। ফেরৎ দুটো টাকাই টিপস্ ঠেকাই। লোকটি দীর্ঘ সেলাম ঠুকে আরও এক গ্লাস জল টেবিলে রেখে, পিরীচ দিয়ে ঢাকা দিয়ে গেল। এখানেই এই বাঙালী বাবুটি যে রাত্রিটা কাটাবেন, সেটা বোধ হয় ম্যানেজার তাকে বলে থাকবে। একটা গরম কফি পেলে জমতো! কিন্তু, কফির টাইম্-শিডিউল্ এখনও ছ'ঘণ্টা বাদে। অভাবে একটা গরম সিগ্রেট ঠোঁটে চেপে, একটু কাত হয়ে কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরেটা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি। সেখানে আর একটা পাঞ্জাবী পরা চেহারা, আমার দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে! চোখে হাসি! হাসিটা কেন?

—'জনৈকা সহযাত্রিনীকে নিজের রিজার্ভ করা বার্থ ছেড়ে দিয়ে, খুব একটা নিজের কাছেই গর্ব গর্ব ভাব নাকি?' 'দরকারটা কি ছিল মশাই, বেশ তো ঘুমোতে ঘুমোতে যেতেন!'

—'হ্যাঁ যেতাম, কিন্তু……'

—'কিন্তু… ভদ্রমহিলা তরুণী এবং সুন্দরী বলেই কি…?'

—'দ্যাৎ, তা নয়। ভদ্রমহিলা বেশ সপ্রতিভ এবং সরল। আর কি জানো,—কথা বলার ভঙ্গি, ঝগড়া কবার ভঙ্গি, এমন কি জোর দিয়ে কিছু বললে, তা মেনে নেয়ার ভঙ্গিটা পর্যন্ত, তার মতো।'

—'কার মতো?'

—'তারাবিবির মতো।'

৪

তারা॥ সিনেমার পর্দার মত ঝলসে উঠল সার্সির ও-পাশটা। সম্মুখে

দৃষ্টি এখন সুদূর প্রসারী। চাঁদনী রাতের অমন চলন্ত ঘূর্ণায়মনে দৃশ্য, একটা মোহজাল ছড়িয়ে দেয়। তাকিয়ে থাকার কেমন একটা চৌম্বক শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি করায়। ভেতরের আলোগুলো নিভে যাওয়ায়, বাইরেটা অমন আলোকিত হয়ে উঠেছে। এইভাবে বহুক্ষণ বসে বসে, পৃথিবীর এই চাঁদের আলোয় রাত্রি জাগরণের নীরব সাক্ষী হয়ে থাকি ; —পেছনটাকে হু হু করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া ট্রেনের গতির ভেতর থেকে।

ডাইনিং কারের এয়ার-কণ্ডিশনিং বন্ধ হয়ে গেছে, শুধু ওপরের এগজস্ট ফ্যান্‌গুলো বহু ব্যবহৃত হাওয়া, টেনে টেনে তুলে নিচ্ছে। তবু একটু শীত শীত করছে। উঠে পড়ি। পাশের কম্পার্টমেণ্টে ঢোকবার মুখে দেখি, লবিতে দাঁড়িয়ে দু'জন বোতল থেকে সোজা গলায় ঢালছে! তর্ক হচ্ছে স্খলিত কণ্ঠে। আমায় দেখে, একটু বোকার মত হাসল একজন। ওদের পাশ কাটিয়ে, ঠাণ্ডাতর ঘুমন্ত স্লীপারে প্রবেশ করি। নীল আলোয় চোখটা আগেই সেট করে গেছে। আমার বার্থে ছোট্ট সিংহীটি ঠাণ্ডায় গুঁড়িসুড়ি মেরে ঘুমোচ্ছে। বেচারী, অন্যের বিছানায় শুয়েই কৃতার্থ, তার ব্ল্যাঙ্কেট্‌টা গায়ে দিতে আরও লজ্জা! পায়ের নীচে জড়োসড়ো ব্ল্যাঙ্কেট্‌টা সন্তর্পণে টেনে এনে ওর শরীরটা ঢেকে দিই। ঘুমের ভিতরেই একটু কথা বলল। নীল আলো-আঁধারীতে ওকে আরও বাচ্চা একটা মেয়ে মনে হচ্ছে। খুব একটা মিল লাগছে, তারার সাথে। তারাবিবির সাথে আজ দশ বছর দেখা হয় না। ওর বয়সও এখন সাতাশ-আঠাশ হবে। এইরকমই দেখতে হয়েছে হয়ত। ও কোথায় আর আমি কোথায়। বন্দনা ঘুমন্ত অবস্থাতেই, আলতো হাতে, অভ্যাস মতো, উষ্ণতাকে টেনে কান অবধি ঢেকে দিল। ব্রিফকাম্‌-সুটকেসটা অল্প একটু ফাঁক করে ওপরেই রাখা, বাবার পুরোনো শালটা টেনে নিই। দাঁড়াতেই চোখ যায়, মদ্র গম্ভীরানন্দ স্বামীটি হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। নীচে মালকোছা মহিলার নাক ডাকছে। তারার ঘুমন্ত মুখটা মনে করতে করতে ডাইনিং কারে ফিরে আগের জায়গাতেই পা তুলে ভালো করে মুড়ি দিয়ে বসি।

৫

একাত্তরে, তারার শেষ চিঠি এসেছিল, ইংলণ্ড ঘুরে। লিবারেশন্‌ ওয়ারের কয়েক মাস আগেই। চিঠি পড়তে পড়তে চোখ ফেটে জল আসে। আপশোষ হয়, অমন শান্ত সুন্দর মেয়েটার কী দারুণ লাঞ্ছনা, অপমান। অপমান শুধু তারই নয়, তার দগ্ধানো আঁচ এসে লাগে পিতৃকূলের ওপরও। প্রথম

প্রথম ওর ছেলেমানুষীকে শাশুড়ী, পাগলামি বলে ছোট ছেলেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। এবং পরের দিকে রুগ্না মেয়েকে লুকিয়ে বিয়ে দেয়া হয়েছে একথা বলতেও কুণ্ঠিত বোধ করে নি! আর, আশ্চর্য ওর স্বামী। লেখাপড়া জানা একটা ছেলে যে এমন অস্বাভাবিক হতে পারে, এটা ধারণাই করা যায় নি। বড় বৌদিদের সাথে তার মা কিরকম ব্যবহার করেছেন। কেন বৌদিরা শাশুড়ির সাথে ঘর করতে চাইলো না—চোখের সামনে সেই সব অকথ্য ঘটনার সাক্ষী হয়েও মায়ের কথা বেদবাক্য মেনে, এ যুগের একটি ভদ্র-সন্তান তার স্ত্রীকে বিভিন্ন ছোটখাটো কারণে অপদস্থ করতে থাকল। আবার ছোট ছেলে বিয়ের পরপরই যখন অসুস্থ হয়ে পড়ল, তখন তার মা উঠে পড়ে লাগলেন প্রমাণ করার জন্য, যে অসুখটা এসেছে ওই জমিদার কন্যা থেকে! এবং মেজ ও বড় ছেলের আপত্তি সত্ত্বেও ব্লাড টেস্ট আর এক্স-রে করা হয়েছিল তারার! গোপনে সংবাদ পাঠাত তারা, অনেক দিন বাদে, বাদে।

আজকের দিন হলে ডিভোর্স করিয়ে আনা যেত। তখন বংশমর্যাদা, সামাজিক অবস্থা চিন্তা করে, দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকা ছাড়া, আর কিছুই করা যায় নি। তারা, নিজে কোনদিন শক্ত হয়ে—মনের জোর করে এই অপমানের দিনগুলোর শোধ নেবে, এই আশা করতাম। কিন্তু ও সম্পূর্ণ অন্যরকম। ওর জীবনের চাহিদাটা এত কম। মিষ্টি ব্যবহার করলেই, যে কোন চরম শত্রু নিমেষে ওর কাছে দেবতা হয়ে যায়।

মনে পড়ে ওর দুই জা-এর কথা-ও। বড় লীলাবতী। খু-ব গল্প করতে ভালোবাসেন। বেচারী হার্টের রুগী। মেজ, আয়েষা দিদি বিশেষ করে আয়েষা দিদির কথা মনে থাকবে আর মেজদাদার কথা। ওঁরা কত উঁচুমনের লোক। কী সুন্দর সহযোগিতাপূর্ণ ব্যবহার, কত কন্‌সিডারেট। মেজদাদা ঠিক বুঝতেন, ছোট বউ কোন ঘরের মেয়ে, তাকে কতটা সম্মান দেয়া উচিত! কতবার ছুটির দিনে, গ্রামের বাড়ীতে এসে মা-কে বকাবকি করে গেছেন। 'ছোট বউকে এমন খাটানো হচ্ছে কেন? রান্না করার, কাপড় ধোয়ার, বাসন মাজার জন্য রাজবাড়ীর মেয়ে নিয়ে আসা হয়েছে নাকি!' 'শাশুড়ী সেবা? 'সেবা' মানে কি ঝি চাকরের মত ঝি-চাকর থাকবে, তোমার সাথে আড্ডা দেবে, আর বউকে তাদের কাজগুলো করতে হবে!' 'চাকরটার দু'টুকরো মাছ দেয়া হয়েছে নাকি—সাতবার জিজ্ঞেস করছ বউমাকে। নতুন বউয়ের সকাল থেকে খাওয়া জুটেছে কিনা, একবারও জিজ্ঞেস করে দেখেছ? ওর চেহারার কি হাল হয়েছে দেখেছ!' তবুও কটা দিন তারাবিবির একটু ভালো যেত। তারপর আবার যে কে সেই। আর এমন সকল দিকে খোলা দৃষ্টি রাখা লোক; এমন বিরল স্বভাবের ও গুণের লোককে পৃথিবী, কেন

জানিনা, বেশী দিন ধরে রাখতে পারে না।

একটা তীব্র অপমানবোধ তাঁকে মানসিক অবনতিতে নাবিয়ে দিয়েছিল। শহরে চাকরী করতেন পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের একটা রিসার্চ দপ্তরে। ওপর-ওয়ালা পশ্চিম-পাকিস্তানী। ওঁকে তাড়িয়ে, ওঁর রিসার্চ ওয়ার্ক চুরি করে নিয়ে, নিজের মনোনীত একজনকে পোষ্টটা দিতে গিয়েছিল। এটা, কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি মেজদাদা। কেমন একটা বিষাদে ভেঙে পড়লেন দিনকে দিন। কি যেন ভাবতেন! নিজের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলতে লাগলেন। অবশেষে, যে পথ বেছে নিলেন, তা কেউ চায়নি—কেউ না। বিধবা আয়েষা দিদিকে দেখে, কী যে ভীষণ কষ্ট লাগত। কাঁদেননি ভদ্রমহিলা! চুপ করে মেজদাদার শোবার ঘরে বসে থাকতেন। হয়ত ভাবতেন, তাঁদের এ ছোট্ট মিষ্টি সংসারে, কার দীর্ঘশ্বাস লাগল।

৬

তারাবিবির শেষ চিঠি এল লণ্ডন ঘুরে। অনেক বিবরণ তাতে। অনেক দুঃখের কাহিনী! সবচেয়ে জ্বলজ্বল করছে যে কটা শব্দ, '……আমাকে একবার তোমার কাছে নিয়ে যাবে আম্মা! আমার কোলের ছেলেটা নিয়ে তোমার কাছে থাকলে তোমাদের কি অনেক খরচা হবে? আমি তো তোমার বাড়ীর সব কাজ করে দিতে পারব। এখানে, ঘরের সব কাজ তো আমি-ই করি। তুমি আব্বাকে বলবে, এ'দের একটা চিঠি লিখতে? ভাইজান কি চাকরী করে কলকাতায়? ওকে আমার কথা বোলো। ও নিশ্চয়ই তার তারাবিবিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করবে……'

ভাবতে ভাবতে কোন অতল তলে ডুব দিয়েছিলাম নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হতেই হাঁফ ছাড়বার জন্য ভেসে উঠে দেখি, থরথর করে কাঁপছি। গলার কাছটায় কেমন একটা কষ্ট। চোখের কোণে জল! নাঃ! আজকাল আমার চোখে জল আসে না। এসব অনুভূতি, কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে।

৭

চাঁদ ঢলে পড়েছে এখন। বাইরে আলোর রেশ যেটুকু রেখে গেছে, তাতে একটা আবছায়া সমান্তরাল ভূখণ্ড চোখে পড়ে। পরিষ্কার বোঝা যায় না কিছু! একটু পা-টা টান, টান, করতে পারলে হতো। রিস্টওয়াচে, রেডিয়াম্ জানালো, রাত চারটে। প্রায় ভোর হতে চলল। উঠে ল্যাভাটরী

হয়ে, নিজের বার্থের কাছে এসে দাঁড়ালাম। আপাদমস্তক ঢেকে গভীর ঘুমে কাদা হয়ে গেছেন, বন্দনা। দু'য়েকজন উঠে পড়ে বাথরুম-টাথরুম সেরে ফেলেছে। সন্তর্পণে খুব মৃদু মৃদু আঙুল ছোঁয়ালাম, কপালের কাছে। ঝট্ করে মুখের ঢাকাটা সরিয়ে, সভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ? !' এত চট্ করে জেগে যাবেন বুঝিনি ঝুঁকে নীচু হয়ে বললাম, 'ট্রেন থেকে সান্‌রাইজ দেখতেও কিন্তু ভালো লাগে—!' হুড়মুড় করে উঠে বসে, শাড়ী-টাড়ী ঠিক করতে করতে বললেন, 'এ মা, আমি কী ! কটা বাজে ?

'—'বেশী না মাঝ রাত।' আলতোভাবে বলি।

নিজের হাতঘড়িটা দেখে বলেন, 'দ্যুৎ, চারটে পাঁচ ! ছিঃ ছিঃ. আপনার না রাত তিনটেয় ডেকে দেবার কথা ? নিন শুয়ে পড়ুন।' হেসে বললাম, 'একটু মায়া হচ্ছিল, ঠাণ্ডায় শেষ রাতেই ঘুমটা জমে তো।' গায়ের শালটা খুলে বলি,— 'যদি আপত্তি না থাকে—এটা জড়িয়ে বসতে সুবিধে হবে, আমাকে ব্ল্যাংকেট্‌টা ছেড়ে দিন বরং।' একটু হেসে তাই মেনে নিয়ে মাথার কাছেই বসে পড়লেন. শাল মুড়ি দিয়ে। একটু ইতস্ততঃ করে, আমি সেঁদিয়ে পড়লাম সম্পূর্ণ রেডিমেড একটা গরম বিছানায়। এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই টুপ্ করে ঘুমিয়ে-ও পড়লাম। যেটুকু সময় জেগেছিলাম, তার মধ্যেই বন্দনা যে একবার উঠে গিয়েছিলেন সেটা টের পেলাম। মুখ ধুয়ে এসে ফের বসলেন বোধ হয়।

৮

ঘুম ভাঙলো, দুর্গ-এ এসে। কম্পার্টমেণ্ট কাকলীতে মুখর। সকাল সাড়ে ন'টা অবধি ঘুমিয়েছি ! ব্রাসে পেস্ট লাগাতে লাগাতে আড় চোখে তাকিয়ে দেখি, আমার ঝোলা থেকে ম্যাগাজিন্‌গুলো বের করে নিয়ে দাক্ষিণী কন্যাদ্বয় ভাগাভাগি করে প্রাতরাশের সঙ্গে গভীর মনোযোগ দিয়ে গিল্‌ছে। আমি উঠে এগোতেই, ওরা দুজনেই হেসে বললো, 'গুড মর্ণিং'। লজ্জিত-ভাবে বলি, 'মর্ণিং'। সিংজী আমাকে দেখে বললেন, এবার প্রায় ইংরেজী-তেই,

—'নাসিক মে উই উইল বী এবল্ টু চেঞ্জ, পিছুওয়ালা কম্পার্টমেণ্ট মে।' টুথব্রাশটার পশ্চাদ্দেশ দাঁতে চেপে উত্তর দিই,

—'রিয়েলি, আই ফিল্ এমব্যারাসড ফর দিস আন্‌এভয়ডেবল্ সিটুয়েশনস্।'

—'নেহী ও বাত নেহী, এইসি হো যাতি হ্যায়।' উক্তিটি গতকালের

পাতানো ভাবিজীর। গাল কুঁচকে হেসে, টয়লেটে ঢুকি। সাবান আর তোয়ালেটা রাখতে গিয়ে চোখে পড়ল আয়নার নীচে ট্রেটার ওপর একটা রিষ্ট ওয়াচ! লেডিজ, অটোমেটিক। টয়লেটের টাইমটা আমার একটু বেশী লাগে। প্রায় কুড়ি মিনিট বাদে, ঘড়িটা পকেটস্থ করে বেরিয়ে আসি। সিংহী ফ্যামিলি এখনও নেই জায়গায়। মিসেস সিংকে 'বলি, হোয়াটস দ্য টাইম ভাবিজী?' চট করে কব্জি উল্টে বলে দিলেন, 'জাস্ট টেন।' ঝুঁকে এগিয়ে যাই। কয়েক পা এগোতেই এক গুজরাতী আধুনিকার পাশ কাটালাম। আড় চোখে দেখে নিলাম, ডান হাতে ঘড়ি আছে। সীটে বসে তোয়ালে ভাঁজ করে ব্যাগে রাখি ব্র্যাকেটটা পেতে, তার ওপর বেড কভার বিছিয়ে, বেশ একটা গদীয়াল ফরাস বানিয়ে ফেলি। কন্যাদু'টি দেখছিল। কব্জি থেকে ঘড়িটা খুলে দম দিতে দিতে বলি, 'ক্যানয়ু টেল্ মী দ্য একজ্যাক্ট টাইম?'

প্রগলভা মেয়েটি বলল, 'য়ু আর্ টু আরলি ফর লাঞ্চ টাইম।' দুজনেই তাদের প্রাণখোলা হাসিতে কম্পার্টমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। রিস্ট ওয়াচ ওদের নয়। অন্য কম্পার্টমেন্টের কারুর হলে, মালিক খুঁজতে জান বেরিয়ে যাবে।

বেশ চোঁ চোঁ করছে পেট-টা। এক কাপ ধূমায়িত চায়ের পর কিঞ্চিৎ বেশী করে 'টা' খেয়ে নিতে হবে। ডাইনিং কারে বেশ ভীড়। মি: পি, বি, সিংহী কোর্ক নেড়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বাকী দুজনও পেছন ফিরে তাকালেন। এগিয়ে মিঃ সিংহীর পাশের খালি চেয়ারটায় বসি। বন্দনা হাসছেন! মিসেস্ সিংহীও পারসোনালিটির আবরণ ভেদ করে একটু একটু হাসির আভাস দিচ্ছেন।

--'কি হল?' বলি।

—'রাত চারটা অবধি কি করলেন?' মিঃ সিংহীর প্রশ্ন।

—'ভাবছিলাম।' চাপা হেসে বলি।

'—সারারাত ভেবেই কাটালেন, বিছানাটা আরেকজনকে ছেড়ে দিয়ে।' বন্দনার উক্তি। 'কি ভাবছিলেন এত?'

—'না, নাথিং ইন্ পারটিকুলার। আর,—বিছানাটাতো ছেড়ে দিই নি, লোন্ দিয়েছিলাম' কালকের বেয়ারাটা এসে দাঁড়ায়। 'খানা লে আয়া সাব্।' অর্ডার দেবার আগেই একরাশ খাবার নিয়ে এলো বুদ্ধিমান এ্যাটেন্ডেন্ট। কালকের অবস্থাটা কম্পেনসেট্ করতে চায়, বোধ হয়। অন্যদের প্লেটে তখনও ওমলেটের অর্ধাংশ। এঁদেরকে ও এক্ষুণি সার্ভ করে গিয়েছে। বেশ ভীড়। কয়েকজন স্মোকিং-লবি থেকে উঁকিও দিচ্ছে।

৩

জায়গা খালি হলে বসবে। চা-টা, মিসেস্ সিংহী-ই ঢেলে দিয়েছেন। চামচে দিয়ে চিনিটা নাড়তে নাড়তে মিঃ সিংহীকে নিয়ে পড়ি।

-'বোম্বেতেই থাকেন না বেড়াতে ?'

--'বেড়াতেই।'

বন্দনা আর তার মা, দুজনের স্নান-টান হয়ে গেছে। বন্দনার চুল টান-টান করে বাঁধা। ট্রেনে মহিলাদের স্নান করার অভ্যাস থাকে না, সাধারণত।

—'আর কোথাও যাবেন ?'

—'না, না। আমার মানে ওর মাসীর বাড়ী মাসখানেক কাটিয়ে ফিরব।' আঙুল দিয়ে কন্যাকে দেখান।

—'আপনি বুঝি দেশ দেখে বেড়ান।' মিসেস্ সিংহী জানতে চান! 'কাল রাত নাইট্ কণ্ডাকটরের সাথে কথা শুনে মনে হলো।'

—'না, এক সময় খুব ট্র্যাভেল্ করতাম। এখন বোম্বে যাচ্ছি একটা কাজে।'

—'কদিন থাকবেন ?' বন্দনা জিজ্ঞেস করেন।

—'কাজটা একদিনের। থাকাব প্ল্যান এক হপ্তার।' যদিও প্ল্যান টান বিশেষ কিছু নেই।

—'কোন দিকে থাকবেন? আপনার ফ্যামিলি কানেক্শনস্ কেউ আছেন ওদিকে?' প্রশ্নকারী মিসেস্ পি বি। মিঃ পি. বি. পাঁউরুটির শেষ টুকরোটা মুখে পুরে চা-টা বন্দনার কাছ থেকে টেনে নেন।

—'ঠিক নেই কিছু। হোটেলেও উঠতে পারি। দুটি মাসতুতো বোন যদিও ওখানেই আছে অনেকদিন; আমি একটু একলা থাকতেই ভালোবাসি।'

--আপনি বিবাহিত?' মিঃ পি. বি-র হঠাৎ প্রশ্নে চম্‌কে যাই। তিনজোড়া উদ্গ্রীব চাউনীর সামনে ঘাড় বাঁকিয়ে জানাই—'না, ওটা হয় নি।'

—'আপনার মা, বাবা?' মিসেস্ পি বি. এতক্ষণে মুখোশ ছেড়ে, বাঙালী মহিলার চিরাচরিত ফ্যামিলিয়র্ প্রশ্ন শুরু করলেন। এক্ষুণি আমার বয়স আর চাকুরী সম্বন্ধে প্রশ্ন আনবেন একথা-টাও আমার তক্ষুণি মনে হলো।

—'আছেন কোলকাতায়-ই।' খাবারগুলো এক এক করে যথাস্থানে পাঠাতে থাকি। ডান পাশে নতুন একটি কাপ্‌ল ফাঁকা সীটে বসে মেনু-কার্ড দেখছে। লাজুক চাউনি দুজনেরই চোখে। বোধ হয় আলাপটা এখনো সড়গড় হয় নি। হানিমুন যাচ্ছে আন্দাজ করলাম। অবশ্য, বিয়ে করে কর্মস্থলেও যেতে পারে।

—'বোনেদের বিয়ে বাকি ?' কণ্টিনিউ করেছেন মিসেস্ পি. বি.। ইচ্ছে করছে পর পর জানা প্রশ্নগুলোর উত্তর একসাথে দিয়ে দিই! বায়ো-ডাটাগুলো।

—'একটিই বোন আমার। তার অনেকদিন বিয়ে হয়ে গেছে।'

—'তাহলে আপনার মা, আপনার বিয়ের চেষ্টা করছেন না?' হাসতে হয়।

বলি, 'না করছেন তো, আমি-ই সময় মত ভেটো দিয়ে……।'

—'কেন?'

—'একলা থাকতে ভালো লাগে। এস্কেপিজম্-ও বলতে পারেন।'

—'না, এটা ঠিক্ নয়।' মিসেস্ পি বি. কর্তার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মন্তব্য করলেন।

পি. বি. এবার আমার কেস্টা টেক্-আপ্ করলেন।—'মিঃ চৌধুরী কি ব্রাহ্মীণ?'

—'ন্-ন্না!' চম্‌কে বলি।

—'আপনি. বাই প্রোফেশান্ · ·· ?'

—'কলকাতার একটা অল্পনামী ওষুধ কোম্পানীর জুনিয়রমোস্ট এগ্‌জিকিউটিভ্।'

—'কোন ডিপার্টমেণ্টে, সেলসে ?'

—'হ্যাঁ।' অবাক হই! সেটা লক্ষ্য করে উনি বলেন।

—'আপনার সুন্দর কথা বলার ধরণ দেখে তাই মনে হলো।' লজ্জিত হলাম।

—'আপনার বয়স নিশ্চয়ই বত্রিশ. নয়?'

—'এক বছর কম ধরেছেন।'

—'ইউ লুক্ ইয়ঙ্গার।'

খালি প্লেট কাপ সরাচ্ছে বেয়ারা। দু'টো নিজউ পেপার রেখে যায়। একটা টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া অন্যটি স্টেটসম্যান্। পাশের নববধূটি স্মার্টলি উঠে এসে স্টেটসম্যানটি দেখিয়ে বললো, 'এক্সকিউজ মী, উড ইউ মাইণ্ড লেণ্ডিং মী দিস ফর এ মোমেন্ট?' তাকিয়ে হেসে বলি, 'সার্টেনলি নট; বাই দ্য ওয়ে, হোয়াটস দ্য টাইম বাই ইয়োর ওয়াচ?' মোমেন্ট শুনেই ঘড়িটার কথা মনে হয়ে গেল। লাল ফুলস্লিভ্, কব্জির কাছে গুটিয়ে বলে, 'কোয়ার্টার টু ইলেভেন।' আমার টেবিলে. কি একটা নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে। 'থ্যাংকস্' বলি আমি। সেও 'তাই' বলে পারসোনাল কোলাম-এর পেজ খুলে কিছু একটা খুঁজতে লাগল। এবং তক্ষুণি পেয়েও

গেল। হাস্‌বেণ্ড ও ঝুঁকে দেখছিল। সেও হেসে উঠল। আমার টেবিলের তিনজন তখন খুব ব্যস্ত। ভ্যানিটি ব্যাগে কিছু একটা খুঁজছেন বন্দনা। বাকী দুটো মাথা ঝুঁকে আছে, কিছু একটা বেরোবে এই আশায়।

—'কি হ'লো?' জিজ্ঞেস করি।

—'আমার রিষ্ট ওয়াচটা পাচ্ছি না।' তখনো খুঁজতে খুঁজতে মুখটা না তুলেই জবাব দেন বাচ্চা সিংহীটি।

—'রিস্ট ওয়াচ? কি রকম?' প্রশ্ন করি; মুখে যতোটা সম্ভব উদ্বেগ ফুটিয়ে।

—'বা, রিস্ট ওয়াচ আবার কেমন থাকে?' বেশ রেগেই গেছেন মনে হলো। উদ্বেগ তার মুখেও। 'গেল কোথায়?' ব্যাগ থেকে 'গোপন' জিনিসপত্তর, টেবিলে এসে জমা হচ্ছে।

—'সাদা ডায়াল?' এমনভাবে বললাম যেন সাদা হলে আমি দেখেছি কোথায় আছে, কিন্তু কালো হলে জানি না।

—'না মেরুন কালারের ডায়েল, অটোমাটিক।' বেচারীর মুখ দেখে সত্যিই মায়া হয়।

—'কম্পার্টমেন্টে দেখে আসুন না, কিম্বা টয়লেট রুমে?' কাজে ফেলী বলি।

—'টয়লেট!' ছিটকে চেয়ার থেকে উঠে প্রায় দৌড় লাগালেন। পেছন থেকে দেখে একটা স্কুলে পড়া বাচ্চা মেয়ে মনে হলো।

—'ওর এম. এ. পাশের রেজাল্ট বের হওয়াতে ওর মামা ওটা কিনে দিয়েছেন।' খবরটা দিলেন সেই মামার ভগিনী, দুঃখিত কণ্ঠে। ফিরে আসেন বন্দনা। ধীর সংযত পদক্ষেপ। মায়ের কাছে বকুনির আশংকাও আছে বোধহয়।

—'পেলেন?' সহজ প্রশ্ন করি।

—'ওকি আর পাওয়া যায়?' তিক্ত কণ্ঠ মায়ের। 'নতুন ঘড়ি, যে দেখেছে সেই তুলে নিয়েছে। এর জন্য তো আর সবাইকার পকেট সার্চ করা যায় না।'

—'তোর মামা ভাল মনে দেয়নি রে তোকে।' সুযোগ বুঝে পি. বি তাঁর স্ত্রীকে একটু খোঁচালেন

—'নাঃ! ও তোমার মত চিকেন হার্ট? মুরোদ তো দেখলাম! আমাকে আজ পর্যন্ত কিছু দিয়েছ? দিয়ে তারপর কথা বোল।'

অবস্থা খারাপের দিকে যায়, যায়! টুপ্‌ করে বাঁহাতে বন্দনার ডান

হাতটা, হাত দেখার ভঙ্গিতে শক্ত করে ধরে, গভীর মনোযোগ সহকারে বলি, 'নাঃ আপনার বরাত ভালো,—পেয়ে যাবেন ওটা।'

—'পেয়ে যাবো!' সংশয় ভরা কণ্ঠ।

—'হুঁ। হাত মুঠো করুন, করুন চট্ করে।' ম্যাজিসিয়ানস্ ট্রিক্ শুরু করি। সবাইকার হাসি হাসি মুখ। ব্যাপারটা কী ঘটে যায় তার অপেক্ষায়! চট্ করে টেনে, হাতটা খুলে দিই। মেরুন রঙের ডায়েলটা, সূর্যের তির্যক আলোয় উজ্জ্বল দেখায়। আর উজ্জ্বল দেখায় বিজয়ী বন্দনা সিংহীর মুখ! কিছুই হয় নি এমনি ভঙ্গি করে ডান হাতের কব্জিতে ওটা বেঁধে ফেলেন। সবাই তখন খুব হাসছেন, আমিও, পাশের নবদম্পতিও। ম্যাজিকটা তারাও দেখছিল। আশ্চর্য। একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত না! যেন এর জন্যই প্রস্তুত ছিল। গুবলু একটা! ঠিক তারার মতন! জিনিস হারিয়ে বা কাজের কথা ভুলে গিয়ে বেমালুম বসে থাকত। মনে করিয়ে দিলেই, 'ও কিছু নয়' এমনি একটা ভাব নিয়ে উঠে যেত। আমাদের খুব হাসাহাসি হ'তো। তারার কথা মনে হতেই চুপ করে গিয়েছিলাম। সেটা লক্ষ্য করেই বন্দনা শুরু করল।

—'কোথায় পেয়েছিলেন? আপনার সিটে পড়েছিল?'

—'না। টয়লেট রুমে। আয়নার তলায় তাকে ছিল।' আস্তে বলি। মিঃ ও মিসেস্ হাসছেন।

—'কিছু একটা ভাবছেন মনে হলো।' বন্দনা বললো।

—'হ্যাঁ। আর একজনকে জানি সেও আপনার মত এই রকম নির্বিকারই থাকতো হয়তো?' হাসতে হাসতে বলি। বন্দনা লজ্জা পায়। বলে, 'কে সে?'

—'একটি মেয়ে, নাম তারা।'

—'তারা? বেশ আনকমন নাম তো!' মিসেস্ পি. বি. বলেন।

—'হ্যাঁ। আস্তে বলি। 'পুরো নাম তারাবিবি।'

—'তারাবিবি! শেষে আবার বিবি কেন?' অবাক হয় বন্দনা। ফিক্ করে হেসেও ফেলে।

—'অসুবিধেটা কোথায়! তারাসুন্দরী না বলে তারাবিবি বলার দোষ কোথায়?'

—'দোষ গুণ নয়। কেমন মুসলিম, মুসলিম লাগে না? বন্দনা খুঁত ধরতে চান।

—হ্যাঁ! শী ইজ্ এ মুসলিম লেডী!' জোর দিয়ে বলি।

—'ও! কোথায়, কোলকাতার মেয়ে?'

—'না। বাংলাদেশের।'

—'আপনার বাড়ী ইষ্টবেঙ্গল?'

—'হুঁ্যা।'

—'আপনার কথা বলার ধরণে একদম বোঝা না যায়!' বন্দনা জানায়। ও'র বাবা আমার দিকে ফিরে বলেন,

—'বাবা, কি গভর্ণমেণ্ট সার্ভেণ্ট ছিলেন ওখানে, চৌধুরী?' এ ছাড়া বোধহয় কৌলিন্য প্রকাশ পায় না ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর তৈরী সমাজে!

বলি,—'না। বাবা কিছু করেননি জীবনে।'

—'তাহ'লে সোর্স অব ইনকাম কি ছিল?' তরল প্রশ্ন মিসেস পি, বি-র।

—'এই, বাবার পৈত্রিক কিছু জমি-টমি ছিল আর কি।' সরলভাবে ব্যাপারটার ইতি টানতে যাই। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়।

—'জমিদারী?' মিঃ পি. বি. জিজ্ঞেস করেন। 'কোথায় বলুন তো?'

—'চিনবেন না, ওদিকে, ওই কোচবিহার আর গোয়ালপাড়ার কণ্টি-নিউএশনে, পাহাড়তলী একটা জায়গা।' ক্যামোফ্লেজ করতে চেষ্টা করি।

—'চৌধুরী······চৌধুরী······সোমেশ্বর স্টেট্ না? আপনার?' হাতড়ে হাতড়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যান পি. বি.।

লজ্জিত ভাবে বলি, 'আমার নয়, বাবার, মানে বাবা তার একটা অংশের মালিক। যদিও স্টেট-এর কোন অস্তিত্ব নেই, ফিফটি টু-তে এ্যাকোয়ার্ড হয়ে গেছে।'

—'ও! দেশভাগ হবার আগেই কলকাতায় সেট্‌ল্ করেছেন বুঝি?' মিঃ সিংহী জানতে চান।

—'না, না। পার্টিশনের অনেক পরে আমরা এসেছি এখানে।' চুপ করে থাকি খানিকক্ষণ। পাশের কচি বৌটি উঠে এসে মিষ্টি হেসে ভাঁজ করা কাগজটা ফিরিয়ে দিল। বললো, —'লাইক্‌ড ইয়োর ম্যাজিক। বাই এনি চান্স আর ইউ এ প্রোফেশনাল ওয়ান?' মেয়েটির প্রশ্নে অতি কষ্টে হাসি সম্বরণ করে বলি, —'নট এগ্‌জ্যাক্টলি, জাস্ট আই নো দ্য আর্ট অব মেকিং ইউ ফুল ফর দ্য মোমেন্ট।' কথাটা শেষ করতে, করতে, বাঁ হাতে ধরা ঝক-ঝকে কাঁচের গ্লাস ভর্তি জলটা ওর মাথায় উবুড় করে দি-ই। ও চীৎকার করে ছিটকে সরে যেতেই, হাসিতে ফেটে পড়ে আমার আশপাশের সবাই। ওর হাসব্যাণ্ডটি-ও! কাঁচের গ্লাসে গলার কাছে একটা, রূপোলী

লাইনিং আছে। যেটাকে দেখলে হঠাৎ ভুল হয়, জল ভর্তি গ্লাস বলে। আমার-ও হয়েছিল গতকাল রাত্রে। সম্পূর্ণ শুষ্ক জামা-কাপড়ের দিকে তাকিয়ে একদম ব্লাশড হয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল মেয়েটি। ওর বরটি তখনও হাসছে। 'ভেরী নটি'—কথাটা দূর থেকেও শুনতে পেলাম। বন্দনা নিউজপেপার দিয়ে নিজের মুখটা যথাসম্ভব ঢেকে শুধু উজ্জ্বল চোখ দুটো বের করে, হাসি চেক্ করবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আর এক রাউণ্ড চায়ের সাথে অন্য ছিটেফোঁটা কথা দিয়ে সকালের আসরটা খারাপ কাটল না। পারসোনাল্ কোলাম-এ চোখ বোলাতেই নজরে এল ছোট্ট একটা ইনসারশন —মিঃ এণ্ড মিসেস্ স্বপন দত্তগুপ্ত হাওড়া স্টেশনে যাঁরা সী-অফ করতে এসেছিলেন, তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে। এরা দু-জনেই তাহলে বাঙালী! যাচ্চলে, তো, এতক্ষণ ইংরাজি-বমি করছিল কেন? যত্তো সব! আমাদের টেবিলের সবাইকে কি পশ্চিমা মনে হচ্ছিল ওর!

জোর করে বিলটা আমি-ই মেটাই।

নাগপুরে ট্রেনটা থেমে আছে। দুপুর বারোটা প্রায়। একটি গ্রাম্য নবা-টাক প্রাপ্ত যুবক, তার নব-পরিণীতাকে দিয়ে ট্রেনের অপেক্ষায় বসে আছে। লাল ফুল আঁকা ট্রাংক, ডোরাকাটা শতরঞ্চি জড়ানো বিছানা, ছাতা, সব ই পায়ের কাছে জড়ো করা। যুবকটির এক-তৃতীয়াংশ বয়সের পুতুল পুতুল কনেটি, মাঝে মাঝে সলজ্জ দৃষ্টি ছুঁড়ে সদ্য পরিচিত মানুষটিকে জিজ্ঞেস করে কিছু একটা জেনে নিচ্ছে। সবকটার জবাব-ই যে পাচ্ছে, তা মনে হলো না। লোকটি যতটা সম্ভব গম্ভীর থেকে দু-একটা কথা ছুঁড়ে দিচ্ছে, অন্যদিকে তাকিয়ে। বোধহয় বোম্বে মেল থেকে এবং লোকাল যাত্রীরাও খুব উপভোগ করছে দৃশ্যটা। তাই, পারসোনালিটি রাখবার চেষ্টা করছে লোকটি। উভয়ের পায়ে-ই, ধুলোয় গ্রাম্য পথ চলার সাক্ষী বহন করেছে, নতুন জুতোজোড়া পার্শ্বধৃত কাপড়ের থলি থেকে উঁকি মারছে। বন্দনা, তার বাবা-মার সাথে এইমাত্র উঠে গেছে নিজেদের কম্পার্টমেন্টে। পাশের দত্তগুপ্তদের সাথে এত স্বল্প পরিচয়ে—এদৃশ্য ডেকে দেখানো যায় না।

ট্রেন আস্তে চলতে শুরু করেছে, মিনিট পনেরো বাদে। স্টেশনের অনেকেই শেষ কথাগুলো একটু চীৎকার করে বলছে। তাদের ভাবভঙ্গী দেখে বুঝতে পারছি। অনেকটা সিনেমার পর্দায় নিঃশব্দ ঠোঁট নাড়ার মতন। সাউণ্ড ট্র্যাক্ ফেল করলে, যেমনটি হয় কারণ, ডাইনিং কারের বন্ধ কাঁচের জানালা ভেদ করে শব্দটা ঠিক আসছে না।

শহর ঘর বাড়ি শেষ হতেই, কিছু ইন্ডাস্ট্রিয়াল শেড পার হলাম।

তারপর ছোট ছোট টাউনশিপের ফাঁকে ফাঁকে দিগন্তপ্রসারী মাঠ, খেজুর গাছ। শ্যাম-বাংলার শ্যামলিম ভাবটার খুবই অভাব। রুক্ষতার ফাঁকে মাঝে মাঝে ওয়েসিস উঁকি দিচ্ছে যদিও। পুকুর, ডোবা—এইসব। অর্ধ শুষ্ক।

অনেকে লাঞ্চ সারতে টেবিল দখল করছে। অনেকক্ষণ একা আটকে রেখেছি এই টেবিলটা। উঠে নিজের কম্পার্টমেন্টের দিকে এগোই।

কয়েকটি উর্দিপরা বেয়ারা, খাবারের অর্ডার নিচ্ছিল। আমার সাথে দেখা হতেই মিসেস্ পি. বি বললেন,

—'তোমার খাবারের, অর্ডার দিয়ে দিয়েছি, চিকেন খাও তো ?'

ঘাড় নেড়ে জানাই, 'খাই'। মনে মনে টুক করে ভেবে নিলাম ও'র 'তুমি', এই আত্মীয়-সুলভ সম্বোধনটি এই প্রথম বার! মুখে বললাম।

—'ট্যু আরলি না ? এইমাত্র তো 'লাঞ্চ' সারলাম !'

—'এখন দেবে না তো, সে-ই এ্যাঙ্কোলাতে, দেরী আছে।' মিসেস্ পি বি. জানান। এদিক ওদিক তাকাতে দেখে বন্দনা জানালেন,

—'নেবে গেছে ওরা !' হেসে বললেন, 'কণ্ডাক্টর ভদ্রলোক ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনটে কম্পার্টমেন্ট পেছনে দুটো বার্থ খালি পাওয়া গেছে, কল্যাণ পর্যন্ত।' চোখে মুখে বেশ একটা বিজয়ীর হাসি ভাবটা—কেমন দিলাম একখানা···।

—'কল্যাণ-এর পর কোন অ-কল্যাণ ওদের আবার যদি চেঞ্জ করতে বলে ?' চোখে মুখে আশঙ্কা ফুটিয়ে তুলি।

—'আরে কল্যাণ কোথায় ! তখন তো পোঁছিয়েই গিয়েছে।' হেসে ওঠেন বন্দনা।

মিঃ পি. বি বললেন, 'ভোর পাঁচটা নাগাদ কল্যাণ রীচ করবে, কাল। পরের কয়েক ঘন্টা ম্যানেজ করে নেবে নিশ্চয়ই।' বেশ সুচিন্তিত মত পেশ করেন পি বি।

—'ও।' বলে নিজের সীটের দিকে এগিয়ে যাই। বিছানায় বসে ম্যাগাজিনগুলো খুঁজছি ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে। নেই ! মেয়েদুটির কাছেও দেখলাম না। ওদের সাথে চোখা চোখি হতে ওদের একজন ইশারায় উল্টোদিকে দেখাল। সেই পাঞ্জাবী লোকটি গভীর মনোযোগ নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছে। এদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গেছে, ছুতো, আবার কি ? ছোট মেয়েটি একটু আহ্লাদী সুরে বললো, 'ডু ইউ স্টে এ্যাট বান্দ্রা এরিয়া, মিঃ চৌধুরী ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, —'হাউ কুড ইউ কাম ট্যু নো মাই নেম ?' ওরা একসাথে হেসে আঙুল দিয়ে ব্রিক-কেসটা দেখাল।

সেখানে আমার ভিজিটিং কার্ডটা গোঁজা আছে ভুলে গিয়েছিলাম। হেসে বললাম,

—'ডিড ইউ মীট মী এ্যাট্ বান্দ্রা, বিফোর?' পরিহাসচ্ছলে বলি।

—'মাইট বী উই আর কন্‌ফিউজড্।' ওরা সবিনয়ে জানায়! ওদের বাবা সকালে স্নানের পর নতুন তিলক টেনেছেন কপালে। বসে বসে পূজোও সেরে নিলেন মনে হলো।

আমাদের কথা শুনছেন। বড় মেয়েটির কাছ থেকে জানা গেল অনেক কথা। ও উঠে এসে আমার বিছানায় বসল। দেখাদেখি ওর পিঠ ঘেঁসে কনিষ্ঠাটিও। ওদের নামও জানা হয়ে গেল। নারায়ণী, দ্বিতীয়টি দেবকী। চট্ করে ইণ্টিমেট্ হতে জানে। ইংরাজী মিডিয়াম্ স্কুলে পড়ার এই একটাই লাভ। বলছে, 'আই মেট্ ইয়োর পেরেণ্ট্‌স্ দিস মর্ণিং।' চমকে গেলাম! কার কথা বলছে এরা!

—'এ্যাণ্ড অল্‌সো ইয়োর সিস্টার—আহ্ শী ইজ এ চার্মিং লেডী।' ওর পক্ক কথায় বুঝতে পারি, ওরা আমাকে সিংহীদের পরিবারভুক্ত একজন ঠাউরেছে। ভুলটা আর ভেঙে দিই না।

—'ইউ টু হ্যাভ মাচ্ রিজেমব্লেন্স।' দেবকী হেসে বলে।

—'রীয়েলী!' মজা করে বলি। আমার ডান হাতের চেটোতে কি একটা রং লেগেছে, তাই ঘসছিলাম। সেদিকে তাকিয়ে নারায়ণী বলল, 'ওহ্ হোয়াট এ বিউটিফ্‌ুল ফেট লাইন! এ্যাণ্ড ইউ হ্যাভ এ গার্ডল্ অব্ ভেনাস ট্যু! ইণ্টারেস্টিং!' চোখে চোখে তাকিয়ে বললাম—'ইউ নো প্যামিস্ট্রি?' উত্তর হলো, 'নো, আই ডোন্ট। মাই ফাদার ডাজ।' গম্ভীরানন্দ, এই প্রথম একটু হাসলেন! আমি কিছু বলার আগেই নারায়ণী ওর মাতৃভাষায় তার বাবাকে কি যেন অনুরোধ করল। গলার স্বরে শুধু অনুরোধটা ধরতে পারলাম। গম্ভীরানন্দ, স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমিও তথৈবচ। আমি ই এগোব না পেছোব ভাবছি, মেয়েদুটি সরে গিয়ে জায়গা করে দিল। ভদ্রলোক হাঁসফাঁস করে এসে আমার বার্থে আসন করে বসলেন। হাত মেলতে গিয়েছিলাম, সেটা একনজরে দেখে নিয়েই ছেড়ে দিলেন। উদাস দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'ড্যু ইউ নো ইয়োর বার্থ পারটিকুলারস?' হেসে ব্যাগ থেকে প্যাড আর কলমটা টেনে নিয়ে পুরো হরোসকোপটাই এঁকে দিলাম। খুব মনোযোগ দিয়ে খানিক দেখে, চোখ বন্ধ করলেন।

মেয়েদুটো দুষ্টু চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ খুলে, ভরাট গলায়, স্তোত্র বলার মত সংস্কৃতে কিছু একটা আওড়ালেন। সংস্কৃতে

৪

আমার বিরা-ট দখল ! পণ্ডিতমশাই জীবনে চব্বিশের বেশী মার্ক দেননি। স্কুল-ফাইনাল মার্ক-শীটে তিরিশ লেখা আছে যদিচ। এগজামিনারের গ্রেস-মার্ক নিয়ে হতে পারে। এরপর উনি শ্লোকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন 'টু ডে ইউ আর চেঞ্জিং ফর মানি, বাট এ ডে শ্যাল কাম, হোয়েন মানি উইল্ বি চেঞ্জিং ফর ইউ।' তারপর আর একটি শ্লোক। চাঁদের পজিশন নিয়ে বললেন। পুরো শ্লোকটার 'চন্দ্র' শব্দটাই বুঝেছিলাম বাকিটা 'সুকুমার রায়ের শিশিবোতলের' মতই চিবোনো কঠিন! শক্ত ঠেকল দাঁতে। অনুবাদটা এইরকম, 'দ্য এ্যাসেণ্ডেন্ট হেইলস্ ফ্রম এ ভেরি রীচ এণ্ড ইম্পর্টেন্ট ফ্যামিলি উইথ্ এ হাই সোশ্যাল স্টেটাস।'

আর স্টেটাস! উঁচুবংশের অক্ষমতাগুলো বংশদণ্ড হয়ে তাড়া করছে অষ্টপ্রহর! এ কথা ভদ্রলোককে বলি কি করে? তবু প্রেডিকশনগুলো টুক টাক্ বেশ লাগিয়ে দিচ্ছেন দেখে বেশ ইন্টারেস্ট নিয়ে শুনছিলাম! দুয়েকটা প্রশ্নও করেছিলাম। তারাবিবির কথা জিজ্ঞেস করাতে অনেকক্ষণ চুপচাপ কি যেন দেখলেন। তারপর বললেন,

— 'দিস্ টাইপ অ্যা হরোসকোপ জেনারেলী লিভস্ এলোন্। আই মীন উইদাউট ব্রাদার অর সিস্টার। ড্যু ইউ নো ইয়োর ফাদারস হরোস্কোপ্?'

মাথা নেড়ে জানাই, না মনে নেই।

উনি বলেন, 'ইন্ দ্যাট, উই মাইট ফাইণ্ড সাম রিফ্লেকশন অব হিজ ড্যটার।'

তারপর আরও কয়েকটা শ্লোক শুনলাম, যার সারমর্ম এই যে, আমি একটা মূল্যবান 'আত্মা', যার ওপর নাকি সহস্র সহস্র মানুষের অন্নসংস্থান নির্ভর করবে। আমি অচিরেই খ্যাতিলাভ করব যদিও আল্সেমির জন্য অনেক সুযোগ নষ্ট করব (এই জায়গায় ভট করে আজ সকালে দেরী করে ওঠার জন্য-ই একথা বললেন কি না, সন্দেহ হয়েছিল।) এবং মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাব, যদিও পাগল হয়ে যাবার কোন সম্ভাবনা উনি দেখছেন না......ইত্যাদি। এই সব বলে, উঠে নিজেদের সীটের দিকে যাবেন এমন সময় তাঁর স্ত্রী নিজের ভাষায় কি যেন একটা মনে করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক আড় চোখে একবার স্ত্রীকে ও একবার আমাকে দেখতে লাগলেন। মেয়ে দুটি দেখলাম তাদের মায়ের সাথে বেশ বচসা শুরু করে দিয়েছে। ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই ভদ্রলোক একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে বললেন,

— 'ইউ নো, আই কাম্ অব্ এ প্রোফেশনাল ফ্যামিলি। এণ্ড ইট্ ইজ আওয়ার এটিকেট টু এ্যাক্সেপ্ট সাম সর্ট অব ফিজ্ অন্ প্রোডিকশনস্ এণ্ড...'

বাধা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করে বলে উঠি,

—'সার্টন্‌লী. হোয়াটস্‌ ইয়োর ফিজ, প্লীজ ?' সবিনয়ে জিজ্ঞেস করি। বড় মেয়েটি তার মাতৃভাষায় বাবাকে একটি ধমকই দিয়ে ফেলল। আমি এতটুকু অপেক্ষা না করে ওয়ালেটটা হাঁ করিয়ে পাশ থেকে গোটা কয়েক লাল নীল সবুজরঙের ট্র্যাকটর ও সূর্যাস্তের ছবি মার্কা নোট বের করে ফেলি। ভদ্রলোক ম্লান হেসে বললেন,—'নো. নট্‌ দিজ। ডু ইউ হ্যাভ স্মল কয়েন্‌স ?'

অবাক হয়ে ব্যাগ থেকে খুচরো ভর্তি এ্যালকাথিনের থলেটা এনে খুলে বিছানায় ঢালতে শুরু করি। ট্র্যাভেলের সময় খুচরোগুলো খুব কাজে লাগে। এটা বরাবর সঙ্গে রাখি।

—'স্টপ্‌. স্টপ্‌ নো মোর।' উনি বলেই নীচু হয়ে তাঁর লজ্জিতা কন্যাদ্বয় এবং স্তম্ভিতা স্ত্রীর, তিনজোড়া চোখের সম্মুখে, একটা দু'নয়া পয়সা তুলে, পরম তৃপ্তি সহকারে সেটি কপালে ঠেকিয়ে কোমরে গুঁজে রাখলেন! একটি অর্থপূর্ণ হাসি ছুঁড়ে বললেন,

—'দিস ইজ মাই কাসটম।' আমি-ই এবার খুব লজ্জিত হয়ে ওয়ালেট ও খুচরোর থলেটিকে যথাস্থানে ফেরৎ পাঠালাম। মেয়েদুটিও চট করে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। বাবা যে তাদের প্রেস্টিজটা প্রিজারভ করতে পেরেছেন, এইতেই তারা চমৎকৃত।

ভদ্রলোককে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে জানালা দিয়ে দৃষ্টিটাকে হালকা ভাবে মেলে দিলাম শূন্যে। রাস্তায় না বের হলে মানুষ চেনা যায় না। একই পরিবারের পাঁচটি প্রাণী পাঁচরকম পারসোনালিটি ধরে! আশ্চর্য! কানে আসছে চাপা কন্ঠের অনুযোগ। নারায়ণী তার মাকে ঠান্ডা করছে। এমন দাঁওটা ট্রেনে বসে……। সত্যি খুব আফ্‌শোষের কথা।

শূন্য মন নিয়ে খানিক বাইরের দৃশ্য দেখে ফের গাড়ীর ভেতর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতেই নারায়ণীর সাথে চোখাচোখি হ'লো। ও উঠে এসে আমার মুখোমুখি খুব কাছেই এসে বসল। একটু হেসে অনেক গল্প ফেঁদে ফেলল কলকাতায় কতদিন হলো আছে. দেবকী আর ওর, কোন কলেজ, কোন ইয়ার, বাবার চেম্বার কোথায় এবং কলকাতার বাঙালী ছেলে-মেয়েরা কী ভদ্র এবং 'কো অপারেটিং ইত্যাদি ইত্যাদি।

হঠাৎ মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি এল। জানালার ওপর রাখা ওর কাঁচের চুড়ি পরা হাতটা আলতো করে চাপ দিয়ে বললাম, 'কাম ক্লোজার।' ও একটু অবাক হয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে

আরেকটু সামনের দিকে ঝুঁকে এল। ওর ডান হাতটা নীচু করে মেলে ধরে বললাম,

—'আই হ্যাভ এ স্পেশাল মেথড্ অব রীডিং।'

ও খুব অবাক হয়ে বলল, 'ফ্যাক্ট ?'

আমি দুলিয়ে দুলিয়ে মাথা ঝাঁকালাম।

ও এবার আরেকটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলল, 'আই উইল টেস্ট। টেল মী সামথিং, কংক্রিট, নো ভেগ ফোরকাস্টস।'

হাতটাকে, আঙুলগুলোকে উল্টে পাল্টে বললাম —'ইউ আর ইন লাভ—ইন ডীপ লাভ।'

মাথাটাকে বাঁকিয়ে চোখদুটো কোণায় তুলে এনে কিছুক্ষণ আমার চোখ স্টাডি করে নিয়ে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলো, 'এনিথিং এবাউট হিম ?' যা বলতে এত তোড়জোড়, সেটাই আর ভূমিকা না বাড়িয়ে বলে ফেললাম, 'ইউ আর ইন লাভ উইথ এ—উইথ এ ইফ মাই রীডীং ইজ নট রং –এ বেঙ্গলী বয়। এণ্ড হি ইজ হ্যাণ্ডসাম।'

মেয়েটি লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল ; মাথা নীচু করে আমার হাতে একটু চাপ দিল। দেবকী পেছনে এসে বসেছে, চোখে মুখে কৌতুকের চাপা হাসি। ওর হাতটা টেনে নিয়ে চট করে বললাম, —'ইউ আর উইক ইন ম্যাথমেটিকস, কনসাল্ট এ প্রোফেসর।' দেবকী নয়, নারায়ণী উত্তর দিল—কথাটা ভীষণ সত্যি। দেবকী এখন পাড়ার এক প্রোফেসরের বাড়িতে গিয়ে অঁাক কষে। দেবকী একটু ফ্লপড হয়ে-ও কৌতুক করে বলল, 'এণ্ড হোয়াটস ইয়োর ফিজ প্লীজ ?' অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলি, 'হা-মী-জ।' ওরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, 'হোয়াট ইজ এ হামী ?'

—'নট এ হামী। শুদ্ধ করে দিয়ে বলি —'ফর টু ক্লায়েণ্টস্ টু হামিজ।' অবাক চাউনী জোড়ার দিকে চোখটা বুলিয়ে এনে বলি, 'আস্ক এনি বেঙ্গলী বয় অর গারল নেক্সট টাইম ইউ মীট দেম !' ওদের একটু চিন্তিত দেখলাম।

১০

পাঞ্জাবী ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে ম্যাগাজিনগুলো ফেরৎ দিলেন। ইলাস্টেটেড উইকলিটাই বেছে নিয়ে খুলে বসলাম। পাকিস্তান ও ভুট্টোর রাজনীতিটা পড়ছিলাম। প্রথমে মন বসছিল না। আস্তে আস্তে বেশ সাবজেক্টের ভেতর ঢুকে গেলাম। কখন দক্ষিণী কন্যাদ্বয় উঠে গেছে, কখন মিসেস পি বি. এসে সেখানে বসেছেন। একদম টের

পাইনি। উনিও কী একটা ম্যাগাজিন খুলে পাতা ওলটাচ্ছেন। টপিকটা শেষ করে পাতা ওলটাতে গিয়ে বেগুনী রঙের শাড়ীর পাড়টা চোখে পড়ল। তাকিয়ে বললাম, 'একি আপনি এখানে, বলেননি কেন?'

—'না—তুমি পড়ছিলে।' স্নিগ্ধ স্বরে বলেন।

—'মিঃ সিংহী কি করছেন?' ক্যাজুয়েলী কথাটা বলি।

—'ও, উনি তো ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছেন।'

—'পরীক্ষা, মানে কার কাছে!' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করি।

—'নিজের কাছেই। পেসেন্স্ খেলছেন। ওই ওঁর বাতিক।'

—'আপনাদের সাথে হঠাৎ আলাপ, মিসেস্ সিংহী, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কতদিনের আলাপ। অবশ্য এর একটা কারণ আমি বুঝতে পারছি'

—'তুমি আমার ছেলের বয়সী, মিসেস্ সিংহী-টিংহী ওইসব অফিসিয়াল্ নাম বোল না, ভাল লাগে না। তুমি আমাকে মাসীমা বলবে কেমন?' স্নিগ্ধ হাসিতে উদ্ভাসিত হন মাসীমা।

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমারও খুবই অস্বোয়াস্তি হচ্ছিল। বাঁচালেন।' জোর দিয়ে বলি।

—'বন্দনা, তোমার ডাক নাম বলতে পারল না। বলল ব্রীফ্‌কেসে কার্ড গোঁজা দেখেছি, আর, আর, চৌধুরী। আরও বলল এমন ভদ্র ছেলে ইউভার্সিটির ওই দঙ্গলের মধ্যেও দেখেনি। রাতে নাকি ওকে ঘুমের ভেতর র‍্যাপার চাপা দিয়ে গেছ? আরও অনেক বলছিল সব। আমি বললাম, হবে না রাজার ছেলে যে। কত বড় বংশ।'

এতক্ষণ একটু একটু হাসছিলাম এবার বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনি এরকম বলবেন না মাসীমা। আমার বাবা ঠাকুরদা রাজা ছিলেন—আমি তো একেবারে চাকুরীজীবী প্রোলেতারিয়েৎ! পুরোনো পরিচয় সব পেছনে পড়ে গেছে, এখন ওই পরিচয় কোথাও দিই না, কোন কাজে আসে না।'

মাসীমা বললেন, 'না, ওকথা বলতে নেই। পরিচয় ভুললে চলবে কেন? তোমার পিতৃ-পরিচয়ই তোমাকে অন্যায় কাজ থেকে, ছোট মনের কাজ থেকে নিবৃত্ত রাখবে। আর, পেছনে তো সবাই ফেলে আসে পুরোনো জীবন। আমার শ্বশুরের যা সম্পত্তি ছিল, তার অত ভাগ হয়ে, ওঁর কী-ই বা আছে। যা গেছে সেটা তো অর্থ সম্পদ, যা আছে বা যা থাকে সেটা কাল্‌চার। এ জিনিস টাকা দিয়ে কেনা যায় না বাবা।'

—'বাঃ আপনি খুব সুন্দর কথা বলেন কিন্তু!'

মাসীমা হেসে বলেন, 'সুন্দর নয় এটাই স্বাভাবিক কথা। আর ওই—কাল্‌চারটা তোমার রক্তে আছে বলেই, তার মার্জিত বহিঃপ্রকাশ, পরকে আপন

করে নিতে পারছে। ও হরি তোমায় যে কথা জিজ্ঞেস করছিলাম কথায় কথায় সেটা ভুলেই গেলাম! কী নামে ডাকবো তোমায় বললে না তো?'

হেসে বলি, 'মা আমাকে রাজু বলে ডাকেন। মাব বোনও তাই ডাকতে পারেন।'

—'ও রাজা থেকে রাজু?' মিষ্টি হেসে বলেন মাসীমা।

—'হ্যাঁ।' উত্তর দিই।

— 'না, মায়ের আদরের ডাকটা কেড়ে নেব না। আমি রাজার ছেলেকে রাজা বলেই ডাকবো।' আমি সশব্দে হাসতে থাকলাম।

তারপর অনেক আলোচনা হলো — নানান বিষয় নিয়ে। আগে পূর্ব-বাংলার লোকেদেব সম্বন্ধে খুব বিরূপ ধারণা ছিল। বছর দশেক হলো কল-কাতায় আর শ্রীরামপুরের কয়েকটি ফ্যামিলির সাথে পরিচিত হয়ে ধারণা আমূল পাল্টে গেছে। কথাটা সোজাসুজি না বললেও একথাটাই উনি হয়তো বলতে চাইছিলেন যে, ইংরেজ তার নিজের সুবিধার্থে কলকাতায় যে সমাজ তৈরী করেছিল তার কোন ঐতিহ্য নেই। বরঞ্চ পূর্ববাংলার দীর্ঘ ইতি-হাস, ঐতিহ্যবাহী। ধার করা নয়। নিজস্ব স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে টাকাকে এমনভাবে চিনিয়ে দিয়ে গেছে যে বিদ্যা, শিক্ষা, শিল্প সব-কিছুই অর্থহীন, যদি না ব্যাঙ্ক্ ব্যালান্স-এর কিছু আঁচ তার কথায় ও ব্যবহারে প্রকাশ পায়

আরও একটা কথা বলেছিলেন মাসীমা। ছোট্ট একটা কথা, কথার ফাঁকে বলে ফেলেছিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ অন্য কথায় ঢেকে দিয়েছিলেন। সন্দেহ নেই, একটা তীব্র ব্যথার কথা, আঘাতের কথা। আমার হাতটা ধরে বলে-ছিলেন, 'একথাটা তোমায় বললাম, ওঁকে কিন্তু বোল না। উনি খুব রাগ করবেন।' আমি মাথা নীচু করেছিলাম। হঠাৎ বেশ সচকিত হয়ে উঠলেন মাসীমা,— একী! তোমার গা এত গরম কেন? দেখি দেখি......' কপালে গলায় হাত দিয়ে বললেন, 'তোমাব তো বেশ জ্বর রাজা!' আমি একটু পাল্স্ বীট কাউন্ট করে বললাম —'হ্যাঁ, কেমন একটা লাগছিল, কিন্তু জ্বর ঠিক বুঝতে পারিনি।' উনি খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি নিজের বাথে ফিরে গিয়ে কী একটা নিয়ে ফিরে এলেন, সাথে বন্দনা। চোখে কৌতুকের হাসি।

—'বাস্ এখন আপনি লেডী ডাক্তারের পেশেণ্ট!' হাসতে হাসতেই বললেন বন্দনা। মাসীমা একটা হোমিওপ্যাথির শিশি, কর্ক খুলে আমার মুখের কাছে এনে বললেন, 'হাঁ কর। জীভ?' জীভের ওপর গোটা কয়েক গ্লোবিউল্স্ ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'কমন্ কোল্ড থেকে হয়েছে সেরে

যাবে।'

ও'রা দুজনেই আমাকে জোর করে শুইয়ে দিয়ে ঘুমোবার নির্দেশ দিয়ে নিজেদের জায়গায় ফিরে গেলেন। বলে গেলেন খাবার এলেই ডেকে দেবেন। তখন কেমন থাকি দেখে, যা ইচ্ছে হয় খাবো। হোমিওপ্যাথিতে আমার খুব একটা আস্থা নেই কোনকালেই। যদিও ভুলটা ভেঙে দিয়েছিল বন্ধুবর ডাক্তার প্রণব চক্রবর্তী। এ্যালোপ্যাথ-হোমিওপ্যাথ ও। বলেছিল দুটোর কাজ একেবারে ভিন্নপথে। একসাথে দুটো খেলে কিস্সু ক্ষতি হয় না। কলকাতায় কয়েকটা স্টিক্ নেক্-এর আর্থ্রাইটিস কেস, আর ম্যালিগ্-ন্যাণ্ট ব্রেণ-টিউমার কিওর করে ম্যাজিক দেখিয়ে ফেলেছিল ছেলেটা। অনেক সার্জেনের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল একেবারে কিন্তু এখানে, এই ট্রেনের মাসীমার কী এতটা দখল আছে! ওঁরা চলে যেতেই টুক করে নিজের কোম্পানীর দু'টো এ্যানাল্জেসিক ট্যাবলেট বের করে গিলে নিলাম। স্ট্রিপ্-এর ছেঁড়া কাগজগুলোর বাইরে ফেলে দিলাম যাতে প্রমাণ না থাকে।

দক্ষিণী কন্যাদ্বয় আমাকে লক্ষ্য করছিল। বললো, 'ইয়োর্ মাদার্ ইজ এ ডক্টর, ইজইন্ট শী?'

বললাম, 'অলমোস্ট।' মেয়ে দুটি হাসবে কিনা বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল। শুতে শুতে বললাম, 'আই অ্যাম্ এ্যাটাক্ড্ উইথ এ ম্যালিগ্ন্যাণ্ট টাইপ অব্ ট্যাঙ্গানাইকান ফ্লু।'

নারায়ণী অবাক হয়ে বললো, 'হাউ কুড্ ইউ বী দ্যাট শীওর অব দ্য ডিজিস!'

মুচকি হেসে পাশ ফিরে শুয়ে বললাম, 'আই অ্যাম্ ইন লাভ উইথ এ্যাকিউট্নেস এণ্ড ম্যালিগ্ন্যান্স।'

চোখ বন্ধ করে ভাবছিলাম। চোখ দুটো, মাথার পেছনটা এবং একটু পরেই কোমরটা মৃদু মৃদু ব্যথা করতে লাগলো। আমার জ্বর হলেই দেখেছি, প্রথমদিকে দারুণ ভিরুলেন্স দেখা দেয়। চুপচাপ শুয়ে থাকলেই বেশ ভাল থাকি। ট্যাবলেটগুলোর এ্যানাল্জেসিক্ এফেক্ট শুরু হলো। এতে একটু ফেনোবার্বিটোন মেশানো বলে ঘুমটাও এলো চট করে।

১১

এ্যাঙ্কোলা নয়, ঘুমটা একটু আচ্ছন্নের মত ভাব নিল রাত আটটায় তখন ট্রেন কি একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন মাসীমা। গায়ে আমার শালটা জড়িয়ে দিয়েছেন। মাসীমার এ সস্নেহ শুশ্রূষা মায়ের

উপস্থিতি এনে দেয়। এখন চোখ খুলে তাকালেই অস্বস্তি এসে গ্রাস করবে। তার চেয়ে চোখ বন্ধ করে থাকলে মায়ের সান্নিধ্যের মধ্যে থাকা যায়।

ওই অবস্থায়-ই মৃদু আলোচনা শুনতে পেলাম। 'ওর কিছু খাওয়া দরকার।' মাসীমার গলা। 'আরে একদিন না খেলে কিছু হবে না, ফাস্টিং-এই ভাল হবে।' মেসোমশাই-এর উপস্থিতি হঠাৎ টের পেলাম। 'ঘুমোলে ডিস্টার্ব না করাই তো ভাল।' ঠিক আমার মনের কথাটা বলল, বন্দনা।

একটু নড়েচড়ে চোখ মেলে তাকালাম। মাসীমা পরম আগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, 'খিদে পেয়েছে ? একটু কিছু খাও কেমন ?'

বললাম, 'ইচ্ছে করছে না।'

উনি বললেন, 'এখন জ্বরটা কম আছে বিকেলটা তো একেবারে ভাজা ভাজা হয়েছিল। একটু চিকেন স্টু খেয়ে নাও।' উঠতেই হলো। বন্দনা, একটা স্টীলের বাটী আর চামচে এগিয়ে দিল। আবার শুয়ে পড়লাম। মাসীমা আর ক'টা হোমিওপ্যাথী ওষুধ খাইয়ে গেলেন। চলে যেতেই আমিও দুটো কোম্পানিকা ট্যাব্‌লেট্‌ খেয়ে ঘুম দিলাম। অন্য কারোর দিকে তাকাতে আর ইচ্ছে ছিল না।

১২

রাতে স্বপ্ন দেখলাম পাকিস্তান বম্বিং করছে বালুরঘাটে। একটা ব্রীজ-এর এপাশে, ওপাশে, গোলা এসে জলে পড়ছে। ব্রীজটার গায়ে লাগছে না। নদীর জল ছল্‌কে ছল্‌কে উত্তাল হয়ে উঠছে বুম বুম শব্দটা দূর থেকেও আসছে। মাঝে মাঝে এয়ার রেডের সায়রেন বাজছে !

একটা ট্রেঞ্চের দেওর সোঁদা গন্ধ নাকে নিয়ে শুয়ে আছি। আর খালি মনে হচ্ছে অফিসে জানানো হলো না, এখন কাল সকালে যদি বাস না পাই ! বস যদি সার্‌প্রাইজ ভিজিট্‌ দেয় জলপাইগুড়িতে ? খু-ব মুস্কিল হ'লো। ভোরের বাসটা যদি মিস করি ! যদি ঘুম না ভাঙে ! ·· ··· ··· !

হঠাৎ মনে হলো ট্রেঞ্চে নয় ট্রেনে শুয়ে আছি আমি। যাচ্ছি বোম্বে। সেখানে বম্বিং হবে কিনা জানিনা আবিশ্যি। চোখ বন্ধ রেখেই পাল্‌সটা বোঝার চেষ্টা করলাম। একশর ওপরে জ্বর। পিঠে, কপালের দু'পাশে খুব ব্যথা।

চোখটা একটু ফাঁক করে কব্জির দিকে তাকিয়ে দেখে নিলাম। সকাল সাতটা। টেনে টুনে উঠে পড়লাম। মুখটা খুব বিস্বাদ লাগছে। মুখটা

ধুয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। টুথ ব্রাশ-টাশ বের করে, টয়লেটের দিকে এগোবো, নারায়ণী জিজ্ঞেস করল —'হাউ আর ইউ ?'

একটু বিকৃত হেসে বললাম, 'বেটার।'

বন্দনাদের সব প্যাক করা হয়ে গেছে। আমায় দেখে মাসীমা বললেন, 'এই যে, বেশী জল ঘেঁটো না। আর মুখ ধুয়ে এসো, কথা আছে।'

বাথরুম থেকে ফিরে ওদের তিনজনের কাউকেই সীটে দেখলাম না। নিজের সীটে ফিরে দেখি আমার হোল্ডলটায় জিনিসপত্তর ভরে ওঁরা প্যাক করে দিয়েছেন। এত তাড়াহুড়োর কোন দরকার ছিল না। ভি. টি. পৌঁছোবে তো, আটটায় ! মিঃ সিংহী আমাকে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন, 'তোমার মাসীমা কি বলছেন শোন।'

মাসীমা বললেন, 'তুমি কি ওই তোমার কে দু'জন কাজিন্ আছে বোম্বেতে, তাদের কারুর ওখানেই উঠবে—না হোটেলে ?'

একটু চিন্তা করে নিলাম। ওঁরা আমার অবস্থাটা বুঝেই বলছেন কথাটা। কারুর হেফাজতে থাকলে এঁরাও একটু নিশ্চিন্ত হন। তবুও মালা বা পুপুর বাড়ীতে খবর না দিয়ে হঠাৎ জ্বর গায়ে হুট করে উপস্থিত হওয়ার কথা চিন্তাই করা যায় না। বললাম, —'প্রথমে একটা হোটেলে বা ভিটির রীটায়ারিং রুমে উঠি। পরে কারও বাড়ীতে যাব কিনা ভাবব।'

—'তোমার মত বাইরে মিশুক ভেতরে লাজুক ছেলের পক্ষে কাজিনের বাড়িতে ওঠা আর হবে না। তুমি আমাদের সাথে চল।'

—'কোথায় ?' অবাক হবার বাকী ছিল তখনও।

—'আমরা যেখানে উঠব, আমার বোনের বাড়ী ! ওদের বিরাট বাড়ী, তোমার কোন অসুবিধে হবে না।' মাসীমা নিশ্চিন্ত সুরে কথাটা শেষ করলেন।

—'না না, তা হয় না। আপনি শুধু-শুধুই ব্যস্ত হচ্ছেন মাসীমা। আমার এইটুকু জ্বরে কিসসু হবে না। এরকম বাইরে থাকতে আমার কত-বার জ্বর হয়েছে। ও সেরে যাবে। আপনি ভাববেন না।' অনেকটা কথা বলে হাঁপিয়ে উঠি।

—'তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকছো।' স্পষ্ট উক্তিতে একটু থতমত খেয়ে মিঃ পি বি-র দিকে তাকিয়ে বললাম,

—'মেসোমশাই আপনি বোঝান তো ওঁকে। আমার কিছুই হয় নি…।'

বাধা দিয়ে পি বি বললেন, 'আমাদের সাথে থাকতে তোমার কিন্তু কোন কষ্ট হ'ত না। ওদের বাড়ীর সবাই খুব মিশুকে। তোমাকে পেলে ওরা কিন্তু আনন্দিতই হতো।'

৫

আমি ইতস্তত: করছি, বন্দনা বললেন, 'মাকে জীবনে কেউ মত ঘোরাতে পারে নি তর্ক করে লাভ নেই, মা যখন ঠিক করে ফেলেছেন তখন আপনাকে যেতেই হচ্ছে।'

আমি অসুস্থতার জন্যেই হোক, কিম্বা প্রথম বোম্বে যাচ্ছি বলেই হোক, পরিচিতির সুবিধের কথাটা ভেবেই মেনে নিলাম। কথা বলছিলাম না। অর্ডার দেয়া ছিল, বেয়ারা—চা, টোস্ট্, ওমলেট্ সার্ভ করে গেল। 'তুমি ডিমটা খেয়ো না।' মাসীমা প্রেস্ক্রিপ্শান্ করলেন। বন্দনা চা ঢালছেন। খুব তাড়াতাড়ি চা-টা খেয়ে নিলেন ও'রা।

একটা স্টেশনে ট্রেন ঢুকতেই ও'রা সবাই উঠে নিজেদের জায়গায় গেলেন। একটা কুলিকে নিয়ে বন্দনা এদিকে এলেন।

বললাম, 'এখুনি ?'

—'উঠুন, এখানে নামবো আমরা।'

আমি বললাম, 'এটা কোথায় ?' উঁকি দিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল 'দাদার !' এখানে নামলে আমার বোম্বের কাজের অসুবিধা হবে কিনা ভাবছি। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, মালপত্রগুলো সব নাবিয়ে মিঃ পি বি. বললেন—'এখান থেকে প্রতি দু'মিনিটে ভিটির দিকে একটা লোকাল্ ট্রেন পাবে। তোমার কোন অসুবিধা হবে না।'

র‍্যাপারটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিতে নির্দেশ দিয়ে মাসীমা কুলিদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। আমরাও ধীরে তারই অনুগামী হলাম। হঠাৎ মনে হতেই ফিরে তাকিয়ে দেখি খোলা দরজায় দ'াড়িয়ে দুই বোন, নারায়ণী আর দেবকী। চোখাচোখি হতেই ওরা হেসে বিদায় জানাল। নারায়ণী হেসে বললো, 'উই উইল্ বী মিটিং সামটাইম্স্, সাম্ হোয়্যার এগেন !' বললাম, 'আই হোপ্ সো।'

১৩

প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে একটা ট্যাক্সিতে মাল তুলে আমরাও উঠে বসলাম। আমাকে আগেই তুলে দেয়া হয়েছিল। এক কোণায় বসে নতুন অবস্থাটাকে মেনে নিতে চেষ্টা করছিলাম। মাঝখানে বন্দনা, অন্য কোণায় মাসীমা। সামনের সীটে মিঃ সিংহী। টাউন না বলে দাদারকে একটা সিটি বলা যায়। মূল বোম্বে থেকে মাত্র আধ ঘণ্টার পথ। এটাকে বোম্বের এক্সটেন্শন্ বলা যেতে পারে। আমাদের ঢাকুরিয়া-যাদবপুর-গড়িয়া বা ওদিকে বরাহনগর বা দমদম এর মত। তফাৎ এটা একটা প্ল্যান্ড্ টাউনশীপ্। আর আকাশ

চুম্বি বিল্ডিং-এর কিউ।

টাউনটাকে একটু মাঝখানে রেখে কোন এক নাম না জানা রাস্তা আর ক্যানেলের মত দু'ভাগ হয়ে রেলওয়ে ট্র্যাক চলে গেছে। রাস্তাটার অপেক্ষাকৃত নির্জন পরিবেশ। রেললাইন আর রাস্তা যেখানে একটা শার্পবেণ্ড্ নিয়েছে, ঠিক সেখানেই একটা কম্পাউণ্ডওয়ালা বাড়ী। ফুলের গাছে সাজানো। এন্ট্রান্সে দু'টো থুজা। তার ভেতর দিয়েই পথ। ট্যাক্সির হর্ণে আকৃষ্ট হয়ে তিনটে তিন জাতের কুকুর, বাংলো থেকে বেরিয়ে এলো, তারস্বরে কণ্ঠ ও ল্যাজের আস্ফালন চলছে। একটা গাড়ি বারান্দা মত করা আছে। তার তলায় গাড়ীটা গিয়ে থামল। একজন মহিলা, চেহারা দেখে বোঝা যায় মাসীমার সহোদরা। দুজন সমবয়সী ছেলে আর মেয়ে চোখের দৃষ্টিতে অভিষিক্ত করছে, চারজনকেই। চ্যাঁচামেচি, হৈ চৈ-এর ভেতর সবাই ঘরে ঢুকছে। আমি তখনও দাঁড়িয়ে নিপুণ হাতে তৈরী এই স্বর্গোদ্যানটা দেখছি। আর ভাবছি এর কারিগরটি কে হবে। ভারি গলার ছেলেটি আমার দিকে আপাদমস্তক দৃষ্টিটাকে বুলিয়ে নিয়ে সোজা এ্যাবাউট্‌টার্ণ হয়ে সিঁড়ির মাথায় অপেক্ষারতা বন্দনার দিকে তাকিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে প্রশ্ন করল, 'হ্যাভ্ ইউ ইম্‌পোর্টেড্ দিজ্ হিরো ফ্রম রে-জ্ ফিল্ম ?' ওর কথা বলার ধরনে উপস্থিত জনতা, একটা হাসির দমকে, কুকুরগুলোকে পর্যন্ত চমকে দিল। মৃদু হেসে একটু এগিয়ে মালপত্রগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। বন্দনা-ই এতক্ষণে আলাপটা করিয়ে দিলেন। —'ইনি রাজা চৌধুরী, আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড। বর্তমানে মার পেশেণ্ট।' আমার ডাকনামটা মাসীমার কাছে শুনে থাকবে। 'ইনি মাসীমা যাঁর কিছু অন্ন ধ্বংস করতে আমরা এসেছি।' মাসীমা (দুই) কপট রাগ করে বন্দনার কানটা ধরে একটু টানেন। বন্দনা অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন, 'এরা আমার ভাই আর বোন—ভিক্টর এবং রাধা।' নমস্কার বিনিময়ের পর মাসীমা বললেন, 'রাজার পথে খুব জ্বর ; ও বেচারা একটা খু-ব জরুরী কাজে বোম্বে এসছে। এখন ভালোয় ভালোয় ফিরলে হয়। ওকে এখনই একটা শোবার ব্যবস্থা করে দেয়া দরকার।' মাসীমা (দুই) এইবার তৎপর হয়ে আমাকে নিয়ে আসতে বলে, চেঁচিয়ে কাকে কী যেন একটা ইন্‌স্‌ট্রাক্‌শন দিতে দিতে, ভেতর বাড়ীর দিকে চলে গেলেন। ভিক্টর চোখ টিপে আমার হাতটা ধরে টেনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, 'রিয়েলী, আর ইউ সিক্, আই থট্ ইউ ওয়্যার্ ফাইণ্ডিং দ্য রাইট্ এক্সপ্রেশন্ ফর্ এ মেলোড্র্যামাটিক্ সীন্।' রাধা ও বন্দনার হাসির ভেতর অপ্রস্তুত আমি ধীরে ধীরে একটা নীলাভ ঘরে প্রবেশ করলাম। আমার জিনিসপত্র আগেই রেখে গেছে কেউ। বিছানাটা

নতুন চাদর দিয়ে পরিপাটী করে পাতা। পাশে টিপয়ের ওপর কাঁচের গ্লাসে জল, ঢাকা দেয়া। খাটের একপাশে কাঁচের জানালা দিয়ে বাগানটার আংশিক দৃশ্যমান। অন্যপাশে একটা উঁচু ড্রেসিং টেবিল, সামনে কুশান। দরজার পাশেই সুইচ্‌বোর্ড। আর তার পাশে দেয়াল থেকে ঝোলানো আলনা।

আমি বিছানায় বসে বসে চারদিকে তাকাচ্ছি। রাধা বললেন, —'শুয়ে পড়ুন, আপনার লজ্জা করার কিছু নেই।' খুব আন্তরিক কথা বলার ঢঙ্। 'দিন আপনার চাবিটা দিন তো।' বন্দনা চাইলেন। চাবিটা ব্যাগের ভেতর। উঠতে যাব—বাধা দিয়ে নিজেই বের করে নিয়ে রাধার হাতে ধরিয়ে দিলেন বন্দনা। 'নে, এখন থেকে তোর হেফাজতেই রাখ।' রাধা হেসে আস্তে করে বললেন, —'তোর জিনিস আমি নেব কেন?' এরপর একটা 'উঃ' শব্দ উঠল। বোধহয়, কেউ কাউকে চিম্‌টি কাটলে এমন শব্দ হয়!

ট্রেনের গতিবেগ থেকে সরে এসেও চোখ বন্ধ করে তারই রেশ উপলব্ধি করছি শরীরের অণুতে অণুতে। মগজের ভেতর। ওই অবস্থায় টের পেলাম, রাধা আমার সুটকেশ খুলে জামা-কাপড়-স্যুট সব হ্যাংগারে ঝুলিয়ে রাখছেন। শেভিং সেট্, দাঁত মাজার সরঞ্জাম, বাথ্-সোপ, বাথরুমে রেখে এলেন। সেই সঙ্গে চাপা স্বরে দু'জন খবরাখবর নিচ্ছেন। ইনি বোম্বের, উনি কলকাতার।

১৪

ঘুম থেকে জেগে দেখি একজন ডাক্তার, আমায় স্টেথো দিয়ে গুঁতোচ্ছেন। বুকে পিঠে কন্‌জেস্‌শন্ আছে কিনা তা-ই পরখ করছেন। পাল্‌স্ বীট্ গুণে, প্রেস্‌কিপ্‌শান্ প্যাড্ খুলে লিখতে বসলেন। না তাকিয়েও স্পষ্ট দেখতে পেলাম দুটো ওষুধ লিখে ফেলছেন। প্রথমটা, ট্রেট্রাসাইক্লিন্, দ্বিতীয়টি, বি কম্‌প্লেক্স্ ক্যাপস্যুল। যদি জিজ্ঞেস করি ফ্লুতে ট্রেট্রাসাই-ক্লিন্ দিলেন কেন—জানি উনি বিরক্ত হয়ে বলবেন, 'সেকেণ্ডারী ইন্‌ফেক্‌শান্ গার্ড করতে।' করকরে বত্রিশটা টাকা পকেটে গুজে, গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন দাদারের ডাক্তার! টাকাটা, পরে কোন অজুহাতে ওঁদের ফেরৎ দেয়া যায় কিনা ভাবছি। রাধা, ঘরটা খালি হলে মাথার কাছে কুশানটা টেনে এনে বসে বললেন, 'তোমার কলকাতার বাড়ীতে আমি গিয়েও তো অসুস্থ হতে পারি। তখন কি তুমি আমার কাছ থেকে ওষুধের দামটা চেয়ে

নেবে ?' অবাক হলাম ওর ইন্‌টেলিজেন্স্‌ দেখে ! মনের অস্বস্তিটা ধরে ফেলেছে ঠিক ! বেশ ফ্র্যাঙ্ক্‌ । কেমন প্রথম সম্বোধনটাই আপনার করে নিল । সত্যিই টাকাটা দেয়া যায় না । অবস্থাপন্ন ঘরে এটা কোন ব্যাপারই নয় । লজ্জা তো শুধু নিম্ন-মধ্যবিত্তের জন্য ! একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'পোস্টাফিশ্‌টা এখান থেকে কতদূর ?'

রাধা স্বাভাবিকভাবে বলল, 'পৌঁছ-সংবাদ তো ? লেখা থাকলে আমায় দাও ইভ্‌নিং মেলে দিয়ে আসব খন !'

বললাম, 'না ! একটা টেলিগ্রাম করলেই ভাল হতো । মা হয়ত চিন্তা করবেন ।'

—'ও । এ্যাড্রেসটা বল ।' উঠে ড্রেসিং টেবলের ড্রয়ার থেকে একটা প্যাড আর কলম নিয়ে এসে বসল ।

এ্যাড্রেস বলা শেষ হতেই প্যাডটা বন্ধ করে বলল, 'বাকীটা জানি, কমন্‌ ল্যাঙ্গুয়েজ । লিখে দেবো ।'

'!' জলটা ঢাকা সরিয়ে একটু খেতে যাচ্ছি, দরজার কাছে মাসীমা (এ্যালোপ্যাথ) বললেন, 'দাঁড়াও এ ক্যাপসুলটা খেয়ে নাও ।' রাধাকে বললেন, 'টাইমটা নোট কর ছোট খুকু, বার ঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে হবে ।'

বন্দনা বললেন, 'তাহলে রাত বারটা অবধি রাজাকে জাগিয়ে রাখতে হবে ।'

—'না: তা কেন ? ও ঘুমোবে, তুই জেগে থাকবি । বারটায় ওকে জাগিয়ে খাইয়ে দিয়ে তোর ছুটি ।' হাসতে হাসতে বললেন এ্যালোপ্যাথ মাসীমা । আমার কপালে হাত দিয়ে বললেন, 'জল গরম হচ্ছে, একটু স্পঞ্জ করিয়ে দিই, নাকি নিজেই পারবে ?'

আমি বললাম, 'না আমি নিজেই করে নিতে পারব ।'

ল্যাটিন-ফ্যাটিনে একটু দেরীই হলো । দরজায় নকিং আর মাসীমার গলা পেলাম, 'কি হলো, জল এতো ঘেঁটো না রাজা ?' হোমিওপ্যাথ-মাসীমা ও এ্যালোপ্যাথ-মাসীমা রীতিমত দুই কন্যাকে নিয়ে কন্‌ফারেন্স করছেন আমার বিছানায় বসে । সেটা দেখে বললাম,

—'আমার রোগটা ইন্‌ফেক্‌শাস্‌ হতে পারে কিন্তু ! এঘরে বেশী না আসাই ভাল ।'

—'আরে ছেলেটা খু-ব জ্যাঠা দেখছি, ডাক্তার ডেকে ওষুধ খাওয়ালাম আমি, আর উনি এলেন ডাক্তারী করতে ।'

এ্যালোপ্যাথ-মাসীমার ধমকে বিচলিত না হয়ে বলি, 'বাড়ী শুদ্ধ জ্বর হলে গালাগালটা তো আমাকেই করবেন মনে মনে ।' চুল আঁচড়ে পরি-

পার্টি হয়ে, নতুন ভাঁজ ভাঙা পাজামা-পাঞ্জাবী পরে কুশনটায় বসলাম। বন্দনা, রাধা তো হেসেই গড়াচ্ছে, বলছে, 'রোগ হয়েছে তোমার আর আমরা বিছানায় বসে, তুমি টুলে!' এটা খুব একটা হাসির কথা মনেই হলো না আমার।

বললাম, 'কাল থেকেই তো ঘুমোচ্ছি। এখন বেশ ভাল লাগছে।' ওঁরা সবাই নেবে আমাকে জোর করে শুইয়ে দিয়ে বলে গেলেন খাবার তৈরী হলেই আবার আসছেন এ ঘরে।

কে বলবে এ'রা আমার কয়েকঘণ্টা আগেও সম্পূর্ণ অপরিচিতা ছিলেন?

সন্ধ্যায় ওদের বসার ঘরে অনেক ভিজিটর এসেছিলেন, তাদের টুকরো কথা, হাসি গান ভেসে আসছিল। ভিক্টরের গলাই সবচাইতে উচ্চনাদে। ভিক্টরের বাবা এখনো আমার ঘরে আসেন নি। মিঃ সিংহীও সারাদিনে একবারও এ ঘরে আসেন নি।

—'এই রাজা!' রাতে ঘুম ভাঙল রাধার ডাকে। ধড়মড় করে উঠতেই বাধা পেলাম। 'শুয়ে শুয়েই গিলে খাওনা, দুটো!' বেচারীকে এত রাত অবধি জেগে থাকতে হবে কাল-পরশুও। এখনই মনে হলো কাল সকালে যদি ফাইভ হাণ্ড্রেড মিলিগ্রামটা সকাল ছ'টায় এগিয়ে নিয়ে আসি তাহলে পরেরটা বিকেল ছ'টায় পড়বে। 'থ্যাঙ্কস' 'গুডনাইট' বলে বি কমপ্লেক্স আর টেট্রাসাইক্লিন-এর এলুমিনিয়ম ফয়েলটা নিয়ে রাধা বিদায় নিল। দরজার ওপাশে আরেকজন কেউ দাঁড়িয়েছিল। রাধা যাবার আগেই সে সরে গেল।

১২

সুদূর বাংলা ছেড়ে এসে এই বোম্বের প্রান্তে শুয়ে, পাখীর ডাকে ঘুম ভাঙল। সূর্য ওঠেনি এখনও। শুয়ে শুয়েই গাছের ফাঁক দিয়ে দূরে আকাশে রক্তিম মেঘের সারি দেখা গেল। চুপচাপ পাশ ফিরে শুয়ে থাকলাম কতক্ষণ। তারপর আর একটু ফর্সা হলে মুখ ধুয়ে এসে, কাঁচের প্রশস্ত জানালার বাকীটুকু পর্দার আড়াল থেকে সরিয়ে, কুশন-টা টেনে এনে বসলাম। গায়ে শালটা জড়িয়ে নিতে হল। শীত শীত আছে। শরীরটা খুব হাল্কা লাগছে এখন সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়ে গেছে। হঠাৎ চোখে পড়ল জানালার নীচেই প্রস্ফুটিত হচ্ছে নাম না জানা কিছু ফুল। খুব ধীরে ধীরে, ভাল করে তাকিয়ে থাকলে স্পষ্ট বোঝা যায়। চোখের সম্মুখে, আলোর আবির্ভাবের সংগে সংগে ফুল ফোটার এ দৃশ্য জীবনে কতজন দেখে-

ছেন, জানি না। দৃশ্যটার অসম্ভব রকম আন্‌ক্যানি-ফিলিংস্‌ আছে! ঘুমন্ত, নিস্তব্ধ ফুলগুলো ঠিক যেন এক-একটা ম্যামির মত। চোখ মেলে তাকানোটায় বেশ ভয় হয়। চারদিকে একটা অসম্ভব নিস্তব্ধতা, আর অসুস্থতাজনিত দুর্বলতায়, ক্লান্ত মস্তিষ্ক যখন একটা নিছক আড়ষ্ট ভাব এনে ফেলেছে, ঠিক তক্ষুণি একটা ঠাণ্ডা হাত গলার ওপর পেছন থেকে কে যেন রাখল! আমি দারুণ ভয় পেয়ে, নিজের অজান্তেই চীৎকার করে উঠলাম। সভয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখি, বিস্ময়ে হতবাক, দুহাতে নিজের মুখটা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে বন্দনা! ও আমার চীৎকারে রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে। ওর চোখমুখ দেখেই সেটা বেশ মালুম হচ্ছে। আর ভয় পেয়েছে বাড়ীর তিনটে কুকুর। আমার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি তুলে সারা বাড়ীটা মাথায় নিয়ে ফেলেছে, তারা। নিজের ভয়টা কেটে গিয়ে তখনই দারুণ কৌতুকের হাসিতে ফেটে পড়তে যাচ্ছিলাম। বন্দনা বলল, 'সর্বনাশ করলেন।' সর্বনাশের কি হল বুঝে ওঠার আগেই, কয়েকজোড়া পদশব্দ দ্রুত এদিকে আসছে শুনতে পেলাম। ফ্যাকাসে মুখ নিয়ে বন্দনা একলাফে দরজার পাশে আমার স্যুট্‌ দুটোর আড়ালে, আত্মগোপন করল! সাথে সাথেই ঘরে প্রবেশ করলেন, প্রথমে মাসীমা, পেছনে রাধা, তারপরে ভিক্টর এবং মিঃ সিংহী। প্রত্যেকের চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ, এই প্রায়-অন্ধকার ঘরেও স্পষ্ট দেখা যায়। আমি সেণ্টাবে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে! আলনার আড়াল থেকে বন্দনা বেরিয়ে এসে জনতার পেছনে দাঁড়িয়ে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল। 'কী হয়েছে আপনার? !!' একটু বেশীই হয়ে গেল অভিনয়টা! আমার কোন একটা লেম্‌-এক্সকিউজ মনে এলো না। তাই, অভিনয় দেখে চট্‌ করে ওটাই এডাপ্ট্‌ করে নিলাম। মুখে চোখে অল্প একটু ভীত ভাব ফিরিয়ে এনে কাঁপা কাঁপা গলায়, থেমে থেমে নিঃশ্বাস নিয়ে বললাম,

—'আপ্‌নাদের—এই ঘরটা—এই ঘরটা, বোধহয় হণ্টেড্‌…হ্যাঁ।'

—'সারপ্রাইজিং।' ভিক্টর এসে আমার অল্প কম্পিত শরীরটা বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'খুব কম হলেও আমি আট বছর ইস্‌ ঘরমে রহনে-ওয়ালা হুঁ। একটা দিন-ও তো ভূত-টুথ, কুছু ভেট্‌ হোল না? তুমি বলছটা কী?'

ওর ওই অদ্ভুত বাংলা শুনে আমি তাজ্জব! এবার এ্যালোপ্যাথ-মাসীমা চোখ রগড়াতে রগড়াতে ভিড়টা আরেকটু বাড়িয়ে সব কথা শুনে বললেন, 'উইক্‌নেস থেকে ওরকম হয়। ও কিছু না।' তারপরেই তাড়া লাগালেন রাধাকে, 'এই যা চা-টা করতো!' রাধা কিছু একটা ভাবছিল। আস্তে করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল একটা শব্দ-ও না করে।

আমি আর একটা শব্দ উচ্চারণ-ও সমীচীন মনে করিনি। সকাল বেলায় উঠেই মিথ্যেগুলো বলতে খু-ব খারাপ লাগতো। আর, একটা মিথ্যে বললেই তো সেটাকে সত্যি দাঁড় করাতে গিয়ে আরও একটা মিথ্যে বলতে হতো!

ঘরটা আবার, আস্তে আস্তে অপ্রস্তুতের একশেষ, এই আমাকে নিয়ে একা হয়ে গেল।

১৬

ভাবছিলাম বন্দনার কাণ্ডটার কথা। এমন কাণ্ড করতে গেল কেন, ও! চা হাতে ঘরে ঢুকল রাধা নয়, বন্দনা-ই। পেছনটা একবার চট্ করে দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'অভিনয়ে আপনি মাস্টার দেখছি! সিনেমায় নামবেন? এদের বাড়ীর সাথে ফিল্মের লোকেদের খু-ব কন্টাক্ট্স্ আছে কিন্তু!' চা-টা আমার হাতে ধরিয়ে বলল, 'নিন্ এটা রাধা বানিয়েছে ভাল লাগবে।'

রাধা পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে বললো, 'লাগবেই তো।'

বন্দনা ঘাড় বাঁকিয়ে বললো, 'ঈশ—গর্বিতা!'

আমি হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলি, 'আরে আরে সাতসকালে তোমরা ঝগড়া শুরু করবে মনে হচ্ছে!'

—'টেম্পোটা ভোরে তুমিই তুলে দিলে ব্রাদার।' ভিক্টরের চা হস্তে প্রবেশ। মুখে সিগারেট ও বক্রহাসি।

একটু তাকিয়ে থেকে বললাম, 'ভিক্টর তুমি কি কর?' উদ্দেশ্য টপিক চেঞ্জ্ করে দেয়া। ভিক্টর মৌজ করে বিছানায় পা তুলে বসে, সিগারেটটা হাতে নিয়ে বলল,

—'প্রশ্নটা হবে—তুমি কী, কি কর না?'

আমি হেসে বললাম, 'বেশ। তার লিস্টটা দিলেও আমি ধরতে পারব।'

—'পারবে?' গম্ভীর চালে জিজ্ঞেস করে ও।

—'অন্ততঃ অনুধাবন করতে পারি আর কি?'

—'নাঃ। পারবে না। নেহি সকোগে'

—'কেন?' অবাক হই।

—'তুমি দুর্বল। মা বলেছে।' নিস্পৃহ কণ্ঠ ভিক্টরের। হাসিতে আমিও যোগ দিই।

—'এক নাম্বার। আমি এটা করি না।'

—'কোন্‌টা ?'

—'হাসাটা।' অসম্ভব জোর দিয়ে হেঁড়ে গলায় উচ্চারণ করল ও।

—'তুমি হাস না ?'

—'নেহী। বোম্বেসে কোই হাস্‌তা নেহী। এখানে ফিল্মস্টার আর মিনিস্টারের চাম্‌চেরা ছাড়া আর কোই হাস্‌তা নেহী।'

—'বাকীরা কি করে ?' এবারের প্রশ্নকারিণী বন্দনা।

—'এক্সপ্রেসন্‌লেস্‌। খুব হাসি পেলে, দয়া করে একটু ঠোঁটের কোণটা কুঁচকে দেয় পুরুষেরা, আর দ্য লেডিজ্‌, সীম্প্‌লী ফ্ল্যাটেন্‌ দেয়ার্‌ লিপ্‌স্‌।'

—'লাভ ?'—জিজ্ঞেস করি। 'আনন্দের প্রকাশভঙ্গিটার গলা টিপে……'

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ওপর দিকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'আঁতেলেক্‌চুয়াল্‌ বল্‌বে না! সবাই এখানে আঁতেল হয়ে থাকতে চায়।'

—'আঁতেল!' বোম্বের ড্রইং রুম-কার্টসী ভেঙে জোরেই হেসে ফেলি।

ও বললো, 'ড্যু ইউ নো? দ্য সোশ্যাল্‌ লাইফ্‌ হিয়ার্‌ ইজ্‌ ভেরী মাচ্‌ গভার্ণড্‌ বাই দ্য স্টুডিওজ্‌!'

—'বল কি! ফিল্‌ম্‌ স্টুডিওজ্‌ ?' অবাক হতে হয়।

—'ইফ্‌ ইউ আর্‌ ওব্‌লাইজড্‌ টু্য এ্যাটেণ্ড এনি পার্টি, হুইচ্‌ আর ভেরী কমন্‌ হিয়ার, এমংগস্ট্‌ দ্য ফিল্ম এসোসিয়েট্‌স, ইউ উইল্‌ বী চার্মড্‌'

—'থাক। আমার 'ওব্‌লাইজড্‌' হওয়ার দরকার নেই।'

—'আছে। এখানকার একটা ইভ্‌নিং পার্টি না দেখলে বোম্বেটা অজানাই থেকে যাবে।' একটু থেমে রাধাকে সিগারেট এগুটা এগিয়ে দিল। ওটা নিয়ে জানালা দিয়ে গলিয়ে ফেলতে গিয়ে রাধা কাউকে দেখে কী যেন একটা বলে বন্দনাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ভিক্টর বলে চলেছে, পার্টিতে পলিটিক্স নিয়ে এমন অথেন্‌টিক্‌ কথাবার্তা হয় শুনে মনে হবে প্রাইমমিনিস্টার বা তার ফার্স্ট সেক্রেটারীর সাথে দু বেলা ওঠে বসে'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ দিল্লীতেও দেখেছি সবাই নামের আগে 'ডক্টর' কথাটা ব্যবহার না করে কাউকে সম্বোধন করে না।'

ভিক্টর বলে, 'জানি। আসলে ইয়ে সব কোর্টসী ইম্পোর্টেড হোতি হ্যায়।'

হিন্দী না মিশিয়ে বাংলা ওর একদম আসে না। অনেক বছর প্রবাসী থাকার ফল।

বাইরের ঘরে মাসীমার (এ্যালোপ্যাথ্‌) কণ্ঠ একটু জোরালোই শোনাচ্ছে।

৬

ভিক্টর্ আমাকে নিয়ে ওখানে উপস্থিত হলো। ঢুকতেই যে কথাটা কানে গেল সেটা মাসীমার। 'কে বললে আমি একাদশী করবো? দেখাও কোন বই-এ লেখা আছে, এখুনি দেখাও, কোথায় লেখা আছে তুমি মরলে আমাকে একাদশী করতে হবে? দেখাও,—আমি আজকে এক্ষুণি একাদশী শুরু করব। আমি মরলে তুমি করবে?'

খুব নীচু স্বরে রাধার বাবা বললেন, 'না, এটা করা উচিত।'

হোমিওপ্যাথ মাসী ও মেসো খুব হাসছেন কৌচে বসে। আমাকে দেখে মিঃ তালুকদার বললেন, 'এসো তোমার সাথে দেখা হয় নি। কেমন আছে শরীর?' ধীর সংযত উচ্চারণ। একটু শীর্ণ চেহারা। অসম্ভব রকম লাল্‌চে ফর্সা রঙ্। যেন টোকা দিলেই রক্ত ঠিকরে বেরুবে।

বললাম, 'হ্যাঁ ভাল আছি।' হাত তুলে নমস্কার বিনিময় হলো। একটা খালি কৌচে বসে বললাম, 'জ্বরটা সেরে গেছে।'

হোমিও মাসীমা বললেন, 'তা হোক, আজকে কালকে খুব প্রোটেকশন্ নিয়ে থাকবে। তোমার কাজ ক'দিন পরে করলেও ক্ষতি হবে না।'

হেসে বললাম, 'আজ তো রোব্‌বার, আজ নয়। কিন্তু কাল আমাকে বের হতেই হবে।'

—'কেন? এতো তাড়াটা কিসের?' এ্যালোপ্যাথ মাসীমার ধমক।

—'না, এইরকম এ্যাংজাইটি নিয়ে, শুয়ে থাকা যায় না তো।'

—'তোমার কাজটা কি, রাজা। অফিশিয়াল?' প্রশ্ন করলেন মিঃ সিংহী।

—'হ্‌ঁ, না, ঠিক অফিশিয়াল্ না। মানে, বোম্বেতে একটা অফিসে যেতে হবে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে......।' ঠিক গুছিয়ে বলতে পারি না কথাটা।

—'ঠিক আছে, শরীর কেমন থাকে দেখে যাবে।' কথা ঘুরিয়ে মিঃ তালুকদারকে বললাম, 'বাগানটা কি আপনার সাজানো?'

—'ও: হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা আমারই শখ। তুমি দেখেছো, এরই মধ্যে দেখলে কখন?' খুব উৎসাহিত দেখায় রাধার বাবাকে। বলবো কি বলবো না করে বলেই ফেললাম, 'আমার ঘর থেকে যে অংশটা দেখা যায়, সেখানে অনেক অচেনা ফুলের ভেতর একটা গ্রুপ্ দেখলাম—।' রাধা, বন্দনা ঘরে ঢুকল, এবং দুজনেই পাশাপাশি লম্বা কৌচটার পেছনে দাঁড়াল। আমার মুখোমুখি। আমি বলে চলেছি, 'বেশ মোটা পাঁপড়ি, আলেকজান্ডারের রঙ্। দেখছিলাম ভোরবেলা সূর্যের আলো আসার আগেই আস্তে আস্তে পাঁপড়ি মেলছে।' মি: তালুকদার তখনও কোমল দৃষ্টিতে আমার দিকে

তাকিয়ে। রাধা ঘাড় কাত্ করে শুনছে। বন্দনা তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে। বলছি, 'ওই পাঁপড়ি মেলাটার কেমন একটা আন্‌ক্যানি ফিলিংস্ আছে হয়তো।', আমার কথাটা লুফে নিয়ে মাসীমা (এ্যালো-প্যাথ) বললেন, 'তাহলে তুমি জেগেই ছিলে! স্বপ্ন দেখে চীৎকার কর নি!'

বললাম, 'না, ঠিক ওই অবস্থায়ই আমার গলার কাছে……' রাধা, 'কিছুই হয় নি'-পোজে, দুষ্টু দুষ্টু হাসছে—বন্দনার চোখ দুটো প্রায় সেই ভোরের মত হয়ে যাচ্ছে! 'গলার ওপর একটা ঠাণ্ডা হাত লাগতেই চমকে পেছনে তাকাতেই দেখি……' রাধা আড় চোখে বন্দনাকে দেখে নিচ্ছে। 'কিছু একটা ছায়া সরে গেল।'—দম নিয়ে নিয়ে বলি। দীর্ঘনিশ্বাসের মত বন্দনার দিকে-ও একটা আওয়াজ হলো।

মাসীমা বললেন, 'দ্যুৎ! যত্তো সব। ভূত আমি বিশ্বাস করি না, ও তোমার মনের ভুল। তুমি জ্বর থেকে উঠেছ, দুর্বল শরীরে……'

—'না মা, ভূত না হয়ে পেত্নীও তো হতে পারে,……মানে ও তো ঠিক দেখতে পায় নি—।' রাধার গালাগালটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হজম করতে হয় বন্দনাকে। রাধা হয়তো কোনভাবে আঁচ করতে পেরেছে ব্যাপারটা কী! ও খুব ইন্‌টেলিজেণ্ট্।

ভিক্টর গাড়ীটা নিয়ে বেরুবে কিনা জিজ্ঞেস করতে এলো। ও এখন ড্রেস পাল্টে ফিট্‌ফাট্ হয়ে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে বললাম, 'কোন রাজ্য জয় করতে?'

হেসে নড্ করে বলল, 'চলোগে মেরে সাথ?' সবাইকার তীব্র আপত্তি হলো। তাই গাড়ীটা কারো দরকার নেই জেনে, শিষ দিয়ে চলে গেল ভিক্টর। পুরোনো কথার খেই ধরে মিঃ তালুকদার বললেন, 'পরে একদিন ফুলগাছ চিনিয়ে দেব তোমায়।'

আমি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাই। মাসীমার নির্দেশে ব্রেকফাস্ট্ ড্রয়িং-রুমেই সার্ভ করে গেল ছোকরা মতন একটা বয়।

১৬

দুপুরের খাওয়ার আগে পর্যন্ত নিজের ঘরে বালিশে হেলান দিয়ে ফাইল্ খুলে ডকুমেণ্টগুলো দেখে নিয়ে মনে মনে সাজিয়ে নিলাম। ঠিক মত কথাটা পাড়তে পারলে কাজ হবেই। কন্‌ফিডেন্স্ থাকা সত্ত্বেও একটু নার্ভাস লাগে। বর্তমান অবস্থা এবং অবস্থান দুটোই নতুন থাকায় মনটা

আরও একটু ইয়ে মত। কলকাতায় হলে বোধহয় এতোটা চিন্তিত হতাম না। আসলে এর ওপরই যে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে! কুড়ি বছরের বঞ্চিত জীবনের স্বাদ না পাওয়ার যন্ত্রণা, বড্ড উপোসী ভ.ব এনে দিয়েছে। কুড়ি কুড়িটা দীর্ঘ বছর তো! নিরাশার আশা, মরূদ্যানের তৃষ্ণা-বারির কল্পনা, ব্যাপারটাকে একটু বেশীই ইম্পর্টেন্স্ দিয়ে ফেলেছে। সঞ্চয় যা ছিল তা কবে কোথায় ঘুঁটে আর কয়লা কিনতেই উবে গেছে। সামান্য সেল্সের চাকরী, তাও কলকাতার কোম্পানীর—ক'টাকাই বা মাইনে! কোন রকমে তিনটে প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন জোটে। মাসের শেষে যেটুকু উদ্বৃত্ত হয়, সেটা শুধুই হতাশা!

—'কি ভাবছেন!' বন্দনা এসে পাশে বসল। একটু সরে গিয়ে আরেকটু ব্যবধান রচনা করে বললাম, 'না কিছু না. তোমার স্নান হয়ে গেছে ?'

—'হুঁ। কোন সকালে। আপনি যান মাথা ধুয়ে নিন।'

—'না, একটু গরম জল পাওয়া যাবে ? খু-ব স্নান করতে ইচ্ছে করছে।'

—'হচ্ছে তো গরম জল!'

—'ফুল মাসীমা আপনার খুব প্রশংসা করছিলেন। আপনাকে নিয়েই ওখানে আলোচনা হচ্ছে. মাসীর ঘরে।'

—'আমার কথা ?' হেসে ফেলি। 'আমার কথা কতটুকুই বা জান তোমরা ? আসলে তোমরা প্রত্যেকেই এতো ভাল—আর যার মনটা ভাল সে আর সকলের মধ্যেই ভাল আর সুন্দর দেখতে পায়।'

—'আমাদের ভেতর কাকে আপনার সব চাইতে ভাল লাগল, মানে কে বেশী ইম্প্রেস্ করল ?' বন্দনার ইতস্ততঃ ভাব দেখা দেয়, কথা বলার সাথে সাথে।

বলি. 'ইম্প্রেস্ড্ হয়েছি সবচেয়ে বেশী রাধাকে দেখে। অমন প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা মেয়ে খুব কম দেখা যায়।' একটু উচ্ছ্বসিতই হয়েছিলাম বোধ-হয়—বন্দনার মুখটা হঠাৎ এক্সপ্রেশনহীন হয়ে যাওয়াতে চুপ করে অন্যায় কিছু বলে ফেললাম কিনা, ভেবে নিয়ে ফের বললাম, 'আর ভাল সবাই—তবে তোমার কথা আলাদা। তুমি না থাকলে বোধহয় এতোটা ফ্রী হতে পারতামই না। আর তাছাড়া তোমাকে তোমাকে আমার……' কথা শেষ করার আগেই মহিলা-কণ্ঠ দরজার বাইরে থেকে বলল, 'মে আই কাম্ ইন্!' সচকিত হয়ে দুজনেই দরজার দিকে তাকাই. পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকে রাধা। মুখে চাপা হাসি! বলে, 'ডিস্টার্ব করলাম। চল. স্নান করে নাও, খাবার ঘরে

একসঙ্গে বসে খাব আমরা।' উঠে পড়ি, বাথরুমে যেতে যেতে শুনি ওদের দু'বোনের চাপাস্বরে তর্জন।

লম্বা ডিনার টেবিলের দু'মাথায় দুই মেসো। একপাশে আমি ও মাসীমাদ্বয়, উল্টোদিকে একটা সীট্ খালি, ভিক্টর এখনও ফেরেনি।—'আপনি কি খেয়ে খাবেন এটা, বারটা বেজেছে কিন্তু?' আমি একটু অবাক হয়ে বন্দনার হাতে ধরা রাংতাসমেত ক্যাপসূলটার দিকে তাকিয়ে, রাধাকে চট করে দেখে নিয়ে বলি,—'আমি সকালে ছ'টায় টাইমটা এগিয়ে নিয়ে এসেছি তো, বিকেল ছ'টায় পরেরটা পড়বে!' রাধা একেবারে অট্টহাস্য করে ফেলল। এতে এত হাসির কি পেল ও বুঝলাম না। মাসীমা তো কন্যাকে একটা ধমকই দিয়ে ফেললেন। 'তুই সবতাতেই এত হাসিস্ কেন বল তো?' বন্দনা অপ্রস্তুত ভাবটা গোপন করে বলে, 'ও নিজেকে একটু বেশী চালাক ভাবে, ফুলমাসী।' রাধা আরেকবার হাসতে গিয়ে বিষম খেল।

খাবার টেবিলে এরা বেশ জমিয়ে আড্ডা দেন। কথা হচ্ছিল আমাকে বোম্বেটা ঘুরিয়ে দেখাবে কে। রাধা ঝাঁপিয়ে বলল, 'আমি।' মিঃ তালুকদারের ইচ্ছে ভিক্টর যাক। কারণ, রাধা গেলেই বন্দনা যাবেই।

—'কেন, বন্দনা গেলে যাবে।' মাসীমা—(এ্যালো)-রউক্তি।

—'না, যাবে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু ওর তো সমুদ্রের ধারে যাওয়া উচিত নয়। আর বোম্বের তো সমুদ্রের ধারেই আসল রূপ।' মিঃ তালুকদার সুন্দর করে আস্তে আস্তে বলেন কথাটা।

—'কেন, সমুদ্রের ধারে গেলে কি হবে মেসোমশাই।' এইবার বন্দনার প্রশ্ন।

—'তোমার ফ্যামিলির, তুমি বোধহয় জান না, তিনজন সমুদ্রে ডুবে মারা গেছেন। তোমার এটা মানা উচিত।' হোমিও-মাসীমা-ও মেসোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম ও'দের মুখ ভাবলেশহীন। কথাটায় ও'রা আর অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন না।

—'এ একটা কথা হল।' (এ্যালো)-মাসীমার ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর, 'তাহলে তোমার পূর্বপুরুষ তো সব খাটে শুয়ে মারা গেছেন। তুমিও তাহলে আজ থেকে খাটে শুয়ো না—মাটিতে মাদুর বিছিয়ে দেবোখন।' মাসীমার আর্গুমেন্টের ঠেলায় আমাদের প্রাণ উড়ে যাবার যোগাড়। শুধু হাসলেন না বন্দনার মা। হঠাৎ ট্রেনের কথাটা মনে পড়ে গেল। '……ও'কে কথাটা বোল না, উনি রাগ করবেন।'

হাসির দমক কাটিয়ে রাধা বলল, 'ওমা, রাজার প্লেট্ খালি ওকে দাও!'

মাসীমার 'জোক' করার ধরণটা বেশ মজার—নিজে একটা কপট গাম্ভীর্য

নিয়ে থাকেন। আমার প্লেটের কাছে বড় একটা ঢাকা দেয়া পাত্র এগিয়ে নিয়ে এসে, টেব্‌ল্‌স্পুন্‌টা হাতে করে একটু ইতস্ততঃ করে বললেন,—'রাজা, তুমি সবকিছুই খাও তো! মানে কোন বাছবিচার আছে নাকি?'

বললাম, 'না তো! কোন খাদ্যই আমার কাছে অখাদ্য নয়।'

—'না। মানে কোন প্রেজুডিস্ নেই তো—আমরা কিন্তু বীফ্ খাই।' সবকটা চোখ খাওয়া থামিয়ে আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ। আমার ধর্মের সবাই এটা খায়। তবুও আমাদের বাড়ীতে এটা ঢোকেনি কোনদিন এমন কি বন্য কুক্কুট ভিন্ন—গৃহস্থের মুর্গী পর্যন্ত খেত না আমাদের বাড়ীতে।

বললাম, 'খাই নি কখনও তবে বাধা নেই কোন।' একটা বড় 'লাম্প' আমার প্লেটে ছেড়ে বললেন,

—'একটু ফ্রায়েড্-রাইস্ দিচ্ছি আর কিছু খাবে না এখন।' আমি সম্মতিসূচক হেসে খেতে খেতে ভেবে নিচ্ছিলাম। হিন্দু-পরিবারে বীফ্ খেতে, আমি কখনও আগে দেখিনি। বোধহয় বিদেশ থেকে আমদানি এ আইডিয়া। বিলেতে শুনেছি বড়লোকদের খাদ্য-ই বীফ্, মধ্যবিত্তরা খায় চিকেন্। সঠিক জানিনা।

বাইরে কুকুরগুলো একটু চেঁচালো। কলিং বেলের বাজীংসাউণ্ড্ হলো। মিঃ তালুকদার বললেন, 'ভিক্টর নয়—কে এল?' ছোকরাটা দরজা খুলে দিয়ে কার সাথে কথা বলছে। কুকুরগুলো থেমে আছে। ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল রাধার বয়সী একটি মেয়ে। পরনে টাইট্ জীন্স্। শ্যামলা মেয়ে শার্প্ ফিচারস্। একটু উগ্র প্রসাধন। মাথায় নিজের চুল (!) —একঢাল! রাধার থেকেও একধাপ ফরোয়ার্ড। হৈ চৈ করে সবাই-কার খবর নিল। বন্দনাকে কি যেন একটা পুরোনো কথা নিয়ে খ্যাপাল খানিক। বন্দনা মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে ওকে ইশারায় চোখ টিপ্‌ল। আমি মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে খেয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে ওদের হাসিতে মাথা তুলে দন্তপংক্তি বিকশিত জনতাকে দেখে নিচ্ছি। এ্যালো-প্যাথ-মাসীমা আমার কাঁধ ছুঁয়ে বললেন, 'এই যে আলাপ করে নাও, আমার আরেকটা ছেলে, কলকাতায় থাকে।' আমি নমস্কার করতে চামচেটা টেবিলে রাখতে যাব, মেয়েটি বলল, 'রাইট্, ভিকু কোথায়?'

—'সেই সকালে বেরিয়েছে, বিকেলে ফিরবে বোধহয়।' এইটুকু সময়েই খালি চেয়ারটায় বসে বারকয়েক আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে মেয়েটির। তাকানোটা কি তীব্র—গভীর! চোখ দুটো বড়। চুলটা টেনে বাঁধা। কপালে বিন্দি। একথা-সেকথা বলার পরে মেয়েটি নিজেই ভিক্টরের জন্য রাখা প্লেটে একটু ফ্রায়েড্-রাইস্ মাংস দিয়ে খেতে লাগল। বন্দনা ওকে

স্যালাড্-এর প্লেটটা ঠেলে দিল।

আমার খাওয়া হয়ে গেছে। আমি আড়-চোখে মেয়েটিকে দেখছি। হঠাৎ খেয়াল হল রাধা আমায় লক্ষ্য করছে। চোখাচোখি হতেই এক চোখ বন্ধ করে থুত্‌নিটা নাচাল। আমি হাসি চেপে গেলাম। মিঃ তালুকদার মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা কেমন আছেন?'

—'বাপীর আর কি? মেজাজে আছে। শুধু কলকাতার অডিয়েন্সের ওপর খু-ব খাপ্পা।'

—'কেন?'

—'বলে—দেখ্‌লি ব্যাপারটা, মান্নাকে দেবে তিনহাজার টাকা, আর রফি-লতাকে নিয়ে গিয়ে দেবে বিয়াল্লিশ-বাহান্ন হাজার। এরপর বাংলায় কোন্ আর্টিস্ট্ থাকবে?'

মেয়েটি আরেকটু মাংস-ভাত নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল,

'—আমার নাম রুণা, মাসীমা বলে দেননি।'

—'ও! হ্যাঁ, এ রাজা চৌধুরী।' মাসীমা অপ্রস্তুত হন।

রাধার বাবা বললেন, 'তুমি বসন্তকুমার গাঙ্গুলীকে চেন তো?' আমি বোকার মত ডানদিকে-বাঁদিকে মাথা ঝাঁকিয়ে জানাই,

—'চিনি না।' 'রঙ্গস্বামী' ভিন্ন অন্য কোন নাম-ই মনে থাকছে না আজকাল।

—'চেন না, বল কী, তুমি গান শোন না?'

—'ও, বসন্তকুমারের কথা বলছেন?' আমি সপ্রতিভ হতে চেষ্টা করি, 'সুরকার তো?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ., তারই মেয়ে রুণা।' আদর করে কথাটা শেষ করেন মিঃ তালুকদার।

রুণা বাধা দিয়ে বলে, 'বাঃ, কাকাবাবু, এখন আর বাপীকে দিয়ে পরিচয় কেন? আমারও গোটা কয়েক ডিস্ক্ আছে বাজারে।' বাবার আহ্লাদী মেয়ে জানাল।

হঠাৎ মনে হলো রুণাকুমারের পপ্ সঙ্স্ একটা আমিও শুনেছি, গোলপার্কের মেলডিতে। গিয়েছিলাম ফিরোজার লং প্লেয়িং কিনতে, বাজছিল তখন। ইংরাজী একটা পপুলার গান আছে, স্ট্রবেরিজ্, চেরিজ ……কী সব, সেই একই সুরে, তবে বাংলায়। খারাপ লাগেনি।

খাওয়ার পর কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে রুণা উঠে পড়ল। —'নাঃ, দুটো বেজেছে, ভিকুকে বলিস—অবশ্য যেন যায়। কোন এন্‌গেজ্‌মেন্ট যেন না রাখে।' আমার দিকে তাকিয়ে একটু থেমে গলার স্বর উদারায় নামিয়ে

নিয়ে বলল, 'এরা আমার বাড়ী শনিবার যাচ্ছে। আপনি যদি পায়ের ধূলো দ্যান—।' বলার ভঙ্গিতে আমারও হাসি পায়।

বলি, 'আমি তো অসুস্থ, দেখি ভাল থাকলে যাব। তাছাড়া অতদিন থাকব কিনা জানি না।'

—'অ্যাঃ তোমাকে ছাড়লে তো।' রাধা কানের পাশ থেকে ভেংচিয়ে দিল আমাকে। 'ওকে ঠিক হাজির করে দেব দেখিস।'

—'ঠিক আছে, ভারটা তোর ওপর রইল। চলি, বন্দনা—অবশ্যই ?

গাড়ীতে স্টার্ট দিল বুণাকুমার। সিঁড়ি পর্যন্ত সী-অফ্ করে ফিরে আসি নিজের ঘরে। ভেতরের ঘর থেকে তখনও ভিক্টরকে নিয়ে আলোচনা ভেসে আসছে—ওর দেরী হচ্ছে কেন।

দু'চোখের ঘুম নামছে। অবসাদের ঘুম। অতি কষ্টে এতক্ষণ বসে থাকতে হচ্ছিল—ভদ্রতা করে।

১৭

ফার্স্টক্লাস একটা ভাত-ঘুম দিয়ে উঠলাম সাড়ে পাঁচটায়। মুখে-চোখে জল দিয়ে বাইরের ঘরে এসে দেখি ঘর ফাঁকা! বসে ম্যাগাজিন ওল্টাচ্ছি, এক-এক করে সবাই ফোলা ফোলা এবং তৃপ্ত একটা মুখের ভাব নিয়ে এসে বসলেন চা-টা পেছনে পেছনেই এল। অবেলায় ঘুম থেকে উঠে কথা বলার ইচ্ছেটা লোপ পেয়েছে সকলেরই। নিঃশব্দেই পান-পর্ব সমাধা হচ্ছে ভিক্টর ফিরেছে কি না জিজ্ঞেস করার আগেই চায়ের কাপ হাতে ভিক্টর ঢুকে আমার সাথে কৌচটা শেয়ার করল। ভুরু তুলে ইশারায় জিজ্ঞেস করলাম কি হলো? ও বলল, 'দাদারেই ছিলাম।' চকিতে একবার মাকে দেখে নিল।

বেড়ালের আহ্লাদে আওয়াজের মত ঘুড়ড়-ঘুড়ড় করে বাজছে টেলিফোনটা, থেকে থেকে। সবচেয়ে কাছে রাধা কিন্তু সে আচ্ছন্নের ঘুম-ঘুম ভাবটাকে উপভোগ করছে। অগত্যা মাসীমাকে উঠতে হলো। ওঠবার সময় চটাস্ করে রাধার মাথায় একটা চাঁটি মেরে চলে গেলেন। রাধা একটু তাকিয়ে আবার যেমন ছিল তেমনিই হয়ে থাকল। একতরফা মাসীমার কথাগুলো শোনা যাচ্ছে।

—'না—আমি মিসেস্ তালুকদার বলছি .....'

—'ও, আচ্ছা ! কী ব্যাপার বলুন, রুণা ফিরেছে তো ?'

.... ।

—'এ্যা ? হ্যাঁ হ্যাঁ । রাধার কাজিন ! কেন বলুন তো ।'

.... ।

হাসিমুখে আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, 'ও বুঝেছি, না এখানেই আছে কথা বলবেন ?'

.... ।

—না ; নানা ; না, না কোন আপত্তি করবে না, আমি বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে বলে দিচ্ছি, একটু ধরুন......' ফোন্‌টা চেপে ধরে বললেন 'বসন্তবাবু তোমার সঙ্গে কথা বলবেন, এসো ধরো ।' ঘরভর্তি সবাই অবাক হয়ে একবার আমাকে, একবার মাসীমাকে দেখছে ! ঘুমটুম কোথায় উবে গেছে !

—'আমাকে কেন ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি ! মাসীমা একটা চোখ খোঁজ করে ধমক দিয়ে বললেন, 'খেয়ে ফেলবি নাকি, কথাটা বলনা ।'

ভিক্টর, বন্দনা, রাধা দুই মেসো ও এক মাসীর চীৎকার-করা-দৃষ্টির মাঝখানে উঠে গিয়ে ফোনটা এ্যালোপ্যাথ-মাসীমার কাছ থেকে নিই। সবাইকার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলি,

—'চৌধুরী বলছি ।'

ওপাশ থেকে বসন্তকুমারের পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'রুণা তোমার কথা বলল । তোমাকে আমার খুব জরুরী দরকার ।'

বললাম, 'আমাকে !' তারপর একটু সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, 'রুণা দেবী তো আমাকে নিমন্ত্রণ......'

বাধা দিয়ে বসন্তকুমার বললেন, 'না সে তো শুক্রবার ।'

—'তাই নাকি ? আমাকে তো শনিবার বলে গেছেন ।' ওপাশে একটু দ্বিধা, একটু আলোচনার শব্দ হলো, তারপর বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ শনিবারই । কিন্তু তার আগেই আমার দরকার ছিল । কাল আসতে পারবে ?'

—'কাল তো আমার একটু কাজ আছে বোম্বেতে ।' দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে বলি ।

—'বোম্বেতে । কোথায় ?' উনি শুনে খুশী হলেন যেন ।

—'আমি তো ঠিক চিনিনা । ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসের কাছেই বোধহয় জায়গাটা ।'

—'কোথায় বলতো ?'

৭

—'ঠিকানাটা, কারিগুয় রোড্, ব্যালার্ড এস্টেট্।'

—'ও ব্যালার্ড্ এস্টেটে। তাহলে তো খুব ভাল হয়েছে, তুমি কটায় পৌঁছচ্ছ ওখানে ?'

—'এখান থেকে দশ-টা নাগাদ বেরুব ধরুন......।'

—'তোমার কতক্ষণ কাজ ?' বসন্তকুমার এবারে টাইম্ স্পেসিফিকেশন্-এ চলে আসেন।

বলি, 'বলতে পারি না, ঘন্টাখানেক লাগতে পারে।'

—'তাহলে একটু আগে বের হও। ট্রেনে আসবে তো ?'

—'হ্যাঁ।'

—'ঠিক আছে, কাজ সেরে তুমি ভিটিতেই দাঁড়িয়ে থেকো তোমায় পিক্-আপ্ করে নেব।'

—'ভিটি ?'

—'ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস্।' ছেড়ে ছেড়ে মজা করে উচ্চারণ করেন আপাত গম্ভীর বসন্তকুমার। ফোন্‌টা উনি-ই কেটে দেন। রিসিভার্‌টা রেখে দিয়ে সবাইকার দিকে তাকাই। রাধার চোখে কৌতুক, ভিক্টর মাকে জড়িয়ে বসে, তার চোখেও মজা, তিনজন সিনিয়র স্বাভাবিক, শুধু বন্দনা গম্ভীর—কিছু একটা ভাবছে !

—'কেন ডাকছেন উনি, জানেন ?' মাসীমাকেই বলি।

মাথাটা একবার বাঁদিকে, একবার ডানদিকে ঘুরিয়ে, নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকেন মাসীমা।

—'আন্দাজ করতে পারেন না ?' রাধার দিকেও একবার তাকিয়ে শেষ করি কথাটা।

—'আন্দাজ, হ্যাঁ, তা পারি। কিন্তু বলা বারণ।'

—'!! তাহলে আপনি জানেন ব্যাপারটা !'

—ক্রমশ: প্রকাশ্য।' মাসীমা (এ্যালো) কিছুতেই কথাটা বললেন না শেষ পর্যন্ত।

রাধা, বন্দনাকে একটা ঠ্যালা দিয়ে বলল, 'এই ভুলো মন দিয়ে তুই কাকে কি করবি ?'

বন্দনার অবাক চাউনীর মাঝেই রাধা উঠে গেল। এ্যালুমিনিয়ম্ ফয়েল্‌টা ছিঁড়তে ছিঁড়তে তক্ষুণি ঢুকল। ছোকরাটা প্লেটের ওপর এক গ্লাস জল নিয়ে পেছন পেছন এলো। বন্দনার অপ্রস্তুত ভঙ্গি দেখবার মত !

রাতেই ঠিক হলো মি: তালুকদার আমাকে আর ভিক্টরকে নাবিয়ে দিয়ে

অফিস যাবেন। ফিরবো টেনে।

রাতে শোবার আগে মা'র উদ্দেশ্যে, পূর্ব-পুরুষের উদ্দেশ্যে মনটাকে অর্পণ করলাম। এই ইন্টারভ্যু'টার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। অনেক কিছু।

১৮

খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল। কালকের ফুলগুলোকে একটু দেখে নিলাম। আস্তে আস্তে পাঁপড়ি মেলছে, মিশরের মমির চোখ। বন্দনা কাল অমনভাবে লুকাল কেন? ……

পথঘাট সবই অচেনা। তবুও কোথাও কোথাও কলকাতা মনে হচ্ছে। পথে একটা ইণ্ডাস্ট্রীয়াল্ হাউজ্ লক-আউট্ রয়েছে দেখলাম। সামিয়ানা, ফেস্টুন, কিছু লোকজন? তারা তাদের কলকাতার কাউন্টারপার্টদের মত নিষ্প্রভ নয়। খেতে পায় না, এমন মনে হলো না। বেশ খোশ মেজাজেই আছে!

—'কলকাতায় তো নক্সালাইট্‌দের ডেন্। কাগজ খুললে তো মনে হয় খরগ্‌পুর ছাড়লেই প্রাণ হাতে করে চলতে হয়!' ভিক্টর কমেন্ট করে।

—'তুমি বুঝি প্রো-ইন্দিরা-কংগ্রেস।' জিজ্ঞেস করি।

ও বলে, 'নো নেভার।'

—'ব্যাপারটা কি চল্‌ছে বলতো?' মিঃ তালুকদার প্রশ্ন করেন।

—'এককথায় তো হবে না। তবে এটুকু বলা যায়, কাগজে যা দেখেন, সেটা জোর করে বলা। কোনো পার্টি'র, হয়তো লাভ আছে।'

—'তাহলে কারা তারা?' ট্র্যাফিক্ সিগ্‌ন্যালে গাড়ীটা দাঁড়াল।

—'বোধহয় 'রাউডীজ্' যারা কোন পার্টির রঙীন ব্যানারের আড়ালে শেল্‌টার নিয়ে থাকে। এদেরকে আইসোলেট্ করা মুস্কিল! তাই, 'নক্সাল ধরছি' বলে, কোন পার্টির শক্তি খর্ব করা হচ্ছে হয়তো।'

গাড়ীটা পুরো রাইট্ টার্ণ করে অপেক্ষাকৃত চওড়া একটা রাস্তায় উঠিয়ে নিয়ে এল ভিক্টর। বলল, 'তাহলে এ্যাক্‌চুয়ালী নক্সালাইট্ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, বলতে চাও?'

'না! তা তো বলছি না। তারা আছে। তারা তথাকথিত মস্তান নয়।'

—'কারা তারা?'

একটু চুপ করে থেকে বলি, 'এমনিতে তো দেখতে পাবে না। তোমার

আমার মত ছেলেরা। যাদের এডুকেশন্ আছে —চাকরী নেই, যোগ্যতা আছে —দেখাবার মত ফিল্ড্ নেই—তারাই নতুন একটা দেশ গড়তে চায়। নতুন একটা আইডিয়ালিজ্‌ম্ সম্মুখে রেখে।

—'স্কুল-কলেজে আগুন দিচ্ছে ? মিঃ তালুকদার প্রশ্ন করেন।

—'এডুকেশন্ সিস্টেমের আমূল একটা পরিবর্তন আনার জন্য।

—'আরে, এডুকেশন্ সিস্টেম্‌টা চালু করবেটা কোথায় তাহলে ; স্কুলই যদি পুড়িয়ে দেয়া হয় ?' অবাক হন মিঃ তালুকদার।

—'না মেশোমশাই। আপনি তো ফুলগাছ ভালবাসেন। আপনি লক্ষ্য করেছেন বা হয়তো আপনি এটা করেও থাকেন। গাছের পোকাধরা ডাল-পালা একটু ছেঁটে দিলে, গাছটা কি মরে যায় ? বাকী গাছটা তখন আপ্রাণ চেষ্টা করে না মমতা দিয়ে কাটা অংশটার মেরামত করে ফেলতে ?'

—'বুঝলাম না কী বলছ।'

—'বলছি, কটা স্কুল পোড়ানো হয়েছে বলুন তো ? দুয়েকটা। তা যে কোন কারণেই হোক। এতে সেণ্টারের এ্যাটেন্‌শন্ ড্র করা যাবে। সেণ্টার এটা নিয়ে চিন্তা করুক। এদিকে দৃষ্টি দিক !'

—'আর ঐতিহাসিক মনীষীদের মূর্তিগুলো ভেঙে কার এ্যাটেন্‌শন্ ড্র করা হচ্ছে ?'

—'সমাজের।' একটু পরে বলি, 'বিবেকানন্দ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর আচার্য্য জগদীশ, রবীন্দ্রনাথ, এঁদের মূর্তির নীচে দাঁড়িয়ে, জন্মদিনে মালা পরাব। ফাংশন করে লক্ষ টাকা ব্যয় করব। অথচ, তাঁদের নীতি, তাঁদের উপদেশ, তাঁদের দানের কথা একবারও ভাবব না। এট ঠিক ? তাহলে এই পাথরের মূর্তিগুলোকে অপমান না করে ভেঙে ফেলাই তো শ্রেয়ঃ।'

—'তুমি এইসব কোথা থেকে জানলে ?' মিঃ তালুকদারের প্রশ্নে, ভিক্টর আঁতেল হাসি হেসে বলল,

—'ও এর্কটিভ্ মেম্বার, বাবা !'

আমি হেসে বলি, 'ইউথ-পাওয়ার্‌টাকে ডাইভার্ট করার জন্য কি করলে জান ? যে সমস্ত বই রাতের অন্ধকারে, ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে পুলিশের চোখ বাঁচিয়ে বিক্রী করা হতো ; সেই বই, বাংলায় গাদা, গাদা, সচিত্র মাসিক পত্রিকার মত প্রকাশ্য দিবালোকে কলকাতার পথে পথে বিক্রী হতে থাকল !'

—'কি বই ?'

—'পর্ণগ্রাফী। ওপ্‌ন্ লাইসেন্স্ হঠাৎ দিল কেন গভর্ণমেণ্ট ? ভাববে না কথাটা ?'

—'কেন বলত ?'

—'ট্যু ডাইভার্ট' এ জেনারেশন্ ট্যু পার্ভারশন্। চাকরীর বদলে।'

—'ছেলেমেয়েরা কেনে কেন ওই বই।' রীতিমত ধমকের সুর আসে, পেছনের সীট্ থেকে।

—'কতজনের মনের জোর আছে বলুন! নিজে না কিনলেও বন্ধুরা কেনে, কিনে দেখায়। নিভৃতে বসে, রাত জেগে এই অখাদ্যগুলো গেলে। তাই, পরীক্ষায় বসে, টোকা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। পড়ার বই পড়ার সময় কই?'

—'এর জন্য কাকে দায়ী করছ তুমি?'

—'যদি বলি সেণ্টারকে! এটা তাদের ইচ্ছাকৃত এক্স্‌পেরিমেণ্ট্! এবং এক্স্‌পেরিমেণ্টটা বাংলাতেই হয়েছে, কারণ—'

—'কারণ?'

—'কারণ, দেশ-উদ্ধার থেকে আরম্ভ করে যত বড় বড় চিন্তার কাজ এই বাঙালীর মস্তিষ্ক-প্রসূত। যদি বলি এটা, অন্য প্রভিন্স জেলাসীর চোখে দেখে থাকে!'

এরপর আর কথা এগোয় না। হয়তো ওদের পছন্দ হয় না কথাগুলো।

আশেপাশে অফিস যাত্রীর পোষাক দেখে মনে হয় সবাই ফ্যাসান্ প্যারেডে যাচ্ছে। কি ছেলে, কি বুড়ো, কি মেয়ে, কি তার মা! কলকাতায় যেটুকু দেখে আমরা সঙ্কুচিত হই, এখানকার তুলনায় সেটা পার্সেণ্টেজেই আসে না। পথে দুএকটা রাস্তা চেনাতে চেনাতে চলেন মিঃ তালুকদার।

পঁচিশ মিনিটে পেঁছে গেলাম। ভিক্টর বলল, 'ইএ সব ব্যালার্ড এস্টেট্—।' পরপর ম্যানসন্‌গুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে অফিস আর ফ্যামিলী রেসিডেন্স ভাড়া দেয়া। কি বিরাট প্রপার্টি।

—'ওই পরের টার্ণটা বোধহয় কারিমভয় রোড।' মিঃ তালুকদার ভিক্টর আর আমার মাঝখান দিয়ে, সামনে আঙুল দিয়ে দেখালেন।

—নাম্বারটা কত?'

—'নাম্বার তো নেই—বাড়ীটার একটা নাম আছে, 'কাইজার-ই-হিন্দ্-বিল্ডিংস্।' গোটা কয়েক ব্লক্ বাদেই লেখাটা নজরে পড়ল। বাঁদিকে গাড়িটা পার্ক করে ভিক্টর দরজা খুলে বেরিয়ে এসে আমার সীটে বসল। মিঃ তালুকদার স্টিয়ারিং ধরলেন। ভিক্টরকে কোথাও নামিয়ে, উনি অফিস যাবেন। 'উইশ্ ইউ বেস্ট্ অব্ লাক্।' দুজনেই হেসে হাত নাড়লেন। মিঃ তালুকদার তাঁর নামাঙ্কিত একটা ভিজিটিং কার্ড ড্যাশ্ বোর্ড থেকে বের করে আমায় ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওরা যদি তোমায় পৌঁছে না দেন, তাহলে

দাদারে নেবে একটা ট্যাক্সি নিও। ঠিকানাটা কাজে লাগতে পারে। দরকার হলে অফিসে বা বাড়ীতে ফোন কোরো।' খুবই স্নেহ-বৎসল মেসো, আমাকে গাইডেন্স দিয়ে দিলেন। আগের থেকেই কেমন লাগছিল, তবুও গাড়ীটা ছেড়ে দিতেই কেমন বেশী একা একা, খারাপ লাগতে লাগল। বুকের ভেতর একটু ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল না, একথাটা বললে সত্যের অপলাপ হবে।

১৯

লিফ্‌ট্-ম্যানকে জিজ্ঞেস করতেই দরজাটা ইশারায় দেখিয়ে দিল।

ছোট্ট অফিস, সাজানো। তবে মস্ত একটা হল্ আছে। বোম্বের পক্ষে বেশ ছোটই ঘরটা। দুটো কিউবিকল্‌স্। প্লাইউড্ আর ব্লক-বোর্ডের শ্রাদ্ধ হয়েছে। মাঝে ক'জন অফিসর। হ্যাঁ, ক্লার্ক নেই, সবাই অফিসর। হলের দেয়ালে, দেয়ালে স্টীলের র‍্যাক্। তাতে মোটা লাল, নীল, হলদে ফিতে বাঁধা, ঈষৎ সবুজ রঙের ফ্ল্যাট্-ফাইলগুলো অগুন্তি! ভাগ্য! চিত্রগুপ্তের খাতায়! ওরই কোন একটিতে আছে বাবার ফিল্-আপ্ করা একটা ফরম্, যেটাকে পাল্টানো দরকার! পারলে এক্ষুণি! পাশাপাশি কিউবিক্‌ল্‌স্ দুটোর একটিতে ঝক্‌ঝকে পেতলের স্ল্যাবের ওপর ইংরাজী হরফে লেখা মহিন্দর সীং (আবার শিং!)। অন্যটিতে একই রকম, তবে নামটা আলাদা এবং আমার পরিচিত। এঁর নাম সই করা গোটা কয়েক চিঠি আমার হাতের ফাইলে আছে। দেখা করতে এসেছি এঁর সাথেই। কলকাতার মতই অবস্থা অফিসের। গভর্‌মেণ্ট অফিসের ছবিটা যেমন হয়। কাজ নয়, একটু গল্প-গুজব হচ্ছে। এই তো বসল অফিস।

যে কোন একজনের তাকানোর প্রতীক্ষায় সেকেণ্ড কয়েক অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে গিয়ে প্রথম টেবিলের ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। সাউথইণ্ডিয়ান্। টেবিলের নীচে ওর বার্মিজ লুঙ্গির অংশ বিশেষ নজরে এলো। চেয়ার সরিয়ে বসে পড়লাম। ওপরে ফুল-স্লীভ্ শার্টে টাই সাঁটা আছে! চেয়ারের পেছনে জ্যাকেট্‌টা ঝোলানো। আমাকে বসতে বলে, পাশের মহিলা অফিসারের সঙ্গে বাক্য-বিনিময় চালিয়ে গেল। এতে উপ-কারই হল আমার। কিছুক্ষণ রেস্ট নিলাম। এখন আর অসুবিধে লাগছে না। মনে হচ্ছে না আমি অনেক দূরে চলে এসেছি, চেনা লোকজন ছেড়ে। মনে হচ্ছে দেখাটা সেরেই টুক্ করে বি বি ডি বাগের কোণ থেকে মিনিবাসে চেপে বাড়ী!

এতক্ষণে লোকটার দয়া হলো। কিংবা আমার পরনের স্যুটের কাপড়টা অথবা টাই-টা পছন্দ হয়েছে বলেই, কথা বলতে বলতে একটা ভিজিটরস্ স্লিপ পেপার প্যাড থেকে ছিঁড়ে এগিয়ে দিল। তাতে লাইনিং-এর পকেট থেকে পেনটা বের করে গোটা গোটা স্পষ্ট লেখাগুলো ফুটিয়ে তুললাম। টু সী, মিঃ এম, কে, রঙ্গস্বামী। পারপাস অব ভিজিট্, ট্যু কনভিন্স লিখতে গিয়ে, থেমে, ভেবে নিয়ে লিখলাম 'পার্-সোনাল।' এরা তো আর জানবে না কেন দেখা করছি! এরপর ন'ম রহিমিয়ার রেহমান চৌধুরী, পুরো নামটাই লিখলাম। এবং একটা অবলিক স্ট্রোক দিয়ে কেস নং এন. সি. তিনহাজার-কত ভুলে গিয়ে ফাইল খুলে নাম্বারটা দেখে, টুকে দিলাম। তারিখটা যদিও জানাই ছিল, তবুও ঠিক ওই সময়টায় মনে এলো না কিছুতেই। আমার এটাই দোষ। দেয়ালে ক্যালেণ্ডার ঝোলানোর জায়গা নেই, সর্বত্র র‍্যাক। টেবিলের ওপর একটা প্ল্যাস্টিকের ডিস্‌প্লে দেখে, সেটাকে ঘুরিয়ে নিজের দিকে ফেরালাম। আবার ঠিক জায়গায় রেখে তারিখটা কাগজের টুকরোটাতে তুলে, আরও একবার সম্পূর্ণ কীর্তিটা মনে মনে পড়ে নিয়ে, 'বকবকিয়ান্তম'-এর সামনে একটুকরো কাঁচ-খণ্ড নিয়ে চাপা দিলাম।

লোকটা সেটা টেনে নিয়ে পড়ল। কলিং বেল্‌টা টিপতে গিয়ে থেমে গেল। তারপর নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, 'হোয়ার ফ্রম ইউ আর কামিং?' 'ফ্রম হেভেন' বলতে গিয়ে একটু ঢোক গিলে বললাম,

—'ক্যালকাটা'

লোকটা ততোধিক নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, 'গো ব্যাক টু ক্যালকাটা। হি ইজ দেয়ার। হিয়ারিং স্টার্টস্ এগেন ফ্রম ট্যু ডে, এণ্ড উইল কণ্টি-নিউ ফর ওয়ান উইক।'

দ্যুস! একবারও মনে হলো না কলকাতার অফিসটায় একবার জিজ্ঞেস করে যাই! কি করি?

আমার চোষা আমসত্ত্বের মত নেতিয়ে পড়া মুখের চেহারা দেখে মহিলাটির বোধহয় দয়া হলো। কি যেন নিজেদের মধ্যে প্রাইভেট টক করে নিয়ে বলল, 'হোয়াইট ইজ ইয়োর পারপাস অব ভিজিট?' ওরই হাতে ধরা এখনও আমার লেখা কাগজটায় যদিও 'পারসোনাল' শব্দটা লেখা, তথাপি এই প্রশ্ন কেন? সব সময় সবাই সর্বত্র সত্য কথা লেখে না, এটা কি এরাও জানে। একটু ইতস্ততঃ করে বলেই ফেললাম 'ইউ নো, আই অ্যাম এ ক্লেমেণ্ট?'

—'ইয়েস আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড দ্যাট ফ্রম ইয়োর কেস নাম্বার।' কথাটা

শেষ করে, আমার থেকেও বোকার মত তাকিয়ে থাকল।

বললাম, 'মিঃ স্বামী ওয়াণ্টেড টু্য ক্যান্সেল মাই ক্লেইমস। সো আই হ্যাভ কাম্ টু্য সেটল্ দ্য ম্যাটার……এণ্ড টু্য আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড হোয়াট হি মীনস টু্য সে!'

—'ওয়াণ্টেড টু ক্যান্সেল!' মেয়েটি এবার সত্যিই অবাক হলেন। 'হোয়াই?' প্রশ্নটা যদিও আমারই করার কথা, তবু মহিলাটিই স্বধর্ম রক্ষা করলেন।

ফাইল্‌টা খুলে সবার ওপরের চিঠিটা দেখালাম। চিঠিটা দেখেই ওরা একটু হেসে বেল্ বাজিয়ে বেয়ারা এনে, একটা চিরকুট্ ধরিয়ে দিল। বেয়ারাটি চিরকুট্‌টি পড়ে নিয়ে র‍্যাকের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু বাদেই ফাইল্ একটা নিয়ে এসে, টেবিলে ফেলে দিয়ে, অন্য টেবিলের কাছে চলে গেল। সাউথ্-ইণ্ডিয়ান্ অফিসর ফাইলটা খুলে তার ভেতরের কাগজ কয়েকটা পড়ে নিয়ে বলল, 'ল্যুক্ হিয়ার্।' তারপর থেমে গিয়ে বলল 'হু ইজ্ আব্দুল্ রেহ্‌মান্ চৌধুরী?'

—মাই ফাদার!' আমি বললাম। 'আই হ্যাভ্ দ্য পাওয়ার্ অব্ এ্যাটর্নী, টু্ রিপ্রেজেন্ট্ হিজ্ কেস্ টু্য দ্য কাস্‌টোডিয়ান্।' এই খবরটাও আগেভাগে জানিয়ে রাখলাম। কি জানি আবার কোন্ ফ্যাকড়া তুলবে।

লোকটা বললো, 'ইট্ ইজ্ অলরাইট্, বাট্ ইউ হ্যাভ্ মিস্‌টেকেন্ ফ্রম্ দ্য ভেরী ফার্স্ট স্টেপ্' লোকটা এমন সাধারণভাবে কথাটা বলল যেন এটা ক্যান্সেল্ হয়ে যাওয়াটা কিছু ব্যাপারই নয়। —'ইউ আর সাপোজ্‌ড্ টু্য এ্যাফার্ম ইয়োর্ ক্লে্ বিফোর এ ম্যাজিস্ট্রেট্?' ফাইলটা আমার দিকে ঘুরিয়ে দিল। তাকিয়ে বুঝলাম কেন সো-কজ্-নোটিশ্‌টা পেয়েছি। বাবা এটা মিস্‌টেক করে ফেলেছেন একটু ট্যাপ করে দেখলাম। যদি……।

—'ইজ দেয়ার্ এনিওয়ে, টু্য রিভাইড্ দ্য কেস?' যথাসম্ভব বিনয় প্রকাশ করে বললাম বুকটা থির থির করছে।

লোকটা তখনই জবাব দিল, 'ইয়েস, বাট ইফ ইউ কুড মীট দ্য এ্যাসিস্-ট্যান্ট কাস্টোডিয়ান মিঃ সীং, দ্য ম্যাটার কুড্ বী ইজিয়ার্।' লোকটা নয়, ভদ্রলোকটি এবার সত্যিই আমায় উপকার করার ইঙ্গিত দিলেন।

—'মে আই মীট্ হিম্ নাও?'

—'নো, হি ইজ্ অন্ সিক্-লীভ্।' রিলাক্‌ট্যান্ট্‌লি উত্তর দিলেন তিনি। ভাগ্যটা অপ্রসন্ন দেখছি। দু'জনের একজনও নেই। কবে নাগাদ মহিন্দর সীংকে পাব জিজ্ঞেস করায় জানলাম, 'ফ্রাইডে।' হয়েছে সীক আরেকজন, এই লোকটা কি করে এতখানি স্যাঙ্গুয়িন হয়ে গেল? জয়েনিং

ডেট বলে দিচ্ছে। কেউ যখন নেই তখন কায়দা করে ভিজিটরস স্লিপে নাম লেখালোই বা কেন ? কিসস্যু বুঝলাম না।

ভদ্রলোকটি এবার বলল, 'বেটার ইউ কাম নেক্সট উইক অন মনডে—আফটার লাঞ্চ আওয়ারস্।' কেটে কেটে শোনার ফাঁকে একটু ভেবে নিলাম, ফাইলটা গোছাবার অছিলায়। সাথে নতুন একটা ফরম্ ফিল্-আপ্ করা আছে এতে নতুন অনেকগুলো আইটেম্ও যোগ করা হয়েছে—কোর্ট থেকে এ্যাফার্ম করা। এটাকে কোনভাবে সাবমিট করে দিয়ে পুরোনোটা সরিয়ে ফেলতে পারলে গোল মিটে যায়। কিন্তু রিসিভিং-ডেট-স্ট্যাম্পটা কি করে পাবো ? উনিশশো বাহাত্তরের ডেট স্ট্যাম্প ? খুব নার্ভাস লাগছে এই প্রপোজাল্টা দিতে। ভদ্রলোকটি যদি ক্ষেপে যায় ? থাক। একটা আরো পুরো সপ্তাহ থাকতেই হবে। অন্যের বাড়ীতে এরকম থাকতে খুব লজ্জা লাগছে, সন্দেহ নেই। যদিও ও'রা খুবই ভদ্রলোক। এবং আপন-জন-সুলভ আচরণ তথাপি।

ফাইল্টা দড়ি দিয়ে ঠিক মত বেঁধে ভদ্রলোককে ফেরৎ দিয়ে বললাম, 'ইফ ইউ আর্ শীওর, দ্যাট্ ইয়োর্ কাস্টোডিয়ান্ উইল্ বী এভেইলেব্ল্ অন্ মন্ডে। আই মে হ্যাড্ মাই রিজার্ভেসন্ বাই বোম্বে মেল,—সেইম ইভ্নিং—— ?'

—'ওই্ শীওর ! ইউ উইল্ বী এবল্ ট্যু মীট্ হিম্ অন্ দ্যাট ডে ! হি উইল রীচ হিয়ার্ অন্ স্যাটারডে !' নিশ্চিন্ত হলাম। ধন্যবাদ-টাদ্ দিয়ে এবং নিয়ে, বাইরের উন্মুক্ত এবং গতিশীল পরিবেশে এসে হাঁপ ছাড়লাম। সম্মুখে পুরো এক সপ্তাহ, সাতটা দিন। সাতটা রাত্রি।

এখন ষ্টেসনে গিয়ে রিজার্ভেশনটা করে ফেলি তো। তার পর ভাবা যাবে। নীচে নেবে ফুটপাত ধরে হাঁটতে থাকি। প্রাইভেট্ কার যাচ্ছে, আসছে, বড় রাস্তা দিয়ে। ট্যাক্সি একটাও খালি পাওয়া যায় নাকি অফিস্ আওয়ার্স্-এ ? বাস যাচ্ছে। কলকাতা থেকে অনেক অনেক ফাঁকা। এই সময়ে এমন ফাঁকা বাস কল্পনাই করা যায় না। দেয়ালে দেখলাম বড় রাস্তার নাম লেখা রয়েছে। আন্দাজে মনে হলো, ডানদিকে হবে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস্। স্টেসনটা এখন পর্যন্ত আমার অদেখাই রয়ে গেছে। জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে দাঁড়ালাম। একজন মাঝবয়সী পাসার্স্-বাইকে ধরে কত নম্বর বাস ষ্টেসনে যায়, জিজ্ঞেস করে বিপদে পড়লাম ! সে আমার এত খুটিনাটি জানতে চাইল, ঘাবড়ে যাবার যোগাড় ? হতে পারে তার গোটা-কয়েক অনূঢ়া কন্যা আছে, তবুও রাস্তায় .... কোনরকমে তাকে কাটালাম।

৮

দুয়েকজনকে দেখলাম প্রাইভেট্ গাড়ী দেখলেই হাত নেড়ে আঙ্গুলের একটা বিশেষ মুদ্রা করছে। অনেকেই গাড়ী থামাচ্ছে। একটু কথা বলেই ষ্টার্ট দিয়ে চলে যাচ্ছে, হেসে। তারপর এক একটা গাড়ীতে উঠে পড়ছেও! হিচ্ হাইকিং বেশ চালু এখানে। অভ্যস্ত না হ'লে, অসুবিধে লাগে।

কোম্পানীর দশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে দেয়া রিস্ট্ ওয়াচে দেখলাম দশটা চল্লিশ।

বসন্তবাবুর এ্যাপয়েন্টমেন্ট্ মনে আছে। তক্ষুণি একটা ফিয়াট্ সামনে এসে হর্ণ দিয়ে একটু খেলা করল। এক নজরে দেখে নিলাম মালিক নয়। চেহারা দেখে ড্রাইভার মনে হয়। দ্বিধা কাটিয়ে সামনের সীটে উঠে বসলাম। দরজাটা বন্ধ করে বললাম, 'ভিক্টোরিয়া টারমিনাস্'। উত্তর হলো 'বাস্! কোই বাত্ নেহি।' দু'মিনিটও লাগল না পৌঁছে গেলাম। দুটো টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে নামতে গেলাম ও বলল, 'মিনিমাম পাঁচ রূপেয়া তো জরুর হোনা চাহি।' কথা না বাড়িয়ে আরও তিনটে একটাকার নোট ফেলে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। গাড়ীটা চলে যেতেই ওপাশে ঢুকে গেলাম দ্বিতীয় হাওড়া ষ্টেসনে। ওই রকমই গথিক-স্ট্রাকচার। ওই রকমই অফিস যাত্রীর ভীড়। লোকাল ট্রেনগুলি একই রকম বাদুর-ঝোলা হয়ে পেসেঞ্জার এনে ফেলছে, ঢাউস করে।

একজন চেকারকে জিজ্ঞেস করে কাউন্টার খুঁজে পেলাম। লাইন দিয়ে ফরম্ নিলাম। ফরম্ ফিল্-আপ্ করে ফের কাউন্টারে গিয়ে জানলাম সেকেণ্ড ক্লাসে, ভেস্টিবিউল্—চেয়ার কারে, থ্রি-টায়ারে কোন সীট নেই, দিন কুড়ির মধ্যে। ফার্স্ট ক্লাসে? জিজ্ঞেস করতে লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল, 'আগলা কাউন্টার'। জিজ্ঞেস করে অন্যায় করে ফেলেছি বোধহয়। ভুল আমারই হয়েছিল। ফার্স্ট্ ক্লাসের আলাদা কাউন্টারই থাকে; সিটি বুকিংগুলোতে ছাড়া। এর লাইনটা ছোট। ওই ফর্ম্টাতেই ঠিক করে লিখে নিলাম কাউন্টারে পৌঁছনোর আগেই।

অনেকগুলো করকরে নোট কাউন্টারে ঢুকিয়ে রিজার্ভেশন স্লিপ্ শুদ্ধ টিকিটটা বের করে আনলাম। কাউন্টার থেকে সরে দাঁড়িয়ে টিকিটগুলো আরও একবার দেখে নিয়ে লাইনিং এর পকেটে ভরে রাখলাম। বাইরেটা একবার দেখে এলাম। নাঃ কাউকে দেখেই বসন্তকুমার মনে হচ্ছে না। পার্ক করা গাড়ীগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, ক্যাফেট্রিয়ায় ঢুকলাম। একটা চিঠি লেখা দরকার কলকাতায়। ইনল্যাণ্ড একটা বের করে সমস্ত বিবরণ দিয়ে বাবাকে লিখলাম। মাকে পৃথক ভাবে ভাল আছি জানালাম।

একপট্ কফি আর এক প্লেট স্মল স্ন্যাক্স একটু সময় নিয়েই খেয়েছি। বিল্‌টা মিটিয়ে উঠে পড়লাম। চিঠিটা ডোরা-কাটা মেল বাক্সে দিয়ে বাইরে এসে পৌঁছতেই, ফোর ডোর স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ডটা চোখে পড়ল। রুণা ওয়েভ্ করল। আমিও বাঁ-হাত নেড়ে এগিয়ে গেলাম। ট্রাফিক্ ওখানে গাড়িটা দাঁড় করাতে নিষেধ করছে। দরজাটা ঝুঁকে খুলে দিতেই চট করেই উঠে বসলাম। পুলিসটা এগিয়ে আসার আগেই স্পীড নিল রুণা।

—'কতক্ষণ ডিটেণ্ড করালুম ?' একটু ভারী, একটু খস্‌খসে কণ্ঠ রুণার। এবং একটু আহ্লাদে।

—'না —একদম না। এইতো এলাম ! একটা কাজ সেরে ফেললাম। চিঠি লিখলাম একটা।'

—'কাকে ?' দুষ্টু দুষ্টু হাসছে।

—'মা, বাবাকে। এসে একটা কেবল্ করেছিলাম।'

—'তাও ভাল।' থার্ড্ গিয়ারে নিয়ে এসে উঁচুমত একটা কালভার্ট পার হলো। আবার টপ্ গিয়ারে নিয়ে, এ্যাক্সিলেটরে চাপ দিল।

—'আপনি খুব স্মুদ্ ড্রাইভ্ করেন তো।' প্রশংসা করি ওর ড্রাইভিং এর। একটু হাসল। আজকে পোশাক হচ্ছে গাঢ়ো নীল ট্রাউজার এবং শাদা শার্ট। বাঁহাতে চুলটা ঠিক করে নিয়ে রুণা বলল,

—'আপনার কাজ হলো ?'

—'এ্যাঁ ? না। অফিসররা কেউ নেই। ক'দিন অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।'

একটু চুপ করে থেকে রুণা প্রশ্ন করল, 'আপনি এর আগে কখনও বোম্বে এসেছেন ?'

—'না।' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা বসন্ত, মানে আপনার বাবা আমাকে কেন ডেকেছেন বলুন তো !'

ঠোঁটটা উল্টে বলল, 'কী জানি !'

—'দ্যুৎ, তা কখন হতে পারে ! ফোনে আমায় বললেন, আপনি ওঁকে আমার সম্বন্ধে কি বলেছেন ?' চেপে ধরলাম।

—'পৌঁছেই জিজ্ঞেস করবেন বাপীকে।' নিস্পৃহ উত্তর। বোধ হয় আড়-চোখে আমায় দেখে নিল।

—'হ্যাঁ সে তো ...।' হাসলাম। এরা কেউ বলতে চাইছে না ? যাক্ আমার কি ! গিয়েই দেখা যাক। রুণা ড্যাসবোর্ডে সুইচ টিপে রেডিওটা চালিয়ে দিল। পেছন থেকে খু-ব আস্তে ওয়েষ্টার্ণ সুর আসছে।

ডিস্টাবেন্স হচ্ছে ওয়েভ লেংথে।

—'আপনি পশ্চিমী সুর পছন্দ করেন ?' রুণা আমার লাইকিংস জেনে নিতে শুরু করল।

—'কানে যে সুর ভালো লাগে সেটাই আমার পছন্দ। তা সে পূর্বাই হোক আর পশ্চিমা-ই হোক।' এককথায় সেরে ফেলি।

কিছুক্ষণ চুপ। দুম্ করে প্রশ্ন করে ফেললাম, 'আপনার এরকম পোষাক পছন্দ ?' একটু শব্দ করেই হেসে উঠল। নীচের ঠোঁটটা ক্যানাইনটুথ্ দিয়ে বিঁধিয়ে, ঘাড়টা একটু বাঁকিয়ে বলল,

—'আপনার অপছন্দ বুঝি ?'

—'না। আজকাল দেখি ছেলে মেয়েদের এক রকম পোষাক।'

—'আপনার কালে কি ছিল ?' বিদ্রূপ-মিশ্রিত কণ্ঠস্বর রুণার।

হেসে বলি, 'মেন্টাল এজ্‌টাই আসল বয়েস। সেই হিসেবে আমার ষাট্।'

—'এঁ্যা, আপনি বুড়ো! আমি আপনাকে ইয়ং ভেবেছিলাম।'

—'হ্যাঁ, আপনার তুলনায় বুড়োই। আপনার মেন্টাল্ এজ্ খুব কারেকট্ করে বললে, এগারো।' ডেফিনিট্ সুরে বলি।

—'এইরে, আপনি এটুকু আলাপেই একজন মহিলার বয়েস নিয়ে তারই সামনে হিসাব করতে শুরু করলেন ?'

রুণা স্পীড্ কমিয়ে এনে একটা পাঁচ মাথার মোড়ে এসে ট্রাফিক্ সিগন্যাল দেখে নিয়ে পুরো রাইট্-টার্ণ করল। চুপ করে বসে ভাবছি মেয়েটা সত্যিই রাগ করল নাকি ? একটা বড় গেট্ওয়ালা বাগানবাড়ীতে গাড়ীটা ঢুকিয়ে, বাগানের ওপর বসে থাকা একদল ছেলের সামনে নিয়ে গিয়ে গাড়ীটা ডেড্ স্টপ করল। তাদের সবাই রুণাকে নিয়ে গলে পড়তে চায় ? অন্তত: আমার তাই মনে হলো। একজন ক্যামেরা নিয়ে ফট ফট করে আমার গাড়ী থেকে নাবা, পেছন ফিরে দরজা বন্ধ করা, ঘুরে ক্যামেরা-ম্যানকে দেখা, এবং সবশেষে রুণার ডাকে ওকে ফলো করে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, এই সব কটির ছবি তুলে ফেলল। পাগলা না কি ? কি ভাবে ফিল্ম নষ্ট করছে। না কি রুণার সাথে এসেছি তাই এই খাতির ? বসন্তকুমারের এমন বিরাট বাড়ী বোম্বেতে !

চারিদিক তাকিয়ে দেখতে দেখতে ভেতরে ঢুকে গেলাম। রুণা কয়েকটা অফিস বা লাইব্রেরী-ঘর টপকে, আমাকে নিয়ে এলো এক হল্ ঘরে। খুব সাজানো ঘরটা। মাঝে একটা বড় সেক্রেটারিয়েট্ টেবল্-এর এক পাশে তিন-জন ভদ্রলোক বসে। তাদের মুখ দেখতে পাচ্ছিনা। পাশে আরও চারটে

চেয়ার খালি। যাঁর মুখ দেখা যেত, তাঁর রীভালভিং চেয়ারটা ফাঁকা। রুণা আমাকে বসিয়ে কোথায় চলে গেল।

পাশের ভদ্রোলোক দু'জন একটা স্কেচ দেখছেন। পিরামিড, স্ফিংকস, শেয়ালের মুখওয়ালা মানুষ এইসব। তৃতীয়জন একটা মোটা ইংরাজী বই পড়ছেন গভীর মনোযোগ দিয়ে। গোটা বারো পাতা শেষ হতে বাকী, খুব তন্ময় দেখাচ্ছে। বই-এর নামটা এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না। স্টেটসম্যান এডিটর না কি যেন লেখা আছে। পুরোনো স্টেটসম্যান কাগজের নামটা যেমন ইটালিকস-এ থাকত। মোটের উপর আমার দিকে কেউ ফিরেও তাকালেন না। অগত্যা টেবিলের ওপর থেকে বেতের বাস্কেটে রাখা ম্যাগাজিনগুলো থেকে একটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলাম। তক্ষুনি একটা সুদৃশ্য জয়পুরী কাঠের কাজ করা ট্রে-তে করে ছয়টি সোনালী কাপে কফি নিয়ে এলো একজন বয়স্ক পুরাতন ভৃত্য। তিনজন তিনভাবে ব্যস্ত ভদ্রলোকের সম্মুখে, তিন কাপ। আমার সম্মুখে এক কাপ, এবং অনুপস্থিত দুটো আসনের উদ্দেশ্যে দু'কাপ নামিয়ে রেখে সে চলে গেল। যতখানি নীরবতা ঘরে বিরাজ করছিল, ঠিক ততখানিকে-ই বসিয়ে রেখে দিল। সত্যি কথা বলতে কি, আমার এই ম্যাগাজিনের পাতা উল্টানোর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ-ই হচ্ছে না এত বড় ঘরটায়।

কফির কাপগুলো তাদের চমক এবং উত্তাপ থাকা সত্ত্বেও, কারোই আকর্ষণ টানতে পারল না। তাই উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে অভিমানিনীর মত অনাঘ্রাত হয়ে নিস্তেজ হতে থাকল ক্রমশঃ!

—'কফিটা ঠাণ্ডা করছেন কেন?' পাশে বসে রুণা তার নিজের কাপে চুমুক দিল।

—'কোথায়, আপনার বাবা কোথায়?' ঘরের নীরবতা রক্ষা করে আমিও একটা চুমুক লাগালাম। একদম শরবৎ হয়ে কোল্ড-কফির পর্যায়ে উন্নীত হয়ে গেছে।

—'চেয়ারে?' উত্তর শুনে চমকে টেবিলের ওপারে তাকিয়ে অপ্রস্তুত হতে হতে দেখি স্বয়ং বসন্তকুমার আমার দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছেন। চোখাচোখি হতেই একটু হাসলেন। একটু ভদ্রতাসূচক উঁচু হয়ে নমস্কার করলাম। উনিও তাই—।

বললাম, 'বলুন! আমায় ...?'

হাত দিয়ে ইশারা করে কফিটা শেষ করতে বললেন। রুণা দেখলাম ছোট্ট সীপে আরও একটু কফি চাখল। আমি বাকীটা এক চুমুকে শেষ করে প্লেটশুদ্ধ টেবিলে কাপটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, একটা প্রশ্নবোধক দৃষ্টি

ছু'ড়ে বসে থাকলাম। বই-পড়া ভদ্রলোক শেষ পাতাটা শেষ করে ফেলতেই বসন্তকুমারের চিরপরিচিত গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল, 'কেমন লাগল বলুন।'

—'সুপা—র্ব'। ভদ্রোলোক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঘোষণা করেন। 'স্ক্রীপ্ট-এ কয়েক জায়গায় চেঞ্জ করার দরকার আছে। এই বইটা খুবই হেল্প করবে।'

বাকি দু'জন ছবিগুলো সম্পর্কে বললেন, 'প্লাস্টার-অব্-প্যারিস্ দিয়ে ভালই হয়েছে সেটগুলো। আজকেই ফিনিশ হয়ে যাচ্ছে।'

—'তাহলে তো কাল আবার শুটিং ষ্টার্ট্ করা যায়?' বসন্তবাবুর প্রশ্ন!

দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে একজন কৃশকায় ভদ্রলোক বললেন, 'হ'্যা কাল সকাল নটায়, এক নম্বরে।' সবাই একসঙ্গে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ভদ্রলোক এসে একটা টুলের ওপর বসে পড়লেন। চোখে মুখে এ'র কেমন একটা ঘোর ভাব আছে কি যেন ভাবছেন। পরনে খদ্দরের পাজামা আর পাঞ্জাবী তারপর এ'র সাথে সবাই, বিভিন্ন শট্ সম্পর্কে আলোচনা চালাতে লাগলেন। কথাবার্তায় বোঝা গেল, কোন একটা হিন্দী ছবির সুটিং হচ্ছে। এ'রাই তার ডিরেক্টর প্রডিউসার, টেক্‌নিক্যাল্ এ্যাসিস্ট্যান্স্, সব। খদ্দর পরিহিত ভদ্রলোকই মনে হলো ডিরেকটর; বাঙালী। তাঁর সাথে বার কয়েক আমার চোখাচোখি হলো। আমি তো বুণার পাশে যথা সম্ভব গম্ভীর হয়ে বসে আছি।

বসন্তকুমার ইণ্টারকমে চাপ দিয়ে অদৃশ্য কারো উদ্দেশ্যে বললেন, 'নিয়েছে?' ... ট্রিট্‌মেণ্ট কেমন? ... ঠিক আছে ড্রাই করেই এখানে নিয়ে এসো ...।' রিসিভারটা রেষ্ট করলেন, আমার দিকে তাকিয়ে 'খদ্দর'কে বললেন, 'কি মনে হয় এম জি। একে বুণা, আবিষ্কার করেছে।'

একটু হেসে ভদ্রলোক বললেন, 'ঠিক আছে ক্লোজ্ আপ্ কেমন এলো?' 'আসছে ...।' কথা শেষ করার আগেই মাঠের ছোকরাগুলির একজন একটা এনভেলপ্ এনে টেবিলে রেখে গেল। বসন্তকুমার সেটা ছোঁবার আগেই এম. জি সেটা নিজ হস্তগত করলেন। আমরা সবাই সেদিকে দেখছি। খামটার ভেতর থেকে গোটা কয়েক ফোটোগ্রাফ বের হলো দেখলাম। গভীর মনোযোগ দিয়ে এম. জি. একটি ছবিকে কাছ থেকে, দূর থেকে চশমা খুলে চশমা পরে নানারকম কসরৎ করে দেখতে লাগলেন। বাকি সবাই বড় বড় চোখ করে সেদিকে তাকিয়ে। বেশ একটা থমথমে, কি হয়, কি হয় ভাব! প্রথম ছবিটি বসন্তবাবুর হাতে পাস-অন করে দ্বিতীয়টি নিয়ে আবার ওই কসরৎ চলল। বসন্তবাবু ছবিটা দেখে আমার দিকে একটু তাকিয়ে আমার পাশে বই পড়া

ভদ্রলোকে ধরিয়ে দিলেন। তিনি সেটি দেখে নিয়ে ঝুঁকে আমায়ও একটু দেখলেন। দ্বিতীয় তৃতীয় ··· এবং ষষ্ঠ বা শেষ ছবিটিও সকলের হাতে ঘুরে গেল। বুণার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ওরও ইচ্ছে ছবি গুলি দেখার। বসন্তবাবু যখন সবগুলি ছবি একত্রিত করে খামে ভরছেন 'বাপি'— খসখসে আহ্লাদে কণ্ঠে, আস্তে উচ্চারণ করল। বুণার 'বাপি' ছবিগুলো ঝুঁকে বুণাকে ধরিয়ে দিলেন। আমিও ব্যাপারখানা কি জানার তাগিদে বুণার দিকে ঝুঁকে পড়লাম। পরপর সব আমার আর বুণার এবং গাড়ীটার ও বাড়ীটার ছবি! ঢুকতেই সেই ক্যামেরা-ম্যান খচ খচ করে যে গুলো নিয়েছিল।

কানে ওদের কথা শুনতে পচ্ছি। 'ফুল মেক- আপ একটা নিয়ে নিন।' এম. জি-র কণ্ঠস্বর। স্কেচ দেখা ভদ্রলোকদ্বয় বললেন, 'তিসরাওয়ালা স্রেফ পুঁথিকা তসবীর যেইসী!' বুণার হাতে ধরা ছবির মধ্যে কোনটার তিসরা নম্বর বুঝলাম না।

লাঞ্চ ব্রেক হলো। পেছনের দিকে দুটো ঘরের দরজায় ইংরাজীতে লেখা এক এবং পাঁচ। মাঝের সংখ্যাগুলো কোনদিকে হবে তাই ভেবে এদিক -ওদিক তাকাচ্ছি, বুণা বলল, 'এদিকে।' পর্দা সরিয়ে এয়ার-কণ্ডিশনড একটা স্বল্প-পরিসর ঘরে ঢুকলাম। টেবল ঘিরে সবাই বসে। আমরা বসতেই খাবার সার্ভ করা হলো।

পাশে বসা বুণাকে জিজ্ঞেস করলাম, ' আমায় কেন ডাকা হয়েছে এবার বলবেন, না সাসপেন্স চলবে?'

ও একটু খাবারটা চিবিয়ে নিয়ে, একটু হেসে, একটু গিলে বলল, —'এখনও বুঝতে পারলেন না? তাহলে আর বুঝবেন না।'

বসন্তকুমার এবার আমাকে নিয়ে পড়লেন।

এখানে কতদিনের কাজ, কলকাতায় ফিরে গিয়ে আবার আসতে হলে কবে নাগাদ পারবো ··· ইত্যাদি।

অবাক হয়ে বললাম, 'আমার, মানে আমায় কি করতে হবে বলুন তো!' আমার কথা বলার ধরণে সবাই, একনাকি গম্ভীর এম. জি শুদ্ধু হেসে উঠলেন! আমি আরও বিস্মিত।

স্কেচ-দেখা ভদ্রলোকের একজন বললেন, 'আপ কভি ষ্টেজ পর কাম কিয়া?'

—'কোন সা কাম?' জিজ্ঞেস করি।

—'এক্টিং?'

—'নন্-নেহি তো?'

—'আপ্‌কো হিন্দী আতি হ্যায় ?'

—'আচ্ছাওয়াল হিন্দী আতা নেহি, যাষ্ট আই ক্যান এক্সপ্রেস মাই-সেল্ফ।' শেষটুকু বিদেশী ভাষার সাহায্য নিতে হয়।

আবার ওরা সব নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। রুণাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের বাড়ীটা খুব সুন্দর কিন্তু ?'

রুণা বড় বড় চোখ মেলে বললো, 'দেখেছেন ?'

—'হ্যাঁ, নীচের তলাটাতো দেখলাম মোটামুটি ...'

—'কোন বাড়ীর কথা বলছেন বলুন তো ! এটা ?' আঙ্গুল দিয়ে টেবিলে নক্‌ করে বলল ! 'দুৎ, এটা তো ষ্টুডিও !'

আমি চুপ করে থাকি।

—'হ্যাঁ এটা নিলামে উঠেছিল, বাপি বছর খানেক হলো কিনে নিয়েছেন।' আস্তে আস্তে নীচু গলায় কথাটা শেষ করে রুণা। আমরা বেশ নিঃশব্দেই খেতে খেতে কথা বলে চলি। ও আবার শুরু করে—

—'আমাদের বাড়ী তো অনেক দূর এখান থেকে, মেরিন ড্রাইভে।'

—'মেরিন ড্রাইভ ? সেটা কোথায় ?'

—'আপনি বোম্বের কিছু চেনেন না ?'

—'না, এই প্রথম আসছি তো। কারিস্তয় রোড্‌ ছাড়া বোধহয় আর কোন রাস্তার নাম জানি না। আর নাম শুনেছি জুহু বীচের, দেখিনি'

—'ও: জুহু বীচ ঠিক জানা আছে ?' একটু বিদ্রূপ করে বলে রুণা। 'ঠিক আছে এ কয়দিন আপনাকে তো এখানে আরও আসতে হবে। কাজের ফাঁকে আপনাকে বোম্বে চিনিয়ে দেব'খন।'

—'এখানকার হাইকোর্ট-টাও চেনাবেন।'

—'কেন ? হাইকোর্টে আবার কি কাজ ?'

—'কাজ নেই কিছু—বাঙালকে নাকি হাইকোর্ট দেখালে কি একটা পুণ্য হয় ?' আমার কথার ধরনে ও একটু জোরেই হেসে ফেলে। চারদিকে তাকিয়ে জিভ্‌ কাটে ছোট্ট করে। বাবার আদরে মানুষ হলেও, বাবার সামনে খুব ডিসিপ্লিনড রুণা।

—'আমাকে এখানে আরও আসতে হবে কেন ?'

—'পরীক্ষা দিতে।' ছোট্ট জবাব রুণার।

—কাল তুমি একবার আসতে পারবে তো চৌধুরী ?' বসন্তকুমার আমায় 'তুমি' সম্বোধন করলেন !

—'কাল, হ্যাঁ পারি, কিন্তু কিসের জন্য বলছেন না তো !' আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছে। রুণা মুখ গুঁজে হাসছে। এম. জি-র চোখেও কৌতুক !

—'আমাকে দিয়ে কাজটা কি আপনার ?' একটু গম্ভীর হয়েই প্রশ্ন করি।

—'সে কি ! তোমায় বলা হয়নি নাকি ?' রুণার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমরা একটা ফিল্ম করছি। এটা—' হাতটা তোয়ালেতে মুছতে মুছতে বললেন, 'একটা নতুন ধরনের এক্স্‌পেরিমেন্ট্ বলতে পারো।'

খাওয়া হয়ে গেছে সবাইকার। চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াই সবাই। বসন্তবাবু বলছেন, 'ম্যামি সম্পর্কে তোমার নিশ্চয়ই ধারণা আছে !'

—'মিউজিয়ামে দেখেছি,…তাছাড়া ম্যামি নামে একটা সিনেমাও দেখেছি।' জানাই তাঁকে।

—'দ্যা ম্যামি দেখেছ ? ভেরি গুড্ ! ওই ধাঁচেরই একটা বই করছি আমরা, অবশ্য অন্য ঘটনা নিয়ে। এবং নজর রাখছি যাতে ওই বই-এর প্রভাব কিছু এসে না পড়ে।'

—'!!।' আমায় কোথায় দরকার এখনও বোঝা গেল না।

—'টোটেন্‌খামেন্ নামটা শুনেছ কখনও ?' সেই প্রথম ঘরটাতে ঢুকে যে যার জায়গায় বসে পড়ি। এম জি. এবারে চেয়ারেই বসেন। তবে আমি এবার একদম বাঁদিকে, যেখানে বই-পড়া ভদ্রলোক বসেছিলেন।

বলি, 'হঁ্যা, কোথায় পড়েছিলাম মিশরের রাজা। খুব কম বয়সেই, যতটা মনে পড়ছে সতের বছর বয়সেই মারা যায়। তার ম্যামিটা…'

—'বাঃ, বাঃ তুমি তো অনেক খবর রাখো।' আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন বসন্তকুমার—'কাজ তো অনেক এগিয়ে আছে তাহলে।'

না বুঝে বললাম, 'তা, আমাকে কি করতে হবে ?'

—'এ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই রোলটা তুমি কাস্টিং করছো।' ধীর সংযতভাবে, একটা নিশ্চিন্ত স্বরে কথাটা শেষ করলেন বসন্তবাবু।

—'!' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আমাকে সিনেমায় নামাতে চাচ্ছেন ?'

—'হ্যাঁ। তোমার চিন্তা নেই। তুমি চেহারাতেই আদ্ধেক মেরে দিয়েছ। তোমার সামনের বইটার মলাটের 'পরেই একটা ছবি দেখবে' 'টোটেনখামেন্'-এর ম্যামি……তোমার সাথে আশ্চর্যরকম মিল ! নাক, চোখ, ঠোঁট। আমরা একটা আন্‌কন্‌ভেনশনাল নতুন মুখ খুঁজছিলাম—তোমাকে হঠাৎ-ই পাওয়া গেল।' বসন্তবাবুর কথা শুনতে শুনতে টেবিলের ওপর রাখা ইটালিক্সে টাইটেল্ লেখা বইটা ভাল করে চোখে পড়ল—'টোটেন্‌খামেন্স এপিসোড্।' দূর থেকে যেটাকে আমি স্টেট্‌স্‌ম্যান্‌স্ এডিটর পড়ছিলাম। অজান্তেই মলাটটা ওল্টালাম। ভায়োলেট কালারের ফোটো। সিংহাসনে

৯

বসা একটা বালকের মূর্তি। আমার সাথে সিমিলারিটি? কই না তো!

—'অবশ্য ক্রেডিট্ গোজ্ টু রুণা।' আদর করে মেয়ের দিকে তাকালেন। 'শী হ্যাজ্ হেল্প্ড্ আস্ দ্য মোস্ট, বাই ফাইণ্ডিং ইউ এট্ দ্য রাইট্ মোমেন্ট্।'

—'কিন্তু! অভিনয়…'

আমায় কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বলে ওঠেন বসন্তকুমার, —'ও তোমাকে ভাবতে হবে না, তোমার কাছ থেকে অভিনয় বের করে নিয়ে আসবেন ইনি।' হাত দিয়ে সম্ভ্রম সহকারে এম্. জি-কে দেখালেন।

—'না। তা বলছি না। অভিনয় করা, মানে সিনেমায় অভিনয় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

—'তাজ্জব্ কী বাত্!' স্কেচ্-দেখা ভদ্রলোক একজন বললেন।

—'কেন? কী অসুবিধে বল তো? কলকাতা থেকে আসতে অসুবিধে হবে?' বসন্তকুমার জানতে চাইলেন।

—'না, তাছাড়াও অফিস থেকে এত টাইম দেবে না।' দ্বিধা নিয়ে বলি।

—'ভুল করো না। চাকরী করে কী করবে জীবনে! কতটুকু ফিল্ড সেখানে! এই বইটায় তুমি স্যাঙ্গুইন্লী সুপার-হিট্ করবে। অনেক কন্ট্রাক্ট্ পাবে…'

—'?' আমি কিছুতেই কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।

—'তুমি যদি চাও……' বসন্তকুমার ব্যস্ত হয়ে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন। চারদিকে এম. জি., রুণা শুদ্ধু একটা টেন্স্ এক্স্প্রেশন্ নিয়ে বসে।

'…আমার সাথে একটা দু'এক বছরের এগ্রিমেণ্ট্ হতে পারে। অন্য প্রডিউসারের কন্ট্র্যাক্ট্ নাও যদি পাও, আমি তোমাকে মাসে মাসে একটা ফিক্সড্ এ্যামাউণ্ট্ দিয়ে যাবো। আমার বই-এ তুমি চান্স্ পেতে থাকবেই।' বসন্তবাবুরা কি ধাঁচের মানুষ বুঝলাম না। এই বইটাতেই আমার কি গতি হবে জানেন না-অথচ…। অডিয়েন্স্ নতুন আর্টিস্ট্কে সোনার মুকুট দেবে, না আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, এ কখনও এত আগে থেকে বলা যায়? যাক্গে, আমার অন্য ব্যাপার। গলাটা একটু পরিষ্কার করে, একটু মাথার পেছনটা চুল্কে বললাম, 'আমাকে মাফ্ করবেন, আমার দ্বারা একাজ সত্যি সম্ভব নয়।'

—'কিন্তু, কেন সেটা তো বলবে?'

—'হ্যাঁ…। আমার বাড়ীতে, মানে আমাদের ফ্যামিলির লোকেরা খুব

কন্‌জার্‌ভেটিভ্‌। মানে, আপনি ঠিক বুঝছেন না, এটা হয় না। ওঁরা এটাকে একদম ভাল চোখে দেখবেন না।'

—'তাজ্জব কী বাত্‌।' সেই ভদ্রলোক আবার উচ্চারণ করলেন কথাটা। বললেন, 'ইএ ম্যায় পহ্‌লে শুনা কী কুই আদ্‌মী স্টার নেহী বন্‌না চাতে হে' !!' সবাই কেমন যেন মিইয়ে গেছে। আমারও খুব খারাপ লাগছে ঠিক-ই। রুণার দিকে তাকালাম ঝন্টুকে। রুণার কেমন অপ্রস্তুত ভাব। ওর অবস্থাটাও 'বাপি'-র কাছে খুব-ই ডেলিকেট্‌ সন্দেহ নেই।

এম. জি ও বসন্তকুমার কি একটা আলোচনা করে নিলেন। বসন্ত কুমার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন্‌ 'এটা কোন কথাই নয়। বাড়ীতে বোঝাতে হবে···তাছাড়া টাকার দরকার নেই কার? নতুন আর্টিষ্টকে বোম্বেতে কেউ যা দেয় না আমি তাই অফার্‌ রাখছি তোমার কাছে।' বসন্তকুমারের মুখ ডিটার্মিন্‌ড্‌! 'দু'লাখ টাকা দেব তোমাকে।'

—'না, দেখুন, টাকাটা ফ্যাটর নয় এখানে, আপনাকে তো বললাম···'

—'তিন? মাই লাস্ট্‌ ডিল্‌ বিফোর ইউ?' বসন্তকুমারকে কেমন ভিলেন মনে হচ্ছে আমার। কেমন যেন টাকা দিয়ে সব কিনে ফেলতে চাইছেন ভদ্রলোক। মান, সম্ভ্রম সব। খুবই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি!

এম জি. এইবার বললেন, 'একটা জিনিষ বুঝুন। আপনার সাহায্যটা আমাদের খু-ব-ই দরকার। অন্য অনেক বক্স-আর্টিষ্ট্‌ দিয়েই অন্য যে কেউ এ রিক্স্‌ নিতো। কিন্তু। আপনার মুখের এক্সপ্রেশন্‌টা—একজ্যাক্ট্‌লি···।'

—'ম্যামির মতন!' হেসে কথাটা আমিই শেষ করে, পরিস্থিতিটা একটু লঘু করি।

—'কত টাকা হলে তুমি এ কাজটা করতে পার চৌধুরী?' বসন্ত কুমার এবার আবার লোভ দেখাতে শুরু করলেন। খুব খারাপ লাগছে অবস্থাটা। তবুও এ টপিক বন্ধ করার জন্যই বললাম, ফিল্মের পুরো বাজেটটা আমাকে দিলেও আমার পক্ষে সত্যিই সম্ভব নয়।'

আসলে কলকাতার একটা ওষুধ কোম্পানীর জুনিয়র মোস্ট এগ্‌জি-কিউটিভ্‌ হয়ে তিনলাখ টাকার একটা দাঁও রিফিউজ করে বেশ একটা মেজাজ এসে গিয়েছিল শিরদাঁড়ায়। কাস্টোডিয়ান্‌ বাবাকে কত টাকা এক্সগ্র্যাসিয়া-পেমেণ্ট করবে জানি না। এমন কি সো-কজ নোটিশের পর কেসটা আবার রিভাইভ করা যাবে কিনা তারও ক্ষীণ আশা। তথাপি একটা পারিবারিক অর্থহীন সম্মানের কথা ভেবেই, সাধা লক্ষ্মী পায়ে—না, না, দুহাত জোড় করেই ঠেলে দিলাম।

সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ। 'আমি তাহলে উঠি!' হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, 'আমি সত্যিই দুঃখিত…'

—'আরে না, না, কি আশ্চর্য…' বসন্তবাবু আবার স্বাভাবিক হয়ে গেলেন অকস্মাৎ! 'ও ঠিক আছে আরেকজন যোগাড় হয়ে যাবে।…তুমি এসো মাঝে মাঝে সময় পেলে—আর শনিবার তো নিশ্চয়ই দেখা হচ্ছে?' বসন্তকুমার অবস্থাটা ঠিক করে নিয়ে এলেন জোড়াতালি দিয়ে।

—'ট্যাক্সি একটা পেয়ে যাবো নিশ্চয়।' বলে রুণার দিকে তাকিয়ে দরজার দিকে এগোই।

—'না, আমি পৌঁছে দিচ্ছি,' চট্ করে উঠে পড়ে রুণা, অপ্রস্তুত অবস্থাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে।

২১

বাইরে আসতেই সেই ক্যামেরা-হাতে ছেলেটি ছুটে এসে একটা ফোটোগ্রাফ আমাকে দেখিয়ে বলল, 'এটা দারুণ এসেছে, এন্‌লার্জ করে দিই?' আগের গাড়ীটা ছেড়ে দিয়ে, অন্য একটা গাড়ী বের করে নিল রুণা। গাড়ীর দরজা খুলে ভেতরে বসে ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আমার গাড়ী থেকে নাবার দৃশ্য অবাক জুলু জুলু দৃষ্টিতে ক্যামেরাম্যান্‌কে দেখছি হাঁ করে। একটু হেসে দরজাটা বন্ধ করে বললাম, 'অনেক ধন্যবাদ, এটাকে দয়া করে এনলার্জ্‌ করবেন না। এখনো ছবির ভেতর আছে। বড় করলে লাফ্ দিয়ে ওই গাছে উঠবে।' রুণা হাসছে। গাড়ীতে স্টার্ট্ দিয়ে ব্যাক্ করছে ধীরে ধীরে।

—'কি যে বলেন স্যার…।' হাত নেড়ে নিষেধ করতে করতে, গাড়ীটা বাইরে এসে গেল, ছেলেটিকে নিউটার জেওয়ারে রেখে!

—আপনাকে দাদার পৌঁছে দেব, না কি ভি টি?' রুণা ভারী গলায় বলে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ স্টেশনেই নামাবেন আমায়। ট্রেণে চলে যাই।'

রুণা একটু স্পীড্ বাড়িয়ে বলল, 'আপনাকে তাহলে কাল-পরশু বোম্বে দেখাচ্ছি?'

—'আপনার অসুবিধে হবে তো? ওদিকে আবার রাধা না ভিক্টর কে যেন আমাকে বোম্বে দেখাবে ঠিক আছে কিন্তু!'

—'এ্যা; তাই নাকি? তাহলে বরং ওদের সাথেই বের হোন। সবাই মিলে হৈ-চৈ করে দেখবেন। আমার সাথে হয়তো ভালো-ও লাগতো না।'

—'আরে ভাল লাগা-লাগির কি আছে তা নয়—'

—'তাই।' রুণা বলে। 'আফ্‌টার অল্‌ উই আর ফিল্ম এসোসিয়েটস।'

—'তাতে কি হলো, এই যাঃ, আপনি খুব সেণ্টিমেন্টাল্‌। ফিল্মে নামা আর ফিল্মের লোকেদের সাথে থাকা কি এক—তাছাড়া আপনি তো আর অভিনয় করেন না!' রুণা চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। আমি অবস্থাটা ভেবে নিই। হঠাৎ বলে ফেলি, আপনার একটা গান শোনান না?'

—'এখানে? নাঃ। আরেকদিন আমাদের বাড়ীতে আসবেন, শোনাব। আপনি আমার কোন ডিস্ক শুনেছেন?' রুণা প্রশ্ন করে।

আমি বলি, 'হ্যাঁ, একটা শুনেছি…'

হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে ওঠে ও, 'কোনটা বলুন তো? মুজিবর মুজিবর তুমি যে আমার ?…?'

—'না এটা আবার গান হয়েছে নাকি? আমি যেটা শুনেছি, সেটা একটা, ইংরাজী গান আছে না সামারওয়াইন—?'

'—হ্যাঁ! ভাল লেগেছে।'

—'হ্যাঁ। বাংলা কথায় ইংরাজী বীটে মিশিয়ে দেয়াটা বেশ।' ও খুশী হয়ে শুনে নেয় আমার কথাটা। মিষ্টি মিষ্টি হাসে।

ভি টি-র সামনে গাড়ীটা দাঁড় করিয়েই বলে, দাদারে কিন্তু পৌঁছে দিতে পারতাম।' শান্তিপুরী ভদ্রতা।

—'না, কি দরকার—আমি চলে যাব।'

—'আপনি নতুন তো এখানে, তাই—। দেখবেন আবার ভুল ট্রেনে উঠবেন না…' ট্রাফিক্‌ পুলিশ বাঁশি বাজিয়ে এ্যাটেনশন্‌ ড্র করছে রুণার। —'পৌঁছে সংবাদ দেবেন।' বলেই নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে স্পীড দিল। আস্তে বাঁয়ে সাদা ফিয়াট্‌টা টার্ণ নিয়ে নিল।

২২

এখন বিকেল তিনটে পাঁচ। তবুও বেশ ভীড় ট্রেনে। ঝুলন্ত রড্‌ ধরে দাঁড়িয়েই আছি। পরের ট্রেনে বসে আসা যেত। তবুও চলেই এলাম। বেশ ক্লান্ত লাগছে। একটু শোবার জায়গা পেলে এক্ষুণি শুয়ে পড়তাম।

ট্রেনের আকৃতি-প্রকৃতি কলকাতার মতই, শুধু একটু চক্‌চকে। এবং সীটগুলো 'জাতীয়-সম্পত্তি' বলে কেউ তার নিজের অংশটি তুলে নিয়ে

যায় নি ! জ্বলন্ত হাতালগুলোও যথাস্থানেই জ্বলছে, পাখা আর বাল্‌ব্‌-এর মতন। ভিড় কলকাতার মতই। স্পীড্‌ কি একটু বেশী! এখানকার সবাই কি একটু ফাস্ট লাইফ্‌ লীড্‌ করে!

জীবনের আবর্তে ঘুরতে ঘুরতে কে কোথায় ছিটকে পড়ে, কাকে যে কোথায় এনে ফেলে ; আড়াল থেকে কাণ্ডটি ঘটিয়ে কে যে মজা দেখে—এ নিয়ে ভাবতে গেলেই মাথা খারাপ হবার যো।

অনেক ভিড়ের সাথে বেরিয়ে এলাম। হয়তো মান্থ্‌লি আছে ভেবে, চেকারবাবু টিকিট চাইল না। আমারও পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়ে খচ্‌ করে মনে হলো হাতের ফাইল্‌টা গাড়ীতেই ফেলে এসেছি। বুণার গাড়ীতেই—সীটের ওপর পড়ে আছে সেটা! কালকেই ওটা দরকার নেই যদিও, সত্যি কথা বলতে কি, আগামী সোমবার বেলা দুটোর আগে ওটার কোন প্রয়োজনই নেই, তবুও মনটা ভীষণ দমে গেল। যদি বুণা খেয়াল না করে… ! খুব অন্যমনস্ক ভাবেই স্টেশনের বাইরে এলাম। কাজটা খুব-ই বিশ্রী হলো।

অটো-রিক্সার ডাকে সাড়া না দিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিলাম। মিটার ডাউন করার টুং-টাং আওয়াজের সাথে দেহটাকে সীটের ওপর ছেড়ে দিলাম। একটু যাবার পরই ট্যাক্সি-ড্রাইভারের ডাকে বর্তমানে ফিরে এসে, পকেট থেকে মিঃ তালুকদার-এর দেয়া কার্ডটা ওর হাতে ধরিয়ে দিলাম। পাঞ্জাবী ইয়ং-ম্যান ঠিকানাটা পড়ে নিয়ে ওটা আবার আমাকে ফেরৎ দিল। দেবার সময় আমাকে একঝলক খুঁটিয়ে দেখেও নিল।

প্রথমদিনের তুলনায় অন্তত দশ মিনিট দেরীতে বাগানের ভেতর ঢুকল ট্যাক্সিটা। নতুন বুঝে এদিক-সেদিক ঘুরিয়েছে সন্দেহ নেই। ভেতর থেকে কাউকে ডেকে এর সমাধান করা যেত—বোকা বনে, সেটা আবার আণ্ডারলাইন করতে লজ্জাবোধ হলো। টাকাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। কুকুর তিনটে দৌড়ে এলো। খুব একটা চেঁচাল না। এ ক'দিনের পরিচয়েই বাড়ীর লোক হিসেবেই ধরে নিয়েছে! দরজায় নক্‌ করতে গিয়ে কলিং বেলের সুইচটা চোখে পড়ল। দরজাটা ভেজানো ছিল, ছুঁতেই ফাঁক হয়ে গেল। কেউ আসার আগেই, ভেতর থেকে ভেজিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে নিজের ঘরে পৌঁছে গেলাম।

ঘরের দরজাটা বন্ধ করে জামাকাপড় পাল্টে, চোখে-মুখে একটু জল দিয়ে বিছানায় ছুঁড়ে দিলাম শরীরটা। কিছু ছেঁড়া-ছেঁড়া কথা ভাবতে ভাবতে বেশ ঘুমিয়ে পড়লাম।

২৩

দরজায় কেউ দুম্ দুম্ করে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙাল। ঘরটা অন্ধকার। আরেকবার শব্দটা শুনে নিয়ে, উঠে লাইট জ্বেলে দরজাটা খুলে দেখি চা হাতে বন্দনা। চোখে চোখে তাকিয়ে হাসছে। পাশে সরে গিয়ে ওর আসায় জায়গা করে দিয়ে, বাথরুম থেকে ঘুরে এসে চা-টা নিয়ে বিছানায় বসলাম। বন্দনা জানাল টায়ার্ড ছিলাম বলে কেউ আমাকে ডিস্টার্ব করে নি। এখন ওষুধ খাবার টাইম হয়ে গেছে বলেই—ডেকে দিল।

—'আর সবাই কোথায় ?'

—'ও ঘরে। আপনার কথাই হচ্ছে।'

—'কি কথা ?' জিজ্ঞেস করি।

—'বসন্তকাকুর ফোন এসেছিল।'

—'ও খবর এর মধ্যেই পৌঁছে গেছে ?' হাসতে হাসতে বলি।

—'হ্যাঁ, বাবা বলেছেন আপনি ঠিকই করেছেন—।'

—'কেন ?'

—'আপনার কাছ থেকে নাকি এটাই এক্সপেক্টেড্…'

—'আচ্ছা ? —! চল ও ঘরে যাই…' বলে উঠতে যাই।

—'বসুন. চা-টা খেয়ে নিন না।' মিষ্টি করে বলে বন্দনা।

ক্যাপ্‌সুলটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'চা দিয়ে গিলতে পারবেন ?'

এসব অসুবিধে হয় না আমার।

—'রুণাকে কেমন লাগল ?' ভাষা ভাষা প্রশ্ন, অন্যদিকে তাকিয়ে।

—'ভাল তো—ও খুব ওর বাবার কাছে ফ্লপড্ হয়েছে।' আমি বন্দনার দিকে তাকিয়ে বলি।

—'রুণার ফোন্ এসেছিল—'

—'তাই না কি কখন ? কী বলল ? আমার—'

—'বাব্বাঃ এত উতলা হওয়া ভালো ?' ধীরে প্রশ্ন করে বন্দনা। বলে, 'আপনাকে নাবিয়েই কিছুটা গিয়েই আবার ফিরে এসেছিল।'

—'মানে ? আমায় তো এখানেও নাবায় নি ! আমি তো ট্রেনে এলাম !'

বন্দনা খানিকক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল। কি যেন পড়বার চেষ্টা করল। তারপর দাঁড়িয়ে আমার হাত থেকে খালি কাপটা নিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, 'ও ঘরে যান, সবাই বসে আছে।' খুব গম্ভীর চালচলন !

বসার ঘরে ঢুকতেই প্রথম এ্যাড্‌জেক্‌টিভ পেলাম ভিক্টরের কাছ থেকে —'এ্যাইসা ওয়ার্থলেস্ নাদান, ম্যায়নে কভি নেহি দেখা !'

বললাম, 'আই এ্যাক্সেপ্ট ইয়োর কম্‌প্লিমেণ্ট, স্যার্‌ !' বসে পড়ে মাসীমার (এ্যালোপ্যাথ) দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমায় কোথায় পাঠিয়েছিলেন মাসীমা ! ওঃ সে একটা দারুণ ব্যূহ। তাতে ঢোকা যায়, বের হওয়ার মন্ত্র জানা ছিল না।' আমার কথা শুনে মিঃ তালুকদার বললেন, 'বাঃ খুব সুন্দর বলেছো কথাটা। ব্যূহ ! সত্যই তাই। ফিল্ম ওয়াল্ড একটা অন্য জগৎ। বড্ড আন্‌সার্টেন লাইফ।' টুকরো টুকরো কথা ক'টা উচ্চারণ করেন শিল্পী-সদৃশ মিঃ তালুকদার।

—'বসন্তবাবু ফোনে প্রায় চীৎকার করছিলেন ! বলছিলেন, এইসব কনজার্ভেটিভ ছেলেদের ভবিষ্যৎ কি মশাই ?' মাসীমা (হোমিওপ্যাথ) জানালেন হাসতে হাসতে।

রাধা এতক্ষণ কথা বলে নি। মনোযোগ দিয়ে ড্রয়িং-রুমের মজাটা উপভোগ করছিল।

—'তুমি একটা রেকর্ড করলে যা হোক।' রাধা জানায়। 'স্টার হবার সুযোগ ছেড়ে দেয়া চারটিখানি কথা নয়।' হাসতে হাসতে পাশে বসা রাধার কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা-স্বরে বলি, 'তাহলে নজরে একটু উঠল ?'

ও খুব জোরেই হেসে ওঠে। আর সবাই ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে একটু তাকিয়ে থাকেন !

—'ফাইলটা দিয়ে গেছে রুণা ?' সবাইকার উদ্দেশ্যেই কথাটা পরিবেশন করা।

—'হ্যাঁ, ওই যে রেডিওটার ওপর।' বলেন পি. বি.। 'তোমার এনিমি-প্রপার্টির সাথে কি সম্পর্ক বলতো।' বুঝলাম ফাইলের ওপর লেখা কথাটা পড়েছেন উনি।

একটু হেসে বলি, 'আমরা কোন একটা দেশের শত্রু। তাই আমাদের সম্পত্তিটা শত্রুর সম্পত্তি।' সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় কথাটা পেশ করি।

—'তুমি আবার কোন দেশের শত্রু' অবাক হন পি. বি।

—'না, আমি বা আমরা কোন শত্রুতা করিনি। তবুও আইনের চোখে শত্রু হিসেবেই অভিহিত করা হয় আমাদেরকে।'

—'একটু ক্লিয়ারলী বলত, কী হলো ব্যাপারটা।' এবার মিঃ তালুকদার ইনটারেস্টেড হয়ে পড়েন। এপাশ ওপাশ তাকিয়ে দেখলাম, নতুন ব্যাপারটা, সবাই উৎসুক হয়ে রয়েছে, শোনার জন্য।

বললাম, এটা ফাস্ট ওয়াল্ড-ওয়ার-এর পর থেকেই চালু। দুটো দেশে যুদ্ধ হলে বা যুদ্ধের আগে বা পরে দেশটা ভাগাভাগি হলে, কিছু লোক

তাদের বাড়ী-ঘর-দোর ব্যবসা, ছেড়ে দিয়ে নিজের সুবিধে মত পার্ট-এ চলে গিয়ে বসবাস করে। তাদের একদিকে ফেলে আসা সম্পত্তিটা তখন শত্রুর সম্পত্তি হিসাবে গভরমেণ্ট ডিক্লেয়ার করে দিতে পারে। অন্যদিকেও তাই।'

—'বুঝলাম না, আবার বলত!' পি. বি. বললেন।

হেসে বলি, 'যেমন ধরুন, পাকিস্তান, হিন্দুস্থান, দুটো ভাগ করা হলো ভারতকে। তখনই ব্যাপারটা হতে পারত। কিন্তু, তা না করে ব্যাপারটা হলো আয়ুব খাঁ-র রেজিমে। সিকিউরিটিফাইভের ওয়ার ডিক্লেয়ার করে, ফিল্ড্ মার্শাল আয়ুব খাঁ নন্-রেসিডেণ্ট্ মাইনরীটির প্রপার্টিগুলো এনিমি প্রপার্টি হিসেবে গেজেটে নোটিফিকেশন করলেন। নন্-রেসিডেণ্ট্ মাইনরীটি মুসলমানদের প্রপার্টিও-সাইমাল্টেনিয়াস্লী ইণ্ডিয়াতে ওই ভাবে চিহ্নিত করা হ'লো।'

—'বেশ, তারপর?' পি. বি. বললেন।

—'এবার দু'দেশেই একজন করে কাষ্টোডিয়ান্-এর হাতে এই সম্পত্তি-গুলির ভার অর্পণ করা হলো। পাকিস্তানে—'কাষ্টোডিয়ান্ অব্ এনিমি-প্রপার্টি ফর ইণ্ডিয়া' এবং ভারতে—'ফর্ পাকিস্তান'। অর্থাৎ এরা ফেলে যাওয়া প্রপার্টিগুলোর তত্ত্বাবধান করবেন; রেণ্ট্ বা অন্যসূত্রে টাকা কালেক্ট্ করে জমা দেবেন গভরমেণ্টের ঘরে, ব্যাঙ্কে।'

—'বুঝলাম।' মিঃ তালুকদার বুঝলেন। সবাই শুনছে মনোযোগ দিয়ে।

—'এরপর ঘটনাটা দিয়েই বলি। আমার বলতে সুবিধে হবে ব্যাপারটা। তাস্খন্দ্ চুক্তি হলো, আয়ুব খাঁ আর আমাদের লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সাথে। তার ভেতর একটা চুক্তি হচ্ছে, এই এনিমি-প্রপার্টির টাকাটা দু'দেশেই বাস্তু-ত্যাগীদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ ভারত থেকে ঘরবাড়ী ছেড়ে পাকিস্তানে যারা গেছে, তাদেরকে—পাকিস্তান থেকে যে হিন্দুরা সব ফেলে চলে এসেছে সেই সম্পত্তি থেকে পাওয়া টাকা, যেটা কাষ্টোডিয়ান্ জমা করে রাখছে—সেটা ভাগ করে দেয়া হবে। তেমনি আবার—'

—'বাবাঃ এ তো দারুন কম্প্লিকেটেড্ দেখছি!' মিঃ তালুকদার বড় বড় চোখ করে বলেন।

বলি, 'না মেসোমশাই কমপ্লিকেটেড্ এখনও হয়নি—এরপর শুনুন—'

—'এর-ও পর আছে?' ভিক্টর ব্যঙ্গ করে, 'তব্ তিন্ঠো ইণ্টারমিশনমে ভি ইএ ফিল্ম্ খতম্ নেহি হোগি!' রাধা ও মাসীমাদ্বয় হাসতে হাসতে ওকে থামতে বলেন। ওদের জানার আগ্রহ দেখে আমিও অবাক! কণ্টিনিউ করি, 'এই ভাগ করে দেয়ার ভারটা পড়ে আবার নতুন অফিসে। ভারতে—'কাষ্টোডিয়ান অব্ এনিমি-প্রপার্টি ফর্ ইণ্ডিয়া' এবং পাকিস্তানে একই, তবে—'ফর্ পাকিস্তান'।'

১০

—'! ! !'

—'এবার এই কাস্টোডিয়ান এড্ভার্টাইজ করল নিউজপেপারগুলোতে। একটা লাস্ট্ ডেট্ অব্ সাব্মিটিং ক্লেইম্-ও ঘোষণা করে দিল। ফিফ্টিন্থ্ জুলাই অব্ সেভেণ্টি-ওয়ান্।' আর একটু চা পেতে পারি ?' রাধার দিকে তাকিয়ে বলি। বন্দনার মাসীমা চেঁচিয়ে ছোকরাটাকে ডেকে এক রাউণ্ড্ চা সার্ভ করার নির্দেশ দেন। 'বেচারী বক্তৃতা দিতে, হাঁফিয়ে গেছে।' রাধা সুযোগ বুঝে আমাকে একটু ঠুকে দেয়। হেসে বলি, 'তা নয়, ওটা পারিশ্রমিক।' আবার নিজের কথায় ফিরে যাই।

- 'পাঞ্জাবকে সবার আগে ঢেলে সাজানো হ'লো। ক্লেইম্ সাব্মিট্ করা হয় প্রথমে একটা ফর্মে, পরে এ্যাফিড্যাভিট্ করে আবার সাব্মিট্ করতে হবে। সেই সাথে দু'জন উইট্নেস্-এর ডিক্লেয়ারেশন্-ও নেওয়া হয়। এই এ্যাফিড্যাফিট্-এর একটা বয়ানের প্রোফর্মা পাঠানো হয়। বয়ানটাতে স্পষ্ট বলিয়ে নেয়া আছে, '...পাকিস্তান গভরমেণ্ট্ আমাকে কোন ডকুমেন্ট নিয়ে আসতে দেয় নি... অথচ জানেন, বাংলার বেলায় প্রতিটি আইটেমের মালিকানা সত্ত্ব প্রমাণ করার দরকার হয়ে পড়ল !'

—'কেন ? পাঞ্জাবের বেলায় রেকর্ড অব্ রাইট্ দেখাতে হয়নি !' মি: সিংহী জানতে চান।

—'কেন হবে বলুন ! বয়ানটাতে তো বলা আছেই, ডকুমেণ্ট্ আনতে পারিনি। ক্লেইম-এর এ্যাফিড্যাভিট্-এর ওপরেই অ্যাড্হক্ পেমেণ্ট্ দিয়েছে। তাছাড়া... !' আমার কথায় বাধা দিয়ে মিঃ তালুকদার বললেন, 'তোমার কথা কন্ট্রাডিক্টরী হচ্ছে রাজা ! এই বলছ ডকুমেন্ট্ দরকার নেই, আর সেভাবেই পেমেন্ট্ হয়েছে, আবার বলছ 'রেকর্ড অব্ রাইট্ দরকার...।'

—'আমি কন্ট্রাডিক্শন্ করছি না মেসোমশাই, করছে এই ডিপার্টমেণ্ট অথবা গভরমেণ্ট্ স্বয়ং।'

—'কেন ?' মিঃ তালুকদার আবার প্রশ্ন করেন, 'এই ডাব্ল্ ফেস্-এর কারণ ?'

বলি, 'দুটো কারণ হ'তে পারে। এক—সেন্টার ইজ্ ডমিনেটেড্ বাই দ্য পাঞ্জাবীজ্ এবং একটা পাঞ্জাব রেজিমেন্ট্ আছে, তাদেরকে খুশী রাখা বা তাদের চাপ মেনে নেওয়াটাই স্বাভাবিক '

—'দুই !?'

—'দুই।—বাংলাকে দেয়াটা, একটা দয়া-ভিক্ষা, ও যখন খুশী দিলেই হলো। এটা তো সর্বজনবিদিত বাঙালীদের হ'য়ে কেউ বলবে না। এবং বঞ্চিত থেকে থেকে, খুব গোঁসা করে—'আমাদের দিল না, আমাদের জন্য করল

না' এইসব কান্নকাটি, ঘ্যানর ঘ্যানর চলবে। তারপর যদি বা ঠেলে ঠুলে ব্যাপারটা শুরু করা গেল—তো অপজিশন্ বেঞ্চের জনৈক শৌখিন বাঙালী এবং মস্কো বিশ্বাসী তাতে বাগড়া দিয়ে দিলেন। বাগড়া না দিলে, ব্যাপারটা মিটে গেলে—তার পেছনে দাঁড়াবার, দোহার দেবার, এবং পাঁচ বছর অন্তর অন্তর তাঁকে ভোট দিয়ে রিটার্ণ করার কেউ থাকে না যে?'

আমার কথার ধরণে একটা হাসির ঢেউ ওঠে। আর তারই মধ্যে চা এবং বন্দনার প্রবেশ। চায়ের কাপগুলো যার যার হাতে ধরিয়ে দিয়ে দুগ্ধপোষ্য বয়টি চলে যায়। বন্দনা অনেকক্ষণ ছিল না, সেটা ওকে দেখেই মনে হ'লো। ভিক্টরের পাশে, ঘরের আবহাওয়াটা নষ্ট করে দিয়ে গম্ভীর হয়ে বসল সে। বার কয়েক চায়ে চুমুক দিয়ে মিঃ পি বি বললেন, বেশ চিন্তিত ভাবেই, 'তুমি না সেদিন বললে, তোমাদের প্রপার্টি ফিফ্‌টিটুতে এ্যাকোয়ার্ড হয়ে গেছে।'

—'হ্যাঁ। তাই তো।' কোথায় কথাটার লিঙ্ক্ খুঁজে পেলাম না।'

পি বি বললেন, 'জমিদাবী এ্যাকোয়ার্ড হয়ে গেলে, তার আর সিক্সটি-ফাইভে ক্লেইম্ কি করে হয়। মানে পার্টিকুলারলী তোমার কেসে, হাও ইউ কাম্ ইন্টু দ্য পিক্‌চার?'

—'জমিদারী চলে গেলেও অনেক কিছুই থাকে যেগুলো এ্যাকোয়ার্ড হয় না।' আমি বলি।

—'বাড়ী-ঘরের কথা বলছ?'

—'শুধু বাড়ী-ঘর কেন, হোম্‌স্টেড ল্যাণ্ড্, কিছু এগ্রিকাল্‌চারাল্ ল্যাণ্ড, হাট-বাজার, কাছারী, এমনি অনেক কিছুই থাকতে পারে। তাছাড়া জমিদারীর কম্‌পেন্‌সেশনটাও তো ক্লেইমেব্‌ল্।'

—'তাই বল।' নিশ্চিন্ত হন পি বি.। সবাইকার একটা কেমন চাউনী আমাকে বেঁধাচ্ছে! বন্দনার স্নেহবৎসল মা, আমার প্রশংসায় উদ্বেল হয়ে ওঠেন! 'কত জানে...' ইত্যাদি।

বলি, 'এসব জমিদারী কথাবার্তা আমার জানার কথা নয়। কিন্তু আমার পরিচিত আত্মীয়-স্বজন, যাঁরা আগেই ক্লেইম্ ফাইল করেছেন, তাঁদের বিশেষ সাহায্যে এগুলো জানতে পেরেছি। এঁরা না বললে আমার পক্ষে এগোনো হয়তো হয়ে উঠতো কিনা সন্দেহ।'

—'এখানে অফিসে তাহলে কি করতে এসেছ?' বন্দনার মা জানতে চান।

—'বাবা খুব দেরীতে ক্লেইম্ করেছিলেন—লাষ্ট্ ডেট্ এক্সপায়ার করার অনেক পর। তাও আবার আমার মাতুলের বিশেষ অনুরোধে।'

—'কেন ? নিজের ইচ্ছে ছিল না তোমার বাবার !'

—'খুব একটা গুরুত্ব দেন নি বাবা। অনেকেই দেন নি প্রথমে। এখন এই ডিপার্টমেন্ট-এ নাড়াচাড়া পড়ায় চারিদিকে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। টাইম-ও এক্সটেণ্ডেট্ হয়েছে।'

—'এখানকার অফিসের কি কাজ বলছিলে ?' মাসীমা আবার পুরানো কথায় ফিরিয়ে দেন।

—'বাবার কাছে একটা চিঠি এসেছে তাতে বলছে তোমার কেস্ কেন ক্যান্সেল করা হবে না জানাও।'

—'এ্যাঁ !'

—'হ্যাঁ। বোধ হয় কিছু ভুল থাকবে প্রসেসিং-এ। দেখি কাস্টোডিয়ান নেই এখানে। সোমবার কথা বলে এটা ঠিক করাতে হবে। ক্লার্ক একজন অবশ্য অভয় দিল।'

—'হ্যাঁ, ক্যান্সেল করবে এ ইয়ার্কি নাকি ?' মাসীমা সহানুভূতি-প্রবণ হয়ে ওঠেন।

মিঃ পি, বি, নিজের ঘরের দিকে একটা ইঙ্গিত করে তাঁর ভায়রাকে কিছু একটা বুঝিয়ে, উঠে পড়লেন। দেখাদেখি মিঃ তালুকদারও তাঁকে অনুসরণ করলেন। কেমন একটা জঙ্গলপথে বিচরণের আঁচ পাই! রোজ সন্ধ্যায় দরজা বন্ধ করে এই হয়! এঁদের মত বাড়ীতে এরকম গোপন করাটাই বেমানান। হয়তো আমি আছি বলেই— !

২৩

ভিক্টর কাকে ফোন করছে। মাসীমাদ্বয় পুরোনোদিনের নানা কথায় দু'জনে দু'জনের ভুল ধরে যাচ্ছেন। রাধা-বন্দনা নীচু স্বরে কি যেন একটা আলোচনা করছে। তারই ভেতর রুণার নামটাও যেন এক-আধবার শুনলাম। উঠে গিয়ে ফাইলটা রেডিওর ওপর থেকে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছি, দেখি রাধা আর বন্দনাও ওঠে পড়ে আমার সাথে ও ঘর থেকে বেরিয়ে আমার পেছন পেছন আমার ঘরে চলে এল।

আমি ড্রেসিং-টেবিলটায় হেলান দিয়ে টুলে বসলাম। ওরা দু'বোন বিছানায়। এখন শরীরটা বেশ ভালো লাগছে। এখন পুরো সপ্তাহটা কি করি, এটাই একটা অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। ওরা দু'বোন নিজেদের আলোচনা করছে। আমার পার্টিসিপেশন প্রয়োজন নেই। এই সুযোগে সারাদিনের ঘটনাগুলো আবার একটু ভেবে নিচ্ছিলাম আর অবাক হচ্ছিলাম।

রাতের খাওয়ার সময় আমরা চারজন ইয়ং জেনারেশন আগে খেয়ে নিলাম। সাধারণ কথাবার্তা দিয়েই টেবিল ছেড়ে উঠেছি। কাল থেকেই আমি ওদের সাথে বোম্বের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখতে যাবো কিনা, তার কথাও একটু হ'লো। আমি অবশ্য কোন উৎসাহ দেখাইনি। এমনিতেই এদের ঘাড়ে এসে চেপেছি, তার ওপর আবার হুল্লোড় করে গেলে কি ভাববে কে জানে।

২৪

সকাল সাতটা নাগাদ ঘুম ভাঙলো। ঘর আলোয় আলো! তড়াক্ করে ওঠে বাইরের ঘরে যাবার দরজাটার ছিটকিনি খোলা রেখে, বাথরুম্ বন্ধ করলাম। মিনিট কুড়ির মধ্যেই সেভ্-টেভ্ করে; স্নান পর্যন্ত সেরে ফ্রেশ্ হয়ে বসলাম। এতো তাড়াতাড়ি এতগুলো কাজ করতে পেরে নিজে-কেই ধন্যবাদ দিলাম! ঘরে এসে দেখি খাটের পাশে টিপয়ে ধূমায়িত কফি, কেউ রেখে গেছে।

একটু বাদে অবহেলিত বসার ঘরে ততোধিক অবহেলিত নিউজপেপার-খানা তুলে নিয়ে হেড্‌লাইনগুলো দেখছি, ঘরে ঢুকল রাধা। বলল, 'যাবে নাকি আজ, বোম্বে এক্সপ্লোর করে ফেলি চলো।' মুখে ভোরের হাসি। 'রাতে বুঝি কাউকে স্বপ্নে দেখেছো।' আদুরে গলায় কথাটা নিবেদন করি পাশে বসা রাধাকে।

সমস্ত মুখটাকে আরো সুন্দর করে রাধা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'জানি তুমি ইন্টেলিজেন্ট কিন্তু এখানটায় মশাই-এর একটু ভুল হয়ে গেল!' মহিলার কাছে কম্‌প্লিমেন্ট পেতে খারাপ লাগে না।

হঠাৎ বললাম; 'এ্যাব্‌সার্ড! আমার রীডিং কখনও ভুল হয় না।'

সামনে হাত দুটো চিৎ করে বলল 'ফলেন পরিচিয়তে।'

হাতটা একটু দেখেই ছেড়ে দিয়ে ওর প্রশ্নমাখা চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'যদি আমার খুব ভুল না হয়, তার নামের আদ্যাক্ষর 'ক' 'স' অথবা 'অ', এই তিনটির একটি, অথবা যে কোন দুটি।' চোখে চোখে তাকিয়ে কথাটা শেষ করি। চট্ করে ভেতরের দরজাটা দেখে নিল ফ্যাকাসে মুখে।

—'তুমি কি করে বললে!' বিস্ময় ঝরছে কণ্ঠে। 'আরও কিছু বল।' আরেকটু কাছ ঘেঁসে বসে ডান হাতটা আমার চোখের সামনে মেলে ধরল।

—'বিধর্মী?'

—'হ্যাঁ, ক্রিশ্চান।'

—'তিনবছর হ'লো আলাপ ?'

—'একজ্যাক্টলী !'

—'ওকে আর ঘুরিও না। ওখানেই সেট্‌ল কর।' গম্ভীরভাবে সাজেশনটা দিই।

—'মা—!'

—'একটু বাধা থাকবে ও ঠিক হয়ে যাবে। বাড়ীতে বল—' আমরা এত নিবিষ্ট হয়ে কথা বলছিলাম কাছাকাছি বসে, যে কখন বন্দনা ঢুকেছে টের পাইনি।

—'তোমাদের কথা শেষ হলে ব্রেকফাষ্ট্‌ টেবিলে এসো।' কথাটা শেষ করেই বেরিয়ে গেল। আমরা দু'জনেই মুখোমুখি চাইলাম।

—'কি হয়েছে ওর বলত ?' রাধাকে জিজ্ঞেস করি।

—'কাল কি রুণা তোমাকে গাড়ীতে দাদার অবধি লিফট দেয় নি।' কেমন ভাবে যেন কথাটা বলল রাধা।

—'না তো। কি ব্যাপার বলত—কাল বন্দনাও এই কথা নিয়ে—'

—'ও অফেন্স্‌ নিয়েছে। বলছে এই কথাটা গোপন করার কি আছে ? একটু হেসে বলল, 'তোমার ফেরার একটু বাদেই রুণা এসে ফাইলটা দিয়ে গেছে কিনা !—তাই বন্দনা ভেবেছে তোমাকে কাছেই কোথাও নাবিয়ে দিয়ে-'

দুজনেই উঠে খাবার টেবিলের কাছে গিয়ে যে যার সীটের দিকে এগিয়ে যাই। বসতে গিয়েও আবার সরে এসে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াই। মাসীমা বললেন, 'কোথায় যাচ্ছ বস ?'

—'আসছি, এক মিনিট।' কোটের পকেট থেকে হাতড়ে ভি. টি.-দাদাদের টিকিটটা হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে ফিরে আসি নিজের জায়গায়। বন্দনা আগের মতই গম্ভীর এবং নির্বাক। টোষ্টে কামড় দিয়ে একটা বড় সাইজের ওমলেটের পীস্‌ কেটে ফোর্কে বিঁধিয়ে রেডি রাখি হাতে। মুখেরটা গিলেই ওটা গিলবো।

বাইরে সাত-সকালে গাড়ী এসে পার্ক করল একটা ! বাইরের দরজাটা খোলাই আছে। শাড়ী পড়লে রুণাকে এতোটা সুন্দর দেখায় আগে ভাবিনি। অনেক ধীর স্থির আজকে রুণা। ছট্‌ফট্‌ করছে না ! সবাইকার সাথে বসে ব্রেক্‌ফাষ্ট্‌ শেয়ার করল। বন্দনা অস্বাভাবিক ফ্রি ব্যবহার করছে !

রুণা বলল, 'আজকে নাকি তোমরা ও'কে বোম্বে দেখাবে ? তাই গাড়ীটা ফ্রি ছিল, নিয়ে এলাম। সবাই মিলে সারাদিন বাইরে কাটানো যাবে।' বেশ খুশী খুশী পোজে বলে ও।

হঠাৎ সবাইকে চম্‌কে দিয়ে বন্দনা ঘোষণা করে, 'আজকে তো আমরা যাচ্ছি না। তুমি শুধু শুধু কষ্ট করে এতোটা পথ এলে বুণ্‌।' রাধার ও আমার চোখাচোখি হয়।

—'আজকে নয়? যাঃ আমি ভাবলাম—।' বুণা কি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল? কেন?

হঠাৎ একটা দুষ্টু হাসি খেলে গেল রাধার চোখে। কেন?

দুই মাসীমা-ই বলে উঠলেন 'ও গাড়ীটা নিয়ে এলো! যা না আজকেই রাজা বোম্বের কিছুই চেনে না— কদিনে কি-ই বা দেখবে!'

রাধা বলল, 'আমাদের অন্য একটা প্রোগ্রাম্‌ আছে, দাদারেই। ভিকুতো আজকে অফ্‌ হতে পারছে না! তুই বরং রাজাকে নিয়ে যা!'

স্তম্ভিত বন্দনা কিন্তু আর সবাই সাজেশন্‌টার তারিফ করলেন। ভিকু চোখ টিপে বলল, 'জল্‌দী লোট্‌কে আনা, আউর সবকুছ্‌ মাৎ দেখা-না বুণ্‌।' আর আমার দিকে তাকিয়ে একমুখ ডিমভাজা নিয়ে অর্ধ-বোধগম্য ভাষায় বলল, 'বী ওয়্যার অব্‌ হার্‌। জরা হুঁসিয়ার রহনা-হঁা।' বড়রা চুপ। মাঝারীরা হাসছে। আমিও। বুণ্‌-ও। রাধার প্রোগ্রামটা কল্পনা-প্রসূত মনে হয়। আমারও একটা অজুহাত করে কাটিয়ে দেয়া উচিত কিনা, বুঝতে পারছি না। বুণাই সমাধা করে দিল। বলল 'ঠিক আছে, আমি না হয় মোটামুটি টোপোগ্রাফিটা ঘুরিয়ে দিই। তোমরা আবার বাকীটা দেখাবে।' যেন এই দেখানোটা বেশ জরুরী একটা কাজ এমনই ভাব-ভঙ্গী বুণার।

—'তথাস্তু।' বলল রাধা। বন্দনা চুপ! বন্দনা-রাধার আচরনটা বোধগম্য হয় না। বাড়ীতে সারাদিন বসেই বা কি করবো, ভেবে রেডি হয়ে নিলাম।

—'দুপুরে কি বাইরেই খেয়ে নেবে? মাসীমা (এ্যালোপ্যাথ)-র সাজেশান্‌ ভেবে বললাম, 'হঁ্যা।' বুণার দিকে তাকাতেই ও বলল, 'হঁ্যা মাসী, আমি ওঁকে বাইরেই খাইয়ে দেব, ভেব না।'

গাড়ী স্টার্ট্‌ দেবার আগে দুই মাসীমা এবং বান্ধবীদ্বয় বুণাকে বা আমাদের সী-অফ্‌ করতে পোর্টিকোর নীচে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ মনে হতেই পকেট থেকে ট্রেনের টিকিট-টা বন্দনার হাতে অলক্ষ্যে গুঁজে দিয়ে গাড়ীতে চড়ে বসলাম। গাড়ীটা বাঁক নেবার মুখেই চোখে পড়ল বন্দনা, রাধাকে টিকিট্‌টা দিচ্ছে।

—'আলি বের হওয়ায় একটা লাভ হ'লো।' রুণা বলছে, আমি উৎকর্ণ, 'রেশমীদির ফ্ল্যাটে তোমাকে নিয়ে যাই চলো।' রুণা গতকাল আমাকে 'আপনি'-ই বলছিল। আমিও ব্যাপারটা একতরফা হতে দিই নি। অনেকে পারে না, বিশেষ করে সমবয়সী মেয়েরা যেমন বন্দনা আজও পারেনি 'তুমি' বলতে। পাঠক বলুন তো কিসের অস্বস্তি এটা? রাধা কিন্তু পারছে!

বললাম, 'তোমার দিদি?'

—'না, তবে দিদির মতই। আমাকে অসম্ভব ভালবাসে ও। তুমি দেখনি ওর অ্যাক্‌টিং?' রুণা জানতে চায়।

—'সিনেমায়? আমি তো বড় একটা সিনেমায় যাই না।'

—'বাবা, এ্যাড্‌ভার্টাইজ্‌মেন্ট্‌ শট্‌স্‌-এত দেখনি? রেশমী গুল্‌শন্‌, বোম্বের টপ্‌ ক্লাশ গ্ল্যামারদের একজন।' ফিল্ম অভিজ্ঞতা খুব কম আমার ও বলে চলে, 'বাবাই ওকে বোম্বে ফিল্ম্‌ লেন্সে ফোকাস্‌ করেছেন। বাবা খুব ভালবাসেন রেশমীদিকে।' গদগদ হয়ে বলে রুণা। গাড়ী গতকালের রাস্তা ধরে এগোচ্ছে।

—'ফিল্ম্‌ একটা আলাদা জগৎ, তাই না?' রুণার দিকে না তাকিয়েই বলি।

—'তুমি তো ঘেন্না কর এ-জগৎটাকে—।' রুণা গম্ভীর হয়ে বলে।

—'ঘেন্না! কই না তো।' অবাক হই।

—'যাক্‌গে, ভেতরে না ঢুকলে বাইরে থেকেও তো অনেকে অনেক কিছু খবর রাখে?' রুণা তর্ক শুরু করেছে।

—'হ্যাঁ রাখে। আসলে 'ফ্যান্‌' হওয়াটা একটা স্বভাব। ওটা সবার আসে না।'

—'ফ্যান্‌ হতে কে বলছে—এতো বড় একটা ইণ্ডাষ্ট্রী কি করে চলছে জানতে ইচ্ছে করে না?' তর্ক চলছে।

—'জানি তো! নির্বিকার ভাবে বলি।একটা বড় রাইট টার্ণ করে রুণা বলে।

—'কি রকম?'

—ইণ্ডাষ্ট্রীটার মোটামুটি একটা ধাঁচ সবদেশেই সমান। এক-আধটু এদিক-ওদিক হলেও ড্রীম্‌মার্চেন্ট্‌ পড়ে একটা আঁচ পাওয়া যায়, তাতেই জানি।'

—'হ্যারল্ড্‌ রবিন্স? তুমি পড় বুঝি খুব!'

—'হ্যাঁ। প্রায় সবক'টা বই-ই পড়ে ফেলেছি; তোমার ভাল লাগে না?'

বুণা ঠোঁট উল্টে বলে, 'ভাল, তবে বড্ড পর্ণগ্রাফিকাল— ।'

বাধা দিয়ে বলি, 'ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রবিন্স্ বোঝা যাবে না। ওদের দেশে সেক্সটা ডালভাতের মত। রবিন্স্ পড়লে দেখতে হবে, একটা ঘটনার ডেসক্রিপ্শন্ কত ন্যাচারাল, কত ডীপ্ ইন্ টাচ্ উইথ্ দ্য সাবজেক্ট ইটসেল্ফ! কি সুন্দর নভেল্ ট্রীটমেন্ট দিয়ে, এক-একটা ইণ্ডাস্ট্রীর বা জীবনযাত্রার ছবি তুলে ধরেছেন ভদ্রলোক, এর তুলনা হয় না। সেক্স ডেস্ক্রিপশন্ সেখানে চাট্নীর মত ব্যবহার করেছেন।' এবার আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি। বুণা শুনছে। এবার বলে, 'কোন বইটা তোমার সবচাইতে ভাল লেগেছে, ওই ড্রীমমার্চেন্ট?'

আমি বলি, 'না, সবচাইতে টাচ্ করে আমাকে 'এ স্টোন ফর ড্যানি ফিশার।' অনেকে বলে, ওটা নাকি হ্যারল্ড রবিন্স-এর আত্মজীবনী— জানি না।'

—'ড্যানি ফিশার? কি জানি পড়িনি বোধহয়,—খুব ভালো?' বুণা জানতে চায়।

—'আমার ভাল লাগে, কারণ ওর একটা অংশের বর্ণনার ছবির সাথে আমার জীবনের খুব মিল পাই—তাই।' চুপ করে থাকি। গতকালের রাস্তাটা ছেড়ে অন্য একটা রাস্তা দিয়ে চলছে ছোট্ট ফিয়াট্টা।

—'থামলে কেন? মিলটা কোথায় বলছিলে ··· ।'

—'গল্পটার আগে একপাতা সলিলোকি আছে; জানো? সেখানে লেখক কবরের নীচে শুয়ে আছে। দেখছে তার বাড়ীর সব লোক কালো পোষাক পরে, হাতে ফুলের গুচ্ছ নিয়ে কবরের চারপাশে ভিড় করে আছে। নিঃস্তব্ধ। সবাইকে চিনতে পারছে লেখক, ছোট্ট শিশুটিকেও, কিন্তু সেই শিশুটা তাঁর সম্বন্ধে কিছু-ই জানে না। এই শিশুটির উদ্দেশ্যে, লেখক যে গল্পটা বলে গেল, যে চরম দারিদ্র্যের ইতিহাস, যে কারণে ওই বাচ্চাটা চিকিৎসার অভাবে মারা গিয়েছিল এবং আরও আনুসঙ্গিক ঘটনা—সেই গল্পটাই একটা কবর ফলক হয়ে পাঠকের হাতে উঠে আসবে।

চুপ করে থাকি।

বুণা বলে, 'দারুণ তো তারপর? তুমি বুঝি খুব সাফার করেছো জীবনে?' বুণা ঘসা গলায় মমতা ফোটাতে দ্বিধা করে না।

মাথা ঝাঁকিয়ে বলি, 'না, সেটা কিছু না। ওখানে একটা জায়গা আছে জানো, যেখানে দেখাচ্ছে—মিঃ ফিশার—সিনিয়র একটা ভীস পেন্সিং কেমিষ্ট শপ চালান। একটা বছর দশেকের ছেলে, একটা সদ্যোজাত কন্যা ও স্ত্রীকে নিয়ে কোন এক কো-অপারেটিভ-হাউজিং-এস্টেট থেকে একটা বাড়ী কিনে

১১

বসবাস শুরু করেছিলেন। একটা চুরি হয়ে যাবার পর, ওদের সোর্স-অব-ইনকামটা মার খায়। আর কো-অপারেটিভ থেকে ইন্সটলমেন্ট বাকী পড়ার জন্য ইজেক্টমেন্ট নোটিশ আসে। ওদেরকে স্লাম এরিয়াতে একটা স্বাস্থ্যহীন সংকীর্ণ ফ্লাটে উঠে আসতে হয়। এখানে ছেলোটা বা লেখক কু-সংগে মিশে বিগড়োতে শুরু করে। দেখায় কেমন এ্যাডামেন্ট বিহেবিয়ার। অথচ মনটা পড়ে আছে অতীতে। কুকুরটা মারা গেল। সেটাকে পাঁচিল টপকে, ফেলে আসা বাড়ীর মাঠে, রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে কবর দিয়ে আসে। দারুন মিসকণ্ডাকট করার জন্য মিঃ ফিশার-সিনিয়র, ধরে যখন বেত দিয়ে মারেন, ও তখন বোবা জানোয়ারের মত চাবুক খায়। অতিষ্ঠ হ'লে, বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে শুধু বলে, 'গিভ মী ব্যাক মাই হোম। আশ্চর্য। হেরে যাওয়া পোড় খাওয়া বিধ্বস্ত মানুষটা এতে কেমন গুটিয়ে যান।' একটু হেসে বলি, কলকাতায় আমাদের একটুকরো জমি ছিল জানো? বালীগঞ্জের বেশ একটা ভালো পাড়ায়। বাবা, জ্যাঠামশাইয়ের প্ররোচনায়—প্ররোচনা কথাটা বলা ঠিক হবেনা। একটা সময় বাবা আমার এই জ্যাঠামশাইকে দেবতা জ্ঞানে মেনে চলতেন। তাই জ্যাঠামশাই যখন বাবাকে ইনসিস্ট করতে লাগলেন তাঁর অংশটা বেচে দিতে, বাবা তখন মায়ের অনেক আপত্তি সত্ত্বেও 'রাজুর কিছুই ভারতে থাকল না' এইসব ওজর উপেক্ষা করে, জ্যাঠামশাই-এরই পরিচিত একজনকে বেচে দিলেন জমিটা অল্প দামে। জমিটাতে নতুন বাড়ী উঠেছে। আসা-যাওয়ার পথে তাকিয়ে দেখি, আর মনে হয় এটা আমার হতে পারত। মনে মনে বলি 'গিভ মী ব্যাক মাই হোম'।

বসে বসে চারদিক দেখছি শহরের দোকানপাট। ভাবছি আমার কথাগুলো না বললেই পারতাম। স্বল্প পরিচিত এই মেয়েটিকে এসব কেন বলতে গেলাম। কি ভাবল কে জানে। এই লিংকটা আমার কাছে কত তীব্র, ওর অনুভূতি দিয়ে, ওতো সেটা বুঝবেনা।

২৬

গাড়ীটা একটা মস্ত জেনারাল স্টোর্সের গায়ে পার্ক করে বুণা আমার কাঁধে টোকা দিয়ে বলল, 'নামো। গ্যালাক্সিতে একটু ঘুরে যাই এসো।' ওর দেখাদেখি আমার দিকেব জানালার কাঁচটা তুলে দিয়ে ভেতর থেকে লক করে রেখে, নেবে গিয়ে দরজাটা ঠেলে দিলাম।

'গ্যালাক্সি' একটা বেশ বড় দোকান। হেন জিনিস নেই, এখানে যা পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক এবং প্লাষ্টিক—ফুলগাছ থেকে আরম্ভ করে কস-

মেটিক্স ও টি ভি পর্যন্ত ! আমার দৃষ্টি অভ্যাস বশতঃ মেডিসিন্ কাউন্টারে। বিভিন্ন সেকটরে আলাদা আলাদা সেলসম্যান ঘোরাঘুরি করছে। রুণাকে, দেখলাম, অনেকেই চেনে। ম্যানেজার এগিয়ে এসে কি লাগবে জানতে চাইল। বাইরের কিছু আছে কিনা অর্থাৎ স্মাগলড গুডস রুণা হিন্দীতে ইশারায় জিজ্ঞেস করল। লোকটা একটা পাশে রুণাকে নিয়ে গিয়ে কতগুলো সেন্টএর স্প্রে দেখাল। বেশীর ভাগই আমার নাম-না-জানা। এ্যাডভার্টাইজও দেখিনি কোথাও। তিনটে শিশি পছন্দ করে ক্যাশ মেমোতে সই করে দিল। ভাউচারে সই করে জিনিস নেয়া বা বড় হোটেলে খাওয়াটা, এক ধরনের এ্যারিস্টোক্রাসি। দোকানটায় মেয়েদের ভিড়টাই বেশী। এদের রকম রকম পোষাকে দিশি মনে হচ্ছে না অনেককেই। নিজেকে বিদেশী দেখানোটাও একটা ফ্যাসান বোধ হয়।

গাড়ীতে ওঠার পর রুণা বলল, তুমি খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু।' চমকে ওর দিকে তাকিয়ে, হেসে বললাম —'হঠাৎ এ কমপ্লিমেন্ট ?' রুণা গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে বলল, 'বৃদ্ধ ম্যানেজারও সার্টিফিকেট দিল।'

—'ম্যানেজার !' অবাকই হই।

—'হ্যাঁ, বলল, এ কাকে নিয়ে এলে বিবি আওয়াসে', আমার জিনিস না দেখে, তামাম কাস্টমার, তোমার জিনিসটা দেখছে।' বলে হা-হা করে হেসে উঠল রুণা

আমি একটু হাসি গোপন করে বললাম, 'তা নয়, গিলে করা পাঞ্জাবী আর কোঁচানো ধুতি পরা 'বাঙালী বাবু' দেখছিল সবাই।'

—'ধুতি পাঞ্জাবী তোমাকে মানায় কিন্তু বেশ'

—'থ্যাংকস !' হেসে বলি, 'ফর ইয়োর কমপ্লিমেন্টস।'

২৭

গাড়ীটা একটা ম্যানশনে ঢুকিয়ে অনেকগুলো পার্ক করা গাড়ীর সমান্তরাল রেখে, প্যাকেটটা হাতে নিয়ে নেবে পড়ল রুণা। লিফটের কাছে এসে বৃদ্ধ-আপকান্টি মুসলমান লিফটম্যানের দিকে একগাল হেসে বলল, 'ক্যাইসে হে' চাচাজী ?' লোকটি পরম আনন্দে উদ্ভাসিত চোখ নিয়ে বলল, 'খোদাকা যেইসী মর্জি, আইয়ে ইসমে।' চতুর্থ লিফটের কাছে এসে বলল, 'যাইয়ে অটমেটিক চালু হ্যায়।' রুণা ওর পকেটে পাঁচটা টাকা গুঁজে দিয়ে, ওর পাকা দাঁড়িতে একটু হাত বুলিয়ে আদর জানিয়ে লিফটের দরজা বন্ধ করল। বোতাম টেপার সময়ই দেখেছিলাম। এগারো নম্বর আলোটা জ্বলে উঠতেই দরজার

দিকে একটু এগিয়ে গেলাম। বুণা লিফটের আয়নায়, চুলটা একটু ঠিক করে নিয়ে নেবে এলো।

কলিং বেল, একটা মিষ্টি ধ্বনি ভেতর থেকে ফেরৎ পাঠাল। দরজা খুলল একটি ষোল-সতেরো বছরের সুন্দরী পরিচারিকা! সে একটি সেলাম-ও জানাল আমাকে! আমি একদম প্রস্তুত ছিলাম না এর জন্য! মস্ত বড় ফ্ল্যাটের এ-কোণ থেকে টেনে ওকোণ পর্যন্ত খুব নিপুণ হতে সাজানো। সেটিং এবং ছবি দিয়ে। বেগুনী রং-এর সোফাসেটি আর পর্দার ব্যাকগ্রাউণ্ডে, জাফরাণী দেয়াল একটু গডি হলেও অপূর্ব। বসে. নিজেকেই বড্ড বেমানান লাগছে।

ফাঁকা ঘরে একটু বসে থাকতে থাকতেই একগ্লাস সরবৎ আর এক প্লেট ঠাণ্ডা আঙ্গুর রেখে গেল সেই মেয়েটি। সে চলে যেতেই এই স্বপ্নপুরীর মালকানী, স্বর্গের উর্বশীর মত বেশবাস ও প্রসাধনে সজ্জিত হয়ে, হাতে আঙ্গুর ডোবানো এক গ্লাস সরবৎ এবং মুখে পারিজাতের পাঁপড়ি ভাঙা হাসি নিয়ে ঢুকলেন। পেছনে গ্লাস হাতে বুণা। আসতে আসতেই চুমুক দিচ্ছে! উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার বিনিময়ের পর জানলাম এই আস্‌মান্‌ কা তারার নাম রেশমী গুলসান। সুরকার পরিচালক ও, পি. গুলসান্‌ এর স্ত্রী। স্বয়ং টপ্‌ক্লাস ফিল্ম গ্ল্যামার। যার কথা বুণা একবার সকালে বলেছিল।

পোষাক আসাক-এর জন্যই হোক বা পরিস্থিতির জন্যই হোক, ওর দিকে তাকিয়ে কথা বলতে খুব খারাপ লাগছিল। এটা সেটার পর, এ যুগের ফিল্ম কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে এই টপিক্‌ এলো। আমি মুখ্যতঃ শ্রোতা। তবে পুঁথিগত বিদ্যা; স্টেটস্‌ম্যানের ফিল্ম্‌ ক্রিটিকের কমেণ্টগুলো স্মৃতিতে থাকায় বেশ কাজ দিল। ফিল্ম টপিক যে আসবে, আমি জানতাম। যে, যে-লাইনের লোক, সে, সেই সম্বন্ধে একটু বকবে। একটু জানোয়ার—(যে খুব জানে আর কি!) ব্যক্তিত্ব দেখাবে. তাতে আর সন্দেহ কি! সেই একটা গল্প আছে না! কোশ্চেন্‌ আউট্‌ হয়েছিল 'শ্মশান' সম্পর্কে রচনা আসবে জেনে ছাত্রটি খু-ব কোটেশন্‌-ফোটেশন দিয়ে তেড়ে মুখস্থ করল 'শ্মশান'। ওদিকে পরীক্ষায় বসে দেখে এসেছে 'গৃহ পালিত পশু'। প্রথমে মাথায় হাত দিল। পরে গরুর ডেস্‌ক্রিপশন দিয়ে রচনা শুরু করে আধপাতা লিখেই গরুটিকে বিশূচিকা রোগে মেরে ফেলে শেষকৃত্য করতে শ্মশানে নিয়ে ফেললে। ব্যস্‌, তারপর বাকি চার পাতা 'শ্মশান' তো কোটেশন্‌ শুদ্ধু মুখস্থ! গল্পের গরু প্রয়োজনে গাছে ওঠে—মানে ওঠাতে হয়। তাই বলে মৃত গরুকে শ্মশানে এনে…। যাক্‌গে ফিল্ম্‌ষ্টার সেলুলয়েডের টেপে কি করল সেটাই গ্রাহ্য। খু-ব সুন্দরী হলে নাকি, (সুন্দরী পাঠিকা রাগ করবেন

না) তাঁরা একটু গা— মানে কম বুদ্ধিমতী হন। আমি জানি না, এটা আমার শোনা কথা। তবে রেশমী বেশ প্রাণখোলা। ভারতীয় চলচ্চিত্রে কিসিং-এ ওর কোন আপত্তি নেই। আমার মতামত জিজ্ঞেস করায় বললাম যে, 'এটা নির্ভর করে, কি সিকোয়েন্স্-এ কিস্ এর ব্যবহার করা হ'লো, তার ওপর। শুধু যৌন-আবেদন দিয়ে একশ্রেণীর দর্শককে তৃপ্ত করাই এর উদ্দেশ্য হ'লে, অবশ্যই আপত্তি আছে। বিদেশী বই-এ চুমু খাওয়াটা এতো স্বাভাবিক মনে হয় যে আর পাঁচটা কাজের মতই হিরো-হিরোইনকে চুমু খাবে, এটা কষ্ট হয় না মেনে নিতে। কিন্তু, ভারতীয় হিরোইন্-এর অধর ওষ্ঠে কোন নায়ক চুম্বন করলে, সত্যি বলতে কি একটু কষ্ট-ই হয়! বিশেষ করে হিরোইন যদি কুমারী হন! বিবাহিতা নায়িকার এ দৃশ্য, বেলেল্লাপনা! এ দৃশ্য দেখে তাঁর স্বামীর হয়ে বেশ লজ্জার অস্বস্তি এনে দেয়! গাত্রদাহ ও। যদিচ সুন্দরা পরস্ত্রীর মত অমন··· । যাক্‌গে—।'

এইসব হাসি-ঠাট্টার মধ্যে আলোচনা সুদূর-প্রসারী হয়ে ওঠে। এমন কি অনেক বিখ্যাত ফিল্ম-এ্যাক্ট্রেসের অন্দর-মহলের বিছানাতেও পৌঁছে যায়!

বোম্বের ফিল্ম জগৎ সম্পর্কে বেশ কয়েকটা মূল্যবান তথ্য জেনে ফেলি এই সুযোগে। ভুল বুঝলেও মোটামুটি একে কন্ট্রোল করে দু'টি গ্রুপ। প্রধান—রাজকাপুর গ্রুপ, হেমন্ত মুখার্জী গ্রুপ এবং দাদা অর্থাৎ অশোককুমার গ্রুপ। এঁদের প্রোডাক্‌সন্স-এর সাথে সাথেই পাল্লা দিয়ে আসছেন নতুন সব সুরকার ডিরেক্টর-প্রোডিউসাররা। বুণার বাবা এই দলের হ'লেও ও'র বই ক্লপ্ করে না; বেশ এ্যাক্সেপ্টান্স আছে। ও'র কথার দাম এতো যে, যে কোন হিরো-হিরোইন এ'র বইয়ে কন্ট্রাক্ট পেলে নাকি বর্তে যায়!

আবার আসবো কথা দিয়ে, কলকাতার বর্তমান অবস্থার কিছু আভাস দিয়ে—লিফটের দরজা বন্ধ হ'লো। এবারও লিফট ফাঁকাই। বুণা প্রথম কথাই বলল, 'কেমন লাগল রেশমীদিকে?' চোখে চোখে তাকিয়ে আছে। উত্তর দিই, 'চোখদুটো কটা না হ'লে সর্বাঙ্গ-সুন্দরী বলা যেত।' আয়নার দিকে ঘুরে গিয়ে একটু রাগতঃ কণ্ঠেই বলল, 'মেয়েদের দিকে অমন খুঁটিয়ে তাকাও কেন?' আমি শুনে অবাক! আমি এদিকে এতক্ষণ কোনদিকে তাকিয়ে থেকে কথা বলবো এটাই ঠিক করতে পারি নি—অথচ কত কিছুই দেখার ছিল রেশমীর! বললাম, 'মানে?'

ও সেকথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'কিস্ নিয়ে এতো মাতামাতির কি ছিল?' ও টপিকটা কিন্তু বুণাই তুলেছিল। মনে করিয়ে দিতে গিয়ে আবার বাধা পেলাম।

—'তুমি কবার কিস করেছ আগে ?' বুণা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল।

—'একবার-ও না !' প্রশ্নের ঠেলায় অন্ধকার দেখছি।

—'কেন ?' এর কেন হয় ! বুণা যে জানতে চায় !

—'সুযোগ হয়নি তাই।' নির্লিপ্তভাবে বলে ওপরে তাকিয়ে কত নম্বর ফ্লোর এলো দেখি। আর সঙ্গে সঙ্গেই চোখটা নামাতে হয়। কারণ আমার মাথাটা চুল শুদ্ধু শক্ত করে ধরে···বুণার লিপস্টিক্ ঘসা ঠোঁট···। সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে যায়—লিফট এসে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে থেমেছে। সম্মুখে দাঁড়িয়ে চাচাজী ! খুব চট করে সরে গিয়েছে—আশ্চর্য পটিয়সী, বুণা কুমার !

২৮

গাড়ীতে উঠেও কিছুক্ষণ কথা বলতে পারিনি। কান-টান লাল হয়ে গেছে বোঝা হয়।

বুণাই প্রথম কথা বলল, যেন কিছুই হয়নি এমন মুখের ভাব, 'খিদে পেলে বোলো।'

—'হ্যাঁ।' ঘাড় নেড়ে জানাই।

—'দুপুর বেলায় জুহুর একটা অন্য রূপ আছে, দেখবে নাকি ?' কিছুই জানা নেই সকাল বা বিকেলের রূপটা কি ! বলি, 'যা খুশী।' আমিও স্বাভাবিক হয়ে যাই।

'বোম্বের বিউটী হচ্ছে সমস্ত শহরটার মাঝখান দিয়ে দু'প্রস্থ ট্রেন চলাচলের রাস্তা লম্বালম্বি।' বুণা গাইড্ হয়ে গেছে আমার। 'একটা টি ভি. থেকে সেতো দেখছ, যেখানে ইস্ট্ থেকে সব ট্রেণ আসে। অন্যটা চার্চ গেট্। দুটোতেই পুরো বোম্বাইকে কানেক্ট করছে। ······জানো তো বোম্বাইটা কিন্তু কয়েকটা টুকরো টুকরো সমুদ্র থেকে মাথা তোলা দ্বীপ।' বুণা তার ভূগোল জ্ঞান উজাড় করে দেয় ! 'অনেক জায়গাতেই তার সাইন্ রয়েছে।' আমি ওর আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম।

বলি, 'এখানকার সাবার্ব্-ও যা ডেভেলপ্ড্, কলকাতার সাথে কোন কম্পেরীজন্-ই হয় না।'

—'কোন দিকের সাবার্ব বলছ ?'

—'আমি যেখানে আছি দাদার।' নিশ্চিন্ত সুরে বললাম।

—'দাদার, সাবার্ব্ ?' বিস্মিত বুণা। 'বলছটা কী ? দাদার রীতিমত সিটির মাঝখানে। দাদার কী— আন্ধেরী-টেরী ছাড়িয়ে বোম্বে সিটি শুরু হয়ে গেছে ?' বুণা হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না।

আমার অজ্ঞতায় আমি লজ্জিতই হই। কোলকাতার জোন্ নাম্বারে বসবাস করেও ঢাকুরিয়া-যাদবপুরকে গ্রাম ছাড়া আর কিস্স্যু মনে হয় না। অভিজ্ঞতা তো ওই! বললাম, 'কিন্তু শহরের মাঝে মাঝে গ্রামও উঁকি মারছে কিন্তু।'

—'হ্যাঁ। বেশ লাগে না! প্রবাসিনী রুণার গলার স্বরে, সুদূরে ফেলে আসা গ্রাম-বাংলার ছবি মনে জাগল বোধহয়।

একটা পাঁচ মাথার মোড় থেকে মহাত্মা গান্ধী রোডে পড়েছিলাম, আবার একই রকম দেখতে একটি পাঁচমাথায় এসে সবকটাকে ছেড়ে একদম ডানদিকে টার্ণ নিয়ে রুণা জানাল সোজা গেলে ফ্লোরা ফাউন্টেন পড়ত। যাকে হ তাত্মা-চক-ও বলে। বীর ন্যারিম্যান রোড এ গাড়ী, পথে নামটা দেয়ালে লেখা, চোখে পড়েছিল।

—বাঁ দিকে— ওভাল।' ঘাড় ঘুরিয়ে ভারতের ওভাল ময়দানের একটা মাথা চোখে পড়ল। তারপর হোটেল এ্যাম্বাস্যাডর। এখানে থেকেই সমুদ্রের আভা দেখা যাচ্ছে। হোটেল-এ্যামবাস্যাডর ছাড়িয়ে একটি চওড়া রাস্তায় পড়ে বাঁদিকে টার্ণ নিয়ে বলল. 'রাতে এখানটা আলোয় আলো।'

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এই জুহু?'

ও অবাক হয়ে বলল 'না, দুৎ, মেরিন ড্রাইভ্। ছবিতেও দেখনি?' ও হাসতে হাসতে বলে, 'জুহু তো উল্টো দিকে, আন্ধেরীর দিকে। আরেকদিন যাবো।' উড়ন্ত কুন্তল ঠিক করে বলল, 'এর নাম ব্যাক্ বে।'

সমুদ্রের স্থির রূপের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'জলটা নীল নয়, কাল দেখাচ্ছে।'

ও বলল, 'এটা আরব সাগরের অংশ।' শাড়ীর আঁচল ঠিক করে এক হাতে, অন্য হাতে ষ্টিয়ারিং। আরব-বেদুইন্ কন্যাটি তার ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড় করাল অনেক গাড়ীর ভিড়ে। বলল, 'ন্যারিম্যান্ পয়েন্ট্।'

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে প্রগলভ শাড়ীটাকে শাসন করে, আমার ঘাড়ে হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল খানিক। এখানে সমুদ্র একটা পরিষ্কার বাঁকের মাঝে স্থির হয়ে গেছে। দূরে বাঁকের শেষ মাথায় রাজভবনের চূড়া দেখা যাচ্ছে। ওই মাথাটার নাম এটার মতই 'মালাবার পয়েন্ট্'। একটু পাহাড়ী ভাব। রুণা তার গালটা আমার হাতে ঠেকিয়ে বাচ্চা মেয়ের মত বলল, 'খিদে পেয়েছে। চল—।' খিদে আমারও পেয়েছিল। নতুন জায়গা দেখার আনন্দে ঘড়ির দিকে নজর ছিল না। গাড়ীটা ব্যাক্ করে মাদাম কামা রোড হয়ে, পড়ল কুইন্স রোডে। বেশ কিছুক্ষণ সাউথে গিয়ে গাড়ী পার্ক করল—'ফরিয়াস হোটেল'। কত তারকা-লাঞ্ছিত জানা নেই।

এই জায়গাটা আগে নাকি সমুদ্র ছিল। সারা বোম্বের পরিত্যক্ত জিনিস-পত্তর ফেলে ফেলে ডাঙা করা হয়েছে। পাথর ফেলার কাজ এখনও চলছে। হায় ক্যালকাটা করপোরেশন— হায় ধাপার মাঠ!

খেতে বসে বুণা একটান পর একটা দাগ দিয়ে যাচ্ছে, মেনু কার্ডে। পাশে বসে দেখে যাচ্ছি ওর কাণ্ড! বেয়ারা চলে যেতেই ও আরেকটু সরে এসে বসল। কাঁধে কাঁধে ঠেকিয়ে বলল, 'সবাই এদিকে তাকিয়ে কি দেখছে বল ত— ?' চারদিকে নজরটা ঘুরিয়ে এনে বললাম, 'বিদেশীরা ভাবছে এরা না জানি ভারতের কোন পাড়ার বাসিন্দা।'

—'আর দিশীরা ?' বুণা জিজ্ঞেস করে মুখ উঁচু করে চোখে চোখে তাকিয়ে থাকে।

'দিশীরা ভাবছে··· ভাবছে···' কথাটা ভাবতে চেষ্টা করি।

—'পারলে না তো ? ওরা ভাবছে—' বুণা জানায়, 'কলকাতা থেকে নতুন বিয়ে করে এনে এই হোটেলেই হানিমুন করছে এরা।' বেশ রসিয়েই বলে বুণা। আমি হাসি।

সুপ থেকে আরম্ভ করে পুডিং পর্য্যন্ত হুশ করে উধাও হয়ে গেল। বেয়ারার হাতে বিলটা এগিয়ে আসছে দেখে স্বাভাবিকভাবেই পকেটে হাত ঢোকাই। বুণা বাধা দিয়ে দেয় কনুইয়ে চাপ দিয়ে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। পকেটে বিশেষ করে পাঞ্জাবীর পকেটে আমি ওয়ালেট ব্যবহার করি না। কটা পাঁচটাকার নোট আছে বুণা বিলটা মিটিয়ে বলে— 'এখানে তুমি আমার গেস্ট— মোস্ট অনারেবল ওয়ান।' মিষ্টি হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তোলে। কৌচে ফের কাছাকাছি ঘেঁসাঘেঁসি বসে, একটু জিরিয়ে নিয়ে উঠে পড়ি আমরা। করিডোরে, শো কেসে অনেক রকমের মালা সাজানো দেখে বুণা দাঁড়িয়ে যায়। আমিও দেখি। পুঁতির মালা। নানান্ দেশের একটা মালা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বুণা বলে, 'দারুণ না ?' বাঘ নখের মালা আর দুল। সেট্টা পুরানো ঘরানার। ইমিটেশন গোল্ডে বাঁধানো। দামের টোকেনটা অন্যদিকে ঘোরানো! গাড়ীতে বুণা বসতেই বললাম, 'এক মিনিট, আসছি।' বুণা বলল, 'ঢুকেই বাঁদিকে ল্যাভেটরী।' ও স্বাভাবিক অবস্থাটাই আন্দাজ করেছে। করিডর-এ পৌঁছেই চট্ করে ফিরে আসি।

দাদারে যখন পৌঁছলাম তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। রাস্তার মোড়েমোড়ে নিয়ন এ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো জ্বলতে নিবতে শুরু করেছে। পড়ন্ত আলোয় বুণার সারাদিনের ধকল নেয়া মুখের চেহারা দেখে বলি,

—'আমার জন্য যেচে স্ট্রেন নিলে।'

রুণা মুখটাকে স্বর্গের দেবীর মত করে বলল, 'এমন দিন বোম্বেতে এর আগে একটাও আসে নি।' গাড়ীটা বাগানে ঢুকিয়ে পোর্টিকোর একটু দূরে দাঁড় করিয়ে ড্যাশ বোর্ড থেকে সেন্টের প্যাকেটটা আমাকে দিয়ে বলল 'একটা রেশমীদিকে দিলাম, এদুটো তোমার।'

আমি যারপর নাই বিস্মিত হয়ে বললাম, 'সে কি, আমি তো সেন্ট্ ব্যবহারই করি না!'

—'করবে এখন থেকে।'

প্যাকেট্টা পকেটে পুরে বললাম,

—'নামবে না?'

ও বলল, 'আজ যাই। কাল বা পরশু ফোনে কথা বলে নেব, হুঁ?'

দরজা খুলে নেবে যেতে বাঁদিকে সীটের ওপর এতোক্ষণ আড়াল করে রাখা চ্যাপ্টা চৌকো বাক্সটা রুণাকে ধরিয়ে দিয়ে, দরজাটা বন্ধ করে দিই। ভেতর থেকে অবাক-সূচক কয়েকটা শব্দ, কাগজের মোড়ক ছেঁড়ার আওয়াজ, এবং কয়েক সেকেণ্ড পরে 'দেখছে কাণ্ড!' এরও পর গাড়ী থেকে নেবে, ওপাশ থেকেই গাড়ীর ছাদের ওপর দিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দেয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে অভিষিক্ত হচ্ছি। দামের টোকেন্টা আগেই ছিঁড়ে দিয়েছি। আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে, ফরীয়াস্-এর করিডরে দৌড়ে যাবার সময় শঙ্কিত-ভাবে পকেট থেকে নোটগুলো বের করে গুণেছিলাম ন'টা! দোকানীকে হিন্দীতে দামটা জিজ্ঞেস করতেই বাঘ নখের সেট্টা নামিয়ে এনে বললে, 'পঁয়তাল্লিশ রুপেয়া!'

রুণার কানে দুল পরার ফুটো বন্ধ হয়ে গেছে! আছে নাকে। সেখানে ছোট্ট একরত্তি হীরে। গলায় মালাটা খু-ব-ই ভাল ম্যাচ করেছে। এতো সস্তায় কাউকে খুশী করে মনটা বেশ প্রফুল্লই লাগছে।

রুণা অনেকক্ষণ বন্দনা আর রাধার সাথে আড্ডা দিয়ে বিদায় নিল। অথচ ও একটু আগেও গাড়ী থেকে নামতেই চায় নি!

রাতে খাওয়ার পর শ্রান্ত দেহটাকে বিছানায় আনার সঙ্গে সঙ্গে অন্য জগৎ!

২৯

সকালে চা নিয়ে ঘরে ঢুকল; বন্দনা। আমি চুপচাপ বসেছিলাম। খানিকটা আগেই উঠেছি।

—'মর্ণিং।' আমি হেসে বলি।

১২

—'গুড্ মর্নিং।' বন্দনা নয়, দরজার কাছ থেকে রাধা নিজের চা নিয়ে ঢুকল, মুখে চোখে কৌতুক। শুভেচ্ছাটা সেই জানাল।

-'ভিক্টর ওঠে নি ?'

--'না, ও অনেক রাতে ফিরেছে, এখনো ঘুমোচ্ছে, ডাকিনি।' বন্দনা বসে পড়ল। খেয়াল হ'লো রাতে খাওয়ার সময় ভিকু ছিলনা।

একটু আড্ডার পর রাধা ভেতরে গেল। বন্দনা খানিক উশ্খুশ করে বলল, 'আমাকে একটা রুণার মত মালা কিনে দেবেন ?' বলতে গিয়ে ও কি একটু ব্লাশ করল! অথচ কি মিষ্টি করে চাইল ও! অনেকদিন আগে আরেকজন ঠিক এই কথাটা, আরও মিষ্টি করে বলেছিল। সে তারা। তারাবিবি!

৩০

মীরাবাঈ কলকাতা থেকে দেশে গেছে। আমরা তখন ছোট। বাবার হুকুমে আমি আর তারা, সবসময় রাজকন্যার সমাদরের এতটুকু কার্পণ্য না হয়, তার জন্য তটস্থ ছিলাম। প্রায় সমবয়সী হ'লেও মীরাদি আমার থেকে কয়েক বছরের বড়। খেলতে খেলতে মীরাদি একসময় ক্লান্ত হয়ে ওদের ঘরে চলে গেল। তারা, আমার ছোট্ট তারা আমার খুব কাছে এসে গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'আমাকে একটা ওইরকম মালা কিনে দিবি ভাইজান।' মীরাদির গলায় একটা রুবির সুন্দর মালা দেখে ওর পছন্দ হয়েছিল।

আজকে এতদিন বাদে সেই স্বর শুনে একটু নির্বাক্‌ই হয়ে গিয়েছিলাম বন্দনা সেটা লক্ষ্য করেই খুব করুণ মুখে মাথা নীচু করে আস্তে উঠে গেল। নীরব থাকার অর্থ ও কি ভাবল কে জানে! ওকে মালাটার একটা জোড়া, অন্য দোকানে খোঁজ করে নিশ্চয়ই কিনে দিতে হবে। না পেলে খুব খারাপ দেখাবে ব্যাপারটা।

মীরাদির খুব দেমাক ছিল। মনে পড়ে, দরবার ঘরের পেছনে একটা বিরাট হাওদা থাকত। পিঠে চাপানোর মত অত বড় হাতী তখন একটাও বেঁচে নেই। তাও ওটা পড়েই থাকত। আমরা ওটাতে উঠে শিকার-শিকার খেলতে খুব মজা পেতাম। সেই সাধে থ্রিলের 'অন্ত নেই! সেদিন মীরাদি, আমি, তারা আর বাড়ীর গুটি কয়েক শিশু সমেত বিরাট একটা কাল্পনিক শিকার-পার্টির কুচ্‌কাওয়াজ চালাচ্ছি। হঠাৎ, কার একটা অদৃশ্য হাতী ততোধিক অদৃশ্য একটা বাঘের বোঁট্‌কা গন্ধ পেয়ে সবাইকে সাবধান করে দিতে থাকে! বেশ হৈ চৈ-এর ভেতর সবাই পজিশন্ নিয়ে এয়ার-গান-

গুলো তাক্ করে দাঁড়াই। কে একজন বুদ্ধি দিল হাতীর ওপর উঠে যাওয়া নিরাপদ। হাতী, অর্থাৎ হাওদার ওপর উঠতে গিয়ে আমি থেমে গিয়ে মীরাদিকে আগে জায়গা করে দিয়ে বললাম।

—'তুমি আগে ওঠো।'

মীরাদি বলল, 'না না তুই উঠে পড়্না?' আমি তবুও 'ওকেই সর্বাগ্রে ওঠার জন্য ইন্সিষ্ট্ করতে লাগলাম। মীরাদি হঠাৎ বলল' ওঃ বুঝেছি কেন আমি আগে উঠবো!'

পেছন পেছন উঠে বললাম, 'কেন?'

—'আমি মহারাজার মেয়ে কিনা তাই।' বলে রাজকুমারী মীরাবাঈ ঘাড় বেঁকিয়ে মাথা উঁচু করে হাওদার একটা হাতলে গম্ভীর হয়ে বসলো!

২১

অফিস যাত্রীরা বেরিয়ে যাবার পর, বন্দনা আর রাধা সেজেগুজে ঘরে ঢুকল। 'রেডি হয়ে নাও।' গম্ভীর আদেশ রাধার!

—'কোথায় যাবে!'

—'দুমিনিট সময়—। কোর্ট মার্শাল?'

হেসে শার্ট আর ট্রাউজার নিয়ে বাথরুমে যাই। পোষাক পাল্টে বের হয়ে দেখি ঘরে কেউ নেই! ড্রয়ার থেকে কিছু টাকা পকেটে নিয়ে, জুতোটার ফিতে এঁটে বাইরের ঘরে এসে চারজনাকেই পেলাম। মাসীমাদ্বয়-ও রেডী। যাচ্ছিটা কোথায়, জিজ্ঞেস আর করলাম না।

বাগানে ট্যাক্সি ঢোকার আওয়াজে সবাই আমার দিকে একবার তাকিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলেন। আমি ড্রাইভারের পাশে, জানালার ধারের সীট্ রাধার। বাকী তিনজন পেছনে।

দাদার স্টেশনে নেবে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে টেনে চাপলাম আমরা। শহরের মাঝখান দিয়ে টেন লাইন। মাঝে মাঝে আশ্চর্যভাবে পরিচ্ছন্ন গ্রাম, ফুল-বাগান-সমেত উঁকি দিচ্ছে। পরক্ষণেই আবার টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরীর গগন-চুম্বী ছাদ! কখনো নোংরা একটুকরো ঘিঞ্জি বস্তি, কুষ্ঠের মত আদরে লালিত শহরের গায়ে।

বোম্বে সেন্ট্রাল ষ্টেশনে এসে নাবলাম। এবার বাসে চেপে শহরের মধ্য দিয়ে এসে একেবারে সমুদ্রের ধারে চলে এলাম। যদিও মহালক্ষ্মী স্টেশনেই নাবা যেত। চরণ ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রকুমার! তীর্থযাত্রীর বয়ে আনা গো দুগ্ধে স্নান করেন মহালক্ষ্মী। চতুর্ভুজে ঝরে পড়ে

আশীর্বাণী। স্বর্ণ-খচিত মহালক্ষ্মী ভক্তিরসের প্রাণকেন্দ্র, এ'শহরের। কলকাতায় যেমন কালীঘাট। তফাৎ শুধু এই, এখানে নেই পাণ্ডার টানাটানি, নেই নোংরা আবর্জনার স্তূপ। আছে একাগ্রতার উৎস মুখ। স্থির করে দেয় মনের চঞ্চলতাকে নিয়ে ডুবিয়ে আনে সমুদ্রের গভীরতা। ঊর্ধ্বে নীল আকাশ, সৃষ্টির আর এক অব্যক্ত অব্যয়। সম্মুখে সুদূরে ঊর্ধ্বগামী সমুদ্র, আকাশকে জড়িয়ে ধরেছে পরম স্নেহে দিক্‌চক্রবাল যেখানে। আবার এদিকে সহস্র কল্লোলিত জনসমুদ্রের এক একটি ঢেউ উত্তাল হয়ে ধরতে চেষ্টা করছে চিরশান্তিকে! নিঃঝুম হয়ে বসে থাকাটাকে নাড়িয়ে দিল বন্দনার কণ্ঠস্বর। 'ভেতরে পুজো দিচ্ছে সবাই, আপনি গেলেন না?'

বললাম 'না। এখান থেকেই পুজো পাঠালাম অন্তরের। বিগ্রহ দেখে এসেছি একবার। তুমি পুজো দিলে না?'

—'মা-ই তো দিচ্ছেন।' ঝুপ করে পাশে বসে পড়ল বন্দনা। কিছু কথা বলল না। দু'জনে অনেকক্ষণ নিজের নিজের আবর্তে মনে মনে ঘুরপাক খেতে থাকলাম। তারপর একসময় তিনজনের মিলিত কণ্ঠস্বরে যুগপৎ চমকে উঠে পড়লাম। মাসীমা প্রসাদী ফুল মাথায় এনে ঠেকালেন আমার, বন্দনার। হাঁ করতে বলে মুখে পেঁড়া জাতীয় কিছু শুকনো মিষ্টি ছেড়ে দিলেন।

ট্যাক্সি অনেকগুলোই দাঁড়িয়ে আছে। ইশারায় ডাকতেই চলে এলো। গোপাল রাও দেশমুখ মার্গ ধরে চলেছে ট্যাক্সি। একটা ফ্লাই ওভার ক্রস্ করার সময় রাধা জানাল নীচের রাস্তাটা সোজা জৈন টেম্পল্‌-এ গেছে। আমরা একটু ঘুরে যাচ্ছি। বাবুলনাথ মন্দিরে একটু থেমে দেখে নিলাম চট করে। তারপর ঐ ট্যাক্সিতেই শর্টকর্টে চলে এলাম বালগঙ্গাধর খের-মার্গ এ যেখানে সেই সুবিখ্যাত জৈন মন্দিরটি আছে। অজস্র ভাস্কর্যে খচিত মালাবার হিল্‌স্‌-এর মাথায় ধরে রাখা এই অপূর্ব কীর্তিটি শোভা পাচ্ছে। ট্যাক্সির মিটার না চড়িয়ে ওকে ছেড়ে দেয়া হলো। যদিও সর্দারজীর আমাদের সাথেই থাকার ইচ্ছে প্রকাশ পাচ্ছিল। বেশ কিছুটা সময় নিয়েই ঘুরে ঘুরে দেখলাম চত্বরটা। মহালক্ষ্মীর মন্দিরের মত অত ভীড় নেই যদিও, কিন্তু এত উঁচুতে পারিপার্শ্বিক কোলাহল ছেড়ে ঊর্ধ্বে এই পাহাড়ী ঢেউয়ের স্তব্ধতায় ধ্যান নিমগ্ন জৈন মন্দিরের আরেক প্রশান্তি উপলব্ধি করলাম। জৈনদের সমস্ত ঘটনা জানা নেই, তাই প্রাচীর-গাত্রে প্রোথিত ছোট ছোট মূর্তি দিয়ে নানা কাহিনী বলার চেষ্টার—মনগড়া উত্তর খুঁজে নিচ্ছিলাম আমরাই। মুণ্ডিত মস্তক ও চামর হস্তে যে পুরোহিতের কাছে এলাম, তাঁকে না পারলাম আমাদের প্রশ্ন বোঝাতে, না সে পারল তার ভাষার ভাণ্ডার নিয়ে

আমাদের মনের সীমানায় পা বাড়াতে। তাই হেসেই বিদায় নিলাম উভয়ের কাছ থেকে।

মালাবারের শেষ ধাপে, অনেক নীচে বানগঙ্গার বাঁধানো পুকুর ঘাটে বসে পড়লম সবাই। একটি ছোট বুদবুদ জলপ্রপাত উর্ধ্বগামী হয়ে এই পুষ্করিণীর সৃষ্টি করেছে। এর সৃষ্টির আদি রহস্য নাকি স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র এক বাণে পৃথিবীর বক্ষ বিদীর্ণ করে মা-গঙ্গাকে পথ করে দিয়েছিলেন। সমুদ্রের একটু ওপরেই এই সুমিষ্ট জল, তৃষ্ণার বারি, ভক্তির রস আস্বাদন করলাম। এখানেই আমরা দুপুরে জলযোগ সেরে নিলাম। প্রসাদী খাবার আর সঙ্গে আনা ঘরের খাবার মিশিয়ে, বাঁধানো উঠোনে বসে, পরম তৃপ্তিতে! লক্ষ্য করলাম, আজ সকাল থেকে এ পর্যন্ত যা খেয়েছি, সবই নিরামিষ। অথচ এ বাড়ীতে বীফ্ চলে! বাঙালী ঘরণীর একেবারে নিজস্ব সংস্কারটুকু ছাড়া যায়নি!

এরপরই এতক্ষণ ধরে রাখা প্রশান্তির ঘটল ছন্দপতন। দুবার বাস বদলে চলে এলাম চৌপট্টিতে। বিকেলটা এখানেই কাটিয়ে বাড়ী ফেরার প্রোগ্র্যাম্।

হাজারো মানুষের ভীড়। হেঁটে হেঁটে রূপালী বালুকণার বুকে ধরা অপূর্ব সব ভাস্কর্য ভেঙে তছ্‌নছ্ করছে কেউ। কেউ স্নান করছে। সন্ন্যাসী, হিপীর-ও কমতি নেই। আর আছে প্রায় সবকিছু বেচার ফিরি-ওয়ালারা। রেসের বই থেকে আরম্ভ করে রসনা-তৃপ্তিকর জিনিষ পর্যন্ত। বোধহয় মানুষও বেচাকেনা হয়। চুপ্‌চাপ্ বসে বসে জল সমুদ্রের অথবা জনসমুদ্রের ঢেউ গুণে যাওয়া...

কাছেই বসা রাখা বলল, 'ওই দূরে উল্টোদিকে মেরিন্ ড্রাইভ হয়ে নারিম্যান্ পয়েন্ট্। বুণাদের বাড়ীতে যাবে নাকি?'

—'মেরিন্ ড্রাইভ্?' অবাক হয়ে বলি, 'কাল তো ওখানেই ছিলাম আমরা।'

—'তাই নাকি?' বন্দনা বলল, 'বুণার বাড়ীতে যাওনি?'

—'নিয়ে যায় নি তো।' হেসে বলি, 'বোধহয় বাড়ী গেলে বোম্বে দেখাতে দেরী হয়ে যাবে তাই।'

ওরা দু'বোন চোখে চোখে চাইল।

বললাম, 'বরং সকালে প্রথমে যে বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল সে তো ফিল্মস্টার—' ঢোক গিলে বলি, 'রেশ্‌মী গুল্‌শন্।'

—'তাই নাকি?' ওরা দু'জনেই একসাথে বলে ওঠে।

—'সারাদিনের অনেক বিবরণ তো বুণ্ জানালো, এটা চেপে গেল কেন?'

কথাটা বলল রাধা। বন্দনা নিশ্চুপ।

—'না বোধহয় খেয়াল করে নি—' ব্যাপারটা সহজ করে দিই। ওরা আর এ কথায় অগ্রসর হ'লো না।

আস্তে আস্তে মেরীন্ ড্রাইভের রঙীন আলোগুলো জ্বলে উঠল। মো-বাইল্ স্টল্ থেকে কফি খেয়ে উঠে পড়লাম। অন্ধকারের জীবদের ঘুম ভাঙার আগেই আমরা চম্পট দিলাম। বাসে করে ফিরে এলাম। ছোকরা চাকরটা ঘরে ঢুকতেই জানাল রুণাদিদি বার কয়েক ফোন করেছে। আমরা বেরিয়ে যাবার পর-ই একবার, এই একটু আগেই দু'বার।

রাধা সোজা টেলিফোনের কাছে গেল। দুই মাসীমা বসার ঘরে ঢুকে সারাদিনের পবিত্র আনন্দ-মুহূর্তগুলো ব্যক্ত করছেন। মেসোমশাইদের টিপ্পনীও চলছে সাথে সাথে। ঘরে ঢুকে সারাদিনের ঘর্মাক্ত জামাটা, গেঞ্জীটা খুলে দারুণ রিলিফ্ বোধ করছি। ছোট করে একটা স্নান সেরে নিলাম।

বিছানায় ঠেস দিয়ে বসে সকালের কাগজটাই উল্টোলাম কতক্ষণ। রাতের খাবার খেতে বসে মিঃ তালুকদার আরও সব দর্শনীয় জায়গাগুলোর কথা বললেন, যেমন, এলিফ্যান্টা কেভ্, বুদ্ধিস্ট কেভ্, কার্লা কেভ্ আর পাওয়াই, বিহার তুলসী লেকগুলোর ডেস্ক্রিপ্শন্, কারালা আর গীর-ফরেস্ট-এর ওয়াইল্ড্ লাইফ্ স্যাংকচুয়ারীর কথা। এক সপ্তাহ কেন তিন মাসেও শেষ হবে না! আবার যদি কখনও আসি তখন দেখা যাবে।

খাওয়ার মাঝখানে ভিক্টর ঢুকল। নাসারন্ধ্র ঈষৎ স্ফীত। গম্ভীর। চোখাচোখি হতে একটু হাসল বোকা বোকা। অর্থাৎ ইনি কোন সান্ধ্য আসর থেকে এলেন। টেবিলে যা কথা হচ্ছিল তাতে কোন বাধা সৃষ্টি হ'লো না।

খাবার পর, আমার ঘরে বিছানায় বসে তিনজনের একটু আড্ডা। জানতে পারলাম রুণাকে রাধা ফোন করেছিল। কাল সে আসছে দুপুরে। আমরা সবাই যের চ্ছি হারা অভিমুখে। ও, গাড়ী নিয়ে আসবে একটায়। আমাদের রেডি থাকতে বলেছে।

৩২

যথারীতি দেরী করে ঘুম ভাবল সকালে ব্রেক্ফাস্ট টেব্ল্-এ খুব হৈ-চৈ। ভিক্টরের গলাই পঞ্চমে, অবশ্য উদারায়। ব্যাপারটা একটু বাদে বোধগম্য হ'লো। ইণ্ডিয়ান হকি, ওলিম্পিকে হেরে গেছে। এদের মধ্যে বাজী হয়েছিল। ভিক্টরই বাজী জিতেছে! কাল রাত জেগে রীলে শুনেছে

ভিক্টর। কাগজে না দেখা পর্যন্ত বোনেরা বিশ্বাস করেনি। এখন চায়ের টেবিলে ঝড়। বাজীর টাকাটা তিনশ'। আমার একমাসের ডেইলী এ্যালাওয়েন্স্!

বাগানে কুকুরগুলোকে নিয়ে হেঁটে বেড়াতে বেড়তে আমার ঘরের পাশে চলে এলাম। সেই চোখের পাতা সম্পূর্ণ মেলে আছে। কী যেন দেখছে ওদের ওই বিস্ফারিত চোখগুলো দিয়ে! আশ্চর্য হলাম কুকুরদুটোর আচরণ দেখে! কিছুতেই ওই গাছগুলোর ধারে কাছে নিয়ে যেতে পারলাম না। গর্‌গর্‌ করে ধমক দেয়! ওরাও কী কোন ভোরে ঐ আনক্যানি ফিলিংসে পড়েছিল! কুকুরের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নাকি অসাধারণ সজাগ! মিঃ তালুকদারকে জিজ্ঞেস করার কথা কিছুতেই মনে থাকে না!

খাওয়া-দাওয়া সেরে রেডী থাকলাম ঘরে। সাদা ট্রাউজার-এর ওপর পাটভাঙা আদ্দিব গুরু-পাঞ্জাবী চাপিয়ে (একটু মড্‌ হবার চেষ্টায়?) বিছানায় শুয়ে রেস্ট্ নিচ্ছি। ডাক আসলেই বের হব। বন্দনা-রাধারাও নিশ্চয় এতক্ষণে প্রসাধন সেরে ফেলেছে।

গাড়ীর আওয়াজ, কুকুরের চীৎকার, কলিং বেল-এর মিষ্টি টুং টাং, রাধার গলা, বুণার অনুযোগ। কথাগুলো স্পষ্ট হচ্ছে না এ ঘরে। শুধু কথার সুরটুকু ধরা পড়ছে মাত্র।

—'তাতে কী হয়েছে—' বলতে বলতে রাধা ঘরে ঢুকল। পেছনে বুণা। বুণার পরনে ডীপ্‌ ব্লু রঙের ট্রাউজার, সাদা শার্ট গোঁজা। কেমন টেক্সাস্ ফিল্‌মের নায়িকা-নায়িকা লাগছে। আর রাধা! যে শাড়ী পরে খেতে বসেছিল সেটাই পরে আছে! নো মেক্ আপ্‌ নট্ কিছু। তক্ষুনি বন্দনাও ঢুকল। তথৈবচ! পোষাক পাল্টায় নি! আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বড় বড় চোখ তুলে বলল।

—'বেরিয়ে পড়ুন!'

—'তোমরা?'

—'বাড়ীতে ক'জন আসবেন আজ। ভি. আই. পিজ্‌। থাকতে হবে।' কেটে কেটে বলে রাধা।

—'বন্দনা আমাকে হেল্প্‌ করবে একটু, অবকোর্স ইফ্‌ ইউ পারমিট্ হার টু্যাস্ট এ্যালঙ্‌।'

—'আমি··· পারমিট্··· !!'

বাইরে এসে দাঁড়াল দু'বোন। এ আইডিয়াটা ওদের আগেই এসেছে। ইচ্ছে করে এড়িয়ে গেল। বুণাকে কী এরা পছন্দ করে না? কেন!

গাড়ী আজ উল্টো দিকে টার্ণ নিল। আন্ধেরীর দিকে। পথে একটা সিনেমা-হলের মাথায় রেশ্‌মীর একটা ব্লো-আপ্‌ দেখে রুণা বলল, 'কী সুন্দর না ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'বিষাদের প্রতিমা।'

—'ভাল লাগে না ?'

—'লাগে-তো !'

—'বাপির বইয়ে নামলে, তোমার নায়িকা হ'তো ও। টোটেনখামেনের স্ত্রী।'

—'ভাগ্যিস্‌ নামিনি !'

—'কেন ?'

—'আমি তো মমি হতাম। আর আমার অমন সুন্দর রাণীকে আব পাঁচটা ভুত লুটে পুটে খেত।'

—'যাঃ…' হাসিতে ফেটে পড়ে রুণা। ওর শরীরটা বাউন্স্‌ করে ছল্‌কে ছল্‌কে উঠছে হাসির দমকে !

—'আমরা আজকে কোথায় কোথায় যাবো রুণা ?'

প্রশান্ত হেসে রুণা বলল, 'বল 'কোথায় যেতে চাও —।'

সত্যি কথা বলতে কি, কলকাতা ছাড়া আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করেই না আমার।'

—'তুমি খুব হোম্‌-সিক্‌ তো !' রুণা কপট ধমক দেয়।

এ্যাক্সিলেটরে চাপ দিয়ে স্পীড্‌ তুলল রুণা।

আজকে আর রাস্তা চেনাচ্ছেনা ও।

বললাম, 'একটা গান ই শোনালে না।'

বলল, 'শুনবে শুনবে, শনিবার, …… দারুণ সুর,……বাপির দেয়া।' খুশীতে উজ্জ্বল রুণা কুমার।

পাশে পাশে এতক্ষণ রেলের ট্র্যাক্‌ সাথী ছিল। হঠাৎ সে রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকে তের্‌ছা একটা রাস্তায় গাড়ী টার্ণ করল রুণা।

গাড়ীটা একটু এগিয়েই ডেড্‌ স্টপ্‌ করল অন্য গাড়ীর ভিড়ে।

ওই তোমার জুহু বীচ্‌। ওই দুটো হোটেল চিনে রাখো, সান্‌-এন্‌-স্যাণ্ড আর এটা প্যালেস্‌ অজন্তা।' ফাইভ্‌ স্টার সন্দেহ নেই ! বেশীও হতে পারে !

বীচে অসম্ভব ভীড়। এই রোদে বিকিনি আর মিনিতে ছেয়ে ফেলেছে চারদিক। সব ঘুরছে জোড়ায় জোড়ায়। সন্ধ্যের পর এখানে কী অবস্থা

হয় ? দেশী কোন ভাবই এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানুষ ছাড়া আছে ঘোড়া আর উট। অনেকে তাইতে চড়ছেও পয়সা দিয়ে। খাবারের মধ্যে সবচেয়ে যেটার প্রাধান্য সেটা ফুচ্‌কা (কলকাতার কলেজি পাঠিকা খুশি হবেন)!

অনেক জোড়ার ভীড়ে আমাদের জোড়াও মিলে মিশে গেল! হাত ধরাধরি করে ঘুরতে দারুণ লাগে। সোনালী বালির ওপর একজোড়া প্রায় বিবস্ত্র নর নারী সান্‌ বাথ্‌ নিচ্ছে। তাকাতে সংকোচ হয় কিন্তু চোখ টেনে নেয়। হাঁটতে হাঁটতে একদম সমুদ্রের কিনারে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে অনেকক্ষণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকল বুণা। সূর্যাস্তের একটু আগে চক্‌চকে কালো সমুদ্রের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে বুণা তার খস্‌খসে সংযত কণ্ঠস্বরে বলল, 'একটু নীচু হও।' আমি ভাবলাম কিছু বলবে বোধহয়। গভীর করে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে-ই টুক্‌ করে সরে গিয়ে অন্যদিকে মুখ করে বলল, 'আই লাভ্‌ ইউ রাজা।' বিদ্যুৎ-পৃষ্ঠের মত চম্‌কে অনুধাবন করলাম কথাটা। অনাস্বাদিত পূর্ব এই শব্দগুলো অসম্ভব আলোড়ন সৃষ্টি করল চারদিকে—আই লাভ ইউ···আই লাভ ইউ··· লাভ ইউ······ইউ দূরে প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে লাগল। কি করা উচিত জানি না। পেছনে এসে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রেখে ডাকলাম বুণ্‌!' ঘুরে দাঁড়িয়ে···পায়ের কাছে অশান্ত সমুদ্র যেমন আছড়ে পড়ছে—তেমনি আমার বুকে, গলায় অসংখ্য অজস্র ভালবাসা জানাতে থাকল বুণ্‌। এ দৃশ্য এখানে হয়তো নতুন নয়। তাই কেউই বিশেষ তাকিয়ে দেখল না ব্যাপারটা।

বুণার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে মনে হ'লো আমি কত বড় হয়ে গেছি, শিরদাঁড়ায় কেমন একটা কন্‌ফিডেন্স অথবা পার্সোনালিটি আমাকে আরো উঁচু করে দিয়েছে। বাচ্চা মেয়ে বুণাকে প্রায় শূন্যে তুলে সমস্ত জহু বীচ্‌টা চষে ফেলতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে চীৎকার করে সবাইকে বলি, 'ল্যুক্‌ এ্যাট হার, শী ইজ মাইন '

হাঁটতে হাঁটতে একসময় সমুদ্রের একটা খাঁজ ঘুরে ওপারে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখানে জহুর কোলাহল অতটা আসছে না। 'এ জায়গাটাকে চারবাংলা, আর একটু দূরে ওটাকে সাত-বাংলা বলে, বুণা জানাল। মাঝামাঝি একটু ফাঁকা জায়গায় বসে পড়ি। নাকে মাছের তীব্র আঁসটে গন্ধ ভেসে আসছে। সামনে জলের বাঁকে জাল দিয়ে মাছ ধরছে জেলেরা বীচে অনেক মাছ জড়ো করাও আছে।

নিঃশব্দতা ভেঙে বললাম। 'এখানে বড় আঁসটে গন্ধ!'

নিজের রুমালটা আমার নাকে চেপে ধরে বলল, 'এই গন্ধটা ?'

১৩

মিষ্টি গন্ধে মাছের গন্ধ চাপা পড়ল।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

চোখে চোখে তাকিয়ে রুণা বলল, 'তুমি আজ রাতেই বাপির কাছে প্রপোজ্ করবে।'

মনে হ'লো মা-র কাছে সালঙ্কারা লাল বেনারসী পরা রুণাকে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়ে বললাম, 'এই নাও মা, তোমার বৌ। মা-র যারপর নাই আশ্চর্য হওয়ার চেহারাটা দারুণ ভেসে উঠল, চোখের সামনে।

রুণা আমার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে আস্তে করে আমার বুকে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমাকে প্রথম দিন দেখেই আমার মনে হয়েছিল —' গালে গাল ঘসে, গলায় চিবুকে এবং ঠোঁটে নিবিড় আলপনা এঁকে দিতে লাগলো রুণা। ওর সমস্ত শরীরটা নিয়ে আস্তে আস্তে আমাকে গ্রাস করে ফেলল। দারুণ উত্তেজনায় ও আমাকে আদর জানাতে জানাতে আমার দেহের সাথে মিশে যেতে লাগল। হঠাৎ উপলব্ধি করলাম আমার গুটিয়ে থাকা পুরুষ সত্তাটা জেগে উঠছে। বুঝলাম ঘুম ভাঙছে। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা দেহ, পৃথক সত্তা দমকে দমকে এক হয়ে যেতে লাগল। আমি যেন একটা গভীর গিরিখাতের ভেতর, সমুদ্রগর্ভের ভেতর, ধীরে ধীরে প্রবেশ করে হারিয়ে যেতে থাকলাম। এমনি করেই দু'জনে মিলে একা হয়ে গেলাম। এমনি অনেকক্ষণ, একা একা থাকতে থাকতে আস্তে করে রুণার উদ্বেলিত, মুক্ত দেহ থেকে, নিজেকে আলাদা করে নিলাম। তারপরে-ও বহুক্ষণ মুক্ত আকাশের নীচে চিৎ হয়ে রুণার বাহুলগ্না হয়ে শুয়ে থাকলাম। সমস্ত জুহু বীচ্‌টাকে মনে হ'লো যেন ইন্দ্রপ্রস্থ। শচীদেবীকে নিয়ে আমি শচীকান্ত…।

৩২

এ আস্বাদন আমার অকল্পনীয়। বিশ্বাস করুন পাঠক, এসব আমি চাইও নি। রুণার সাথে জোরে আমি কিছুতেই পারছিলাম না। প্রথমে তো রেজিস্‌ট্যান্স দিচ্ছিলাম-ই, হ্যাঁ! রুণাকে অনেক বাধা দিচ্ছিলাম! কিন্তু ও তখন জ্ঞান-বৃক্ষের ফল আমাকে খাওয়াবেই। কি করি বলুন এত জেদী মেয়ে! আর তাছাড়া এটাও ভাবুন, ক'দিন আগেই আমার কী জ্বর হয়েছিল? ফ্লু হ'লে শরীর দুর্বল হয়ে যায় না?

ফিরতে রাত হয়ে যাবে। আমার পাটভাঙা পাঞ্জাবীর দশা দেখে আর কী করব? বুণা তার ট্রাউজারের চেন্-টেন্ টেনে, সার্ট গুঁজে, ঝেড়ে-টেড়ে ফিট্‌ফাট্ হয়ে গেল। গাড়ীর কাছে আসা পর্যন্ত ও সম্পূর্ণ আমার উপর ভর দিয়ে কণ্ঠলগ্না হয়েই থাকল।

পথটায় কোন কথা হয় নি! দাদারে বাড়ীর কাছাকাছি এসে বুণা অস্পষ্ট গলায় বলল, 'আমার একটা কথা রাখবে রাজা…।'

—'বল।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'থাক পরে বলব।'

—'কেন পরে কেন? এখ'ন বল না।' ও চুপ করে গাড়ীটা বাগানের ভেতর ঢোকাল। কি একটা কথা যেন বলি বলি করেও বলল না। গাড়ীটাকে স্পীডের ওপর রেখে ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দিল। ক্রমশঃ ধীর, মসৃণ নিঃশব্দ গতিতে, পোর্টিকোর একটু দূরে গাড়ীটা গড়িয়ে এসে দাঁড়াল। 'নামবে না?' গাড়ী থেকে নেবে বলি।

—'না:।' ভারী গলায় বুণা বলল, 'আজ থাক, কাল সকালে ফোন করব, থেকো।'

—'কথাটা বললে না কিন্তু—।' হেসে বলি।

—'শনিবার আমার জন্মদিন—' হাসতে হাসতে বুণা বলছে—।

—'হ্যাঁ, মনে আছে—।'

—'কি দেবে আমায়?' বুণার প্রশ্নমাখা ভুরু যুগলের দিকে চেয়ে ছলাৎ করে উঠল বুকটা। সত্যি তো ওকে কি দিই? বেশী টাকাও তো নেই সঙ্গে। আমার সাথে ওর এখন এই মুহূর্তে যে সম্পর্ক, তাতে এমন একটা কিছু দেয়া উচিত, যার একটা, বিশেষ মূল্য থাকে—। কিন্তু সেটা কী?! কথাটা লিখতে যত সময় লাগল, ভাবতে তার একদশমাংশ সময়েই কুলিয়ে গেছে! কিছুই কিনারা না করতে পেরে বুণাকেই প্রশ্নটা উল্টে দিই—'তোমাকে কি দেব সেটা তুমি-ই বলে দাও।' দরজার ওপর রাখা ওর হাতের ওপর হাত রাখি। ও একটু কি ভেবে দরজা খুলে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে এক দীর্ঘ চুম্বনের পর ফের গাড়ীতে উঠে বলল, 'তুমি শনিবার বাপির কন্ট্রাক্ট-ফর্মে সই করে দেবে।' কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে জুহু বীচের আঁসটে গন্ধটা এসে ভঁক করে নাকে ঢুকল! সমস্ত জুহু বীচ্‌টাকে চোখের সামনে ঝলসে উঠতে দেখলাম। একটা ওপন্‌এয়ার ব্রথেল ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না এখন। অথচ এই ক'ঘন্টা আগেও স্বর্গোদ্যান, না কি যেন মনে হচ্ছিল? ওখানে শুধু বিনিময় হয় টাকার সাথে সুযোগের, টাকার সাথে দেহের, দেহের

বিনিময়ে সুযোগের···নোংরা ! ঘেন্না হয় ! ঘেন্না হচ্ছে নিজের ওপর। বড্ড অশুচি লাগছে নিজেকে, বড্ড নীচু হয়ে গেলাম নিজের কাছেই। কলকাতায় ফিরে গিয়ে মা-র সামনে কি করে মুখ উঁচু করে দাঁড়াব ! মনে হচ্ছে সমস্ত শরীর বেয়ে গলিত কুষ্ঠের মত কি একটা দুর্গন্ধবাহী স্রোত নামছে। মাথায় হু হু করে রক্ত ছুটছে।

৩৬

দূরে গাড়ীর লাল আলোটা বাঁক নিতে, অবস্থাটা উপলব্ধি করলাম। ঘুরে পোর্টিকোর তলায় ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালাম। একটু দম নিয়ে, স্বাভাবিক হয়ে নিয়ে, ক'টা সিঁড়ি টেনে টেনে টপকে কলিং বেলে হাত দিতে গিয়ে চমকে উঠলাম ! ভেজানো দরজার সাথে ছায়ার মত মিশে দাঁড়িয়ে আছে বন্দনা ! দরজার ফাঁক দিয়ে যে লম্ব আলোক রেখা, বন্দনার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা সরলরেখায় আলোকিত করেছে ; তাতে স্পষ্ট দেখলাম ওর বিস্ফারিত দুই চোখে জলের ধারা ! আমি কোন কথা বলতে পারছিলাম না। ওর চোখের জলের কারণ-ও খোঁজার মত মনের অবস্থা নেই। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম শুধু। বন্দনা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে চলে গেল। মাথায় রিন্-রিন্ শব্দ নিয়ে, ভেতর দিকে পা বাড়ালাম।

ঘরে আয়নার সামনে এসে আবার ও ভয় পেলাম। আমার গলায়, বুকে রক্তের দাগ ! মাথার চুল উশকো খুশকো ! একটা লম্পট ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না, প্রতিবিম্বটাকে। একটু চুপ করে বসে থেকে লিপস্টিক মাখা ক্রেপের জামাটা সুটকেসে ঢুকিয়ে রাখলাম। খুনের সাক্ষ্য-প্রমাণ লোপ করার চেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠলাম হঠাৎ। ভাল করে সাবান দিয়ে ঘসে ঘসে স্নান করে নিলাম। তবুও অশুচি ভাবটা কিছুতেই কাটাতে পারলাম না।

হাতে মুখ গুঁজে টুলটায় বসে থাকলাম খানিকক্ষণ। কিছুক্ষণ ভাবলাম। ভাবতে ভাবতে সমস্ত ব্যাপারটা কেমন পরিষ্কার হয়ে গেল।

যে কোন কারণেই হোক আমার মুখটা বসন্তকুমারের ছবির জন্য খুবই দরকার। সে আমি বক্স-অফিসের হিট্ করা কন্‌ভেন্‌শনাল্ নায়ক না-ই-বা হলাম। তাই টাকা দিয়ে যখন হলো না, তখন মেয়েকে দিয়ে—!! রুণা সেটা বুঝেছিল। রুণার মত মেয়েরা সব পারে। ওর পক্ষে, এই ন্যাচারাল্ প্রেমের অভিনয়ে মুগ্ধ করে, বাজী জিতে নেয়া কিছু-ই না। বাপির কাছে

হয়তো চ্যালেঞ্জ্ নিয়েছে সে ! এ-কাণ্ডটা আড়ালে আড়ালে করতে সুবিধে বলেই, মেরীন্ ড্রাইভ-এ গিয়েও নিজের বাড়ীতে নিয়ে যায় নি বুণা ! অথচ নিয়ে যাওয়াটাই অন্য অবস্থায় স্বাভাবিক হ'তো। দূাৎ, আর ভাবতে ভাল লাগছে না ! ঘরে কেউ একজন ঢুকছেও না যে, কথা বলে একটু অন্য-মনস্ক হবো।

ঠিক দশটায়, খেতে ডাকতে এলো রাধা। তার ব্যবহারটাও স্বাভাবিক নয়। ছোট্ট, 'খেতে এসো।' বলেই পর্দা সরিয়ে ব্যস্ত পায়ে চলে গেল। দুপুরে খাওয়ার পর এতক্ষণ যদিও পেটে কিছু পড়ে নি, তবুও এখন কিছু খেলে বমি হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। মনের অবস্থা যথাসম্ভব ঢেকে নিয়ে নির্দিষ্ট চেয়ারে বসলাম। দুই মেসো আর ভিক্টর ছাড়া আর সবাই বসে-ছেন খেতে। বন্দনার মা বললেন, 'তোমার কি শরীর আবার খারাপ হ'লো নাকি রাজা ?'

—'ন্‌না তো।' মাথা নীচু করে খেতে খেতে, চম্‌কে মাথা উঁচু করে জবাব দিই।

—'তাহলে খাচ্ছ না কেন কিছুই— ?'

থালায় নজর দিলাম। রুটি আর মাংস ছিঁড়েছি বিস্তর, একটু করো মুখেও পুরেছি, কিন্তু সবটাই পড়ে আছে পাতে। মুখেরটাও চিবিয়েই যাচ্ছি, গিলতে পারছি না কিছুতেই।

—'খাওয়ার ইচ্ছে না থাকলে ওটা ছেড়ে দাও। এই ওকে একটু স্যালাড্ দে না রে।' কথাটা রাধাকে বললেন মনে হ'লো। উঠল কিন্তু বন্দনা ! এ'টো ডান হাতটা উ'চু করে, বাঁ-হাত দিয়ে ফ্রীজ্ খুলে একটা সাদা চিনামাটির বাটি এনে আমার পাতের কাছে রেখে বলল, 'সবটা খাবেন ?' অসম্ভব ভারী গলাটা শোনাল।

মাথা নেড়ে বললাম, 'না।' ফ্রুট্-স্যালাড্ পুডিং দিয়ে জমাট বাঁধানো।

রাধা বলল, 'আজকে কয়েকজন এসেছিলেন, তাঁদের জন্য একটু হাই-টি-এর ব্যবস্থা ছিল। এটা তার উদ্বৃত্ত। মা করেছেন—খাও।'

খেতে খুব ভালোই লাগল। খু-ব ঠাণ্ডা ছিল বলেই,—না কি যেন ?

কখন খাবার টেবিল ছেড়ে বিছানায় এসে পড়েছি খেয়াল নেই। অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় এপাশ-ওপাশ যুদ্ধ করে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম।

৩৭

সকালে ঘুম থেকে জেগেই খচ্ করে উঠল মনটা। যদিও একটা

ডিশিশন্ নিয়ে ফেলার রিলিফ বোধ, মনটাকে সংযত রাখছে ; তবুও এটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না যে অন্য সকালগুলোর মত রাত্রিশেষে জেগে পবিত্রতার সবটুকু, আমায় ছেড়ে চলে গেছে। বাথ্‌রুমে স্নান করতে গিয়ে আবার ফিরে এলাম। কেমন শীত শীত করছে। জল ছুঁতে ইচ্ছে করছে না।

নিঃশব্দে দরজা খুলে ড্রয়িং রুমে ঢুকলাম, ঘরে পাখাটা ঘুরছে। বন্ধ ঘরে সুইচটা খুঁজে নিতে হ'লো। তখনই হকার; খবরের কাগজটা জানালা গলিয়ে গেল ! ঘরে আর কেউ নেই ! সকালের খবরের হেড্‌লাইনগুলো চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি। এমন সময় ফোনটা সরব হ'ল। ফোনের অপেক্ষা আমিও করছি। তবে সেটা এতো সকালে আসবে না। কেউ-ই ঘুম থেকে ওঠেনি এখনো। রিসিভারটা তুললাম। ডায়ালে একবার চোখ বুলিয়ে নম্বরটা রিপিট করলাম, নীচু গলায়। একটু ইতস্ততঃ করে, একটি পুরুষ কণ্ঠ, খুব এ্যাপলজিটিক স্বরে বলল, 'রাধাকে একটু ফোনটা দেবেন ?' অবাঙালী অথবা প্রবাসী বাঙালীর সুর ধরতে পারলাম। বললাম, 'আপনার কী নাম বলবো ? ও ঘুমুচ্ছে তো।'

—'আমি শঙ্খ। বাই এনি চান্স, আর ইউ ফ্রম ক্যালকাটা ?' কথাটা যোগ করলেন ভদ্রলোক।

— হ্যাঁ-এ, বাই অল্ দা চান্সেস আই অ্যাম্ ফ্রম দ্যাট ওল্ড সিটি, বাট ! আপনি মানে হাউ কুড ইউ— !' অবাক-সূচক স্বর স্বাভাবিক ভাবেই ঝরে পড়ে।

— মাই লাক ! রাজাবাবু আপনাকে আমার খুব দরকার যে।' শঙ্খ ঘোষণা করেন।

—'কী রকম – ।' আতঙ্কিত-ই হই। বোম্বের ক'টাদিনের অভিজ্ঞতা খুব খরাপ না। রাজার সাথে বাবু কথাটা এই প্রথম শুনলাম !

—'আপনি রাধাকে কাইণ্ডলি একটু ডাকুন, পরে বলছি।' হঠাৎ মনে হ'লো রাধার ফিয়াঁসী নয় তো। রিসিভারটা আস্তে নাবিয়ে, লবি হয়ে রাধার ঘরের বন্ধ দরজায় নক্ করি। দু'বার শব্দ করতেই দরজা খুলে দিল বন্দনা। বন্দনার চোখ দুটোয়, রাত্রি-জাগরণের সাক্ষ্য। চোখের কোলে শুকনো নোনা জলের দাগ ! কাল রাতে ওকে কাঁদতে দেখেছিলাম মনে পড়ল কি হয়েছে বন্দনার ? ও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী হয়েছে ?'

বললাম, 'রাধা ওঠেনি ? ওকে একটু ডেকে দাও না, ফোন এসেছে।'

রাধা ঘুম থেকে বিস্ফারিত চোখে উঠে এসে বারান্দার পাশে হুমড়ি

খেয়ে এগিয়ে এসে আমায় দেখে বলল, 'কি হয়েছে রাজা ?'

—'এরকম আতঙ্কিত হচ্ছ কেন সবাই !' হাসতে হাসতে বলি। 'তোমার ফোন।'

—'কে চাচ্ছে ?'

—'শঙ্খধ্বনি।' চোখে চোখ রেখে বলি।

ও টুক্ করে জিভের ডগাটা কামড়ে বলল, 'চল।' পরক্ষণেই বলল, 'তুমি আমাদের ঘরে বস, আসছি এক্ষুনি।' রাধার ঘরে এই প্রথম ঢুকলাম। পিঙ্ক্ রঙের ডিস্‌টেম্পার করা। শৌখিন ইকাবেনা তিন কর্ণার টেব্‌ল্। দুটো সিংগল নীচু খাটের একটি রাত্রির আলিঙ্গনে তছ্‌নছ্। মাঝামাঝি দেয়ালের কাছে মস্ত বড় ড্রেসিং টেবল্। এপাশে দুটো কৌচ্। তারই একটাতে বসে, ঘরের মাঝখানে দাঁড়ানো বন্দনাকে ডাকলাম, 'এই, দাঁড়িয়ে কেন ? এখানে বস।' ও এসে আমার উল্টোদিকের খাটের মাথায় পা ঝুলিয়ে বসল। মাথা নীচু করে আছে।

—'তোমার কিছু একটা হয়েছে বন্দনা, তাই না ?'

বন্দনা চুপ।

—'আমাকে বলা যায় না ?' গলার স্বরে যতটা সম্ভব সহানুভূতি প্রকাশ করতে চেষ্টা করি।

বন্দনা চুপ।

—'কাল সন্ধ্যে থেকে কিছু একটা ঘটেছে, তাই না ?'

বন্দনা চুপ।

—'তোমরা সবাই একরকম, কিছু যদি ঘটে থাকে।' রাধার ধমকে দরজার দিকে তাকাই।

—'!, কেন ? কি হ'লো ? আমরা কারা, মানে কাদের কথা বলছ ?'

—'পুরুষরা আবার কারা—।' বিছানা দুটো তাড়াহুড়ো করে বেড্‌কভার চাপা দিতে দিতে রাধা জানাল।

—'শঙ্খ-নিনাদ-এর এফেক্ট্, আমার ওপর ঝাল ঝাড়বে নাকি ?' হেসে ফেলি।

—'আজ্ঞে না ওখানে অত সাহস নেই মশাই।' ভেঙ্‌চে ওঠে রাধা।

—'তাহলে অপরাধটা কে করল ?'

—'যদি বলি তুমি ?'

—'আমি ? আমার আবার কি দোষ হ'লো ?' মনে মনে শঙ্কিত-ই হই। কোনদিক থেকে আসে এ্যাটাক্—। যা একটা কিছু মেয়ে—!

—'একটা কথার সোজাসুজি জবাব দেবে ?'

—'বল !' থতমত খাচ্ছি মনে মনে।

—'বুণা, কে ? ওর সম্বন্ধে কতটুকু জানো ? তুমি কি ওর মত মেয়েকে নিয়ে সুখী হতে পারবে ?'

—'প্রথম দুটো একটু একটু হ্যাঁ। তৃতীয়টি, একদম না।'

—'না ?!' বন্দনা উঠে ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের দিকে হাঁটছে। রাধা বলে চলেছে। 'এ কয়দিন তো তা মনে হয় নি !'

—'কি করতে পারি ?'

—'আর কিছু না, পরিষ্কার পরিষ্কার কথা বললে, অন্ততঃ কারো চোখের জলে বিনিদ্র রজনী কাটাতে হ'তো না।' বাথরুমের দরজা সশব্দে বন্ধ হ'লো।

—'বন্দনা ? কেন ?' থেমে থেমে, বুঝে বুঝে, প্রশ্ন করি।

—বললাম না, তোমরা সবাই একরকম !' রাধা আমায় ভেঙচে দিয়ে, আয়নায় চুলটা একটু ঠিক করে, আয়নার ভেতর দিয়ে আমাকে একবার পর্যবেক্ষণ করে, ধাঁ করে বাইরে চলে গেল !

বন্দনা বাথরুম থেকে বের হবার আগেই তিন কাপ চা ছোট ট্রে-তে নিয়ে ঢুকল রাধা। চায়ে দু-তিন সিপ্ দিয়ে আমার চোখে চোখে তাকিয়ে বলল, 'আজও কি বাইরে বের হবার প্রোগ্রাম আছে ? থাকলে ফোন করে ক্যান্সেল্ করে দাও।'

—'নেক্সট্ ?'

—'আজকে আমার সাথে সারাদিন থাকবে। এটা শাস্তি।'

—'ডিভাইন্ জাজ্মেন্ট্।' কৌতুক করে বলি। বন্দনা একটু ফ্রেশ্ হয়ে এসেছে। চা-এ সঙ্গ দিতে দিতে দিনের প্রোগ্রামটা রাধার কাছ থেকে শুনল। মিষ্টি হেসে বলল, 'তাহলে তো আমরা অফিসের বাবুদের বিদায় করেই বেরিয়ে পড়তে পারি। দুপুরে শঙ্খর ঘাড় ভেঙে খাওয়া যাবে।'

৩৮

ড্রয়িং-রুমে, একটু পরে অফিস-যাত্রী দু'জন এবং কি একটা দেখতে যাবার জন্য বন্দনার বাবাও রেডী হয়ে বসেছেন। আমি ভিক্টরের সাথে কথা বলছি। দৃষ্টি একটু বাদে বাদেই ফোনের দিকে যাচ্ছে। ফোন একটা আসবেই, আমি নিশ্চিত জানি, সেটা বুণার নয়, হয়তো বুণার বাবার, এমন কি মা'র-ও হতে পারে।

এরপর মাসীমাদ্বয় এক-এক করে ঢুকলেন। তারপরেই দুই সখী। এখন একটু উৎফুল্ল দেখাচ্ছে বন্দনাকে। বন্দনার ব্যাপারটা পরে জিজ্ঞেস

করে জানতে হবে। 'তুমি কি করবে আজ ?' রাধার বাবা জিজ্ঞেস করেন। 'কিছু করার নেই, বাড়ীতেই থাকবো ভাবছি।' আতঙ্কিত রাধার কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞ হাসিটা চট করে দেখে নিলাম।

—'নো আউটিং ?' মিঃ তালুকদার দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন।

—'আজকে—আর ইচ্ছে করছে না।' মুখে টায়ার্ড ভাবটা, যতটা সম্ভব ফোটাই।

মাসীমাদ্বয় প্রায় একই সঙ্গে বলে ওঠেন, 'না, না, থাকনা, জ্বর থেকে উঠে ক'দিন খুব স্টেন হচ্ছে—আর না।' মাসীমার দরদ দেখে, আন্তরিক ভাবেই মা'র কথা মনে পড়ে। মা ঠিক এমনি করে সাবধান করেন।

ভিক্টর উঠে গিয়ে গ্যারাজ থেকে গাড়ীটা বের করে আনল পোর্টিকোর তলায়। নেবে এসে টেবিলের ওপর রাখা পোর্ট-ফোলিওর ভেতর থেকে একটা ছোট ফোন গাইড টেনে একটা নাম্বার মুখস্থ করতে করতে ফোনের দিকে এগোতে লাগল। প্রথম চেষ্টায় কানেক্শন্ পেলো না, দ্বিতীয়তেও নয়। তৃতীয়বার ডায়ালের ফুটোয় অঙুল ঢোকাবার সঙ্গে সঙ্গে ফোন্টা জু-জু জু করে বেজে উঠল। আমার সম্পূর্ণ চিন্তাটা দানা বেঁধে গেছে রিসি-ভারটা ঘিরে। এবং ফোনটা আমার! হাতে রিসিভারটা নিয়ে, আমাকে ইঙ্গিতে বোঝাল ভিকু। নিঃশব্দে উঠে ওর হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে সংযত-ভাবে বললাম 'চৌধুরী বলছি।' ও-পাশ থেকে বসন্তকুমারের পরিচিত কণ্ঠটা, একেবারে আনন্দে ফেটে ফেটে পড়ছে। যেন কী একটা দারুণ কিছু আবি-ষ্কার করে ফেলেছেন!

বললেন, 'রাজা! তোমার কথা ক'দিন থেকে দারুণ ভাবছি কাল সন্ধ্যেয় তো দেখা হচ্ছেই তাই আজ আর ডাকছি না—ইয়ে হয়েছে কি তোমার কলকাতার ঠিকানাটা যে লাগবে একটু—।'

—'ঠিকানা ?'

—হ্যাঁ, বল, দাঁড়াও, হ্যাঁ ঠিক আছে বল। আগে বাবার নাম বল।'

—'লিখুন'—নিশ্চিন্ত সুরে বলি 'সৈয়দ্ আব্দুল রেহ্মান চৌধুরী।'

—'এ্যাঃ কার নাম এটা—?' ওপাশ থেকে অবাক-সূচক শব্দ ভেসে আসে।

—'আমার পিতৃদেবের নাম-ঠিকানাই চাইলেন তো ?'

—'হ্যা—ইয়ে—।'

—'ঠিকানাটা—টুয়েন্টি ফোর্ বাই ফাইভ্ এ…' কথাটা শেষ করার আগেই উনি বললেন—

—'আচ্ছা। ঠিক আছে, কাল কথা হবে—ইয়ে—হ্যা, ছাড়ি তাহলে!'

১৪

কানেক্‌শন্‌টা কেটে যায়। একটু হেসে ফোনটা নামিয়ে রাখি। ঘরে তখন অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছে। সবাইকার আশ্চর্য এবং জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে বেশ স্বাভাবিক রেখেই যথাস্থানে এসে বসলাম। ভিক্টরও এমন অবাক হয়ে গেছে—ও যে ফোন করতে গিয়েছিল সেটাও বেমালুম ভুলে গেল। সবাকার অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে আমি-ই উদ্ধার করি। বলি 'বসন্তবাবু ফোন করেছিলেন। কাল সবাইকে যাবার অনুরোধ আবার করলেন।' 'সবাইকে' কথাটা আমি ই এ্যাড্‌ করলাম, নইলে ভাল দেখায় না।

মিঃ সিংহী আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারলেন না—'তোমার বাবার নাম বললে, ফোনে ?'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম কথাটার।

—'তোমার পুরো নামটা কী তবে ?' দ্বিধায় পড়ে গেছেন, সন্দেহ নেই।

—আমার নাম জানেন তো (!), পোষাকী নাম একটা আছে অবশ্য। রহিমিয়ার রেহ্‌মান্‌ চৌধুরী !!' অবাক হয়ে বলি।

বন্দনা, রাধা, মাসীমাদ্বয় তখনো অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে। আমি একটু ইতস্ততঃ করে বলেই ফেললাম—'আপনারা কি জানতেন না ! না জেনে আমার সাথে এক টেবিলের ছোঁয়া জিনিস খেয়েছেন—এতে কি জাত গেছে—মাসীমা, আমি—'আমার লজ্জিত ভাবটা ধরে ফেলে সবাই প্রায় সমস্বরে বলে ওঠেন 'না, না ছিঃ ছিঃ। আমাদের ওসব প্রেজুডিস্‌ নেই—ওসব কোন ব্যাপারই নয়।' সবাই হেসে ব্যাপারটা কিছুই নয় এমনি ভাব দেখাতে সচেষ্ট হলেন।

আমিও অ-স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম ! দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে ভিক্টর তাগাদা লাগাতেই দুই মেসো উঠে পড়লেন। গাড়ীটা বেরিয়ে যাওয়ার আওয়াজ অস্তে ক্ষীণ হয়ে এলো।

আমার ইচ্ছেয় সবাই আরেক রাউণ্ড্‌ চা খেয়ে নিলেন। এবার দুপুরের প্ল্যান্‌টা রাধা তার মাকে বলল, 'ঘরে বসে আর কি করবে রাজা, বরং আমরা ওকে নিয়ে কাছেই বের হই, বিকেল থাকতেই ফিরে আসব, হ্যাঁ, মা ?'

—'কোথায় যাবি ?' মাসীমা আহ্লাদে মেয়েকে শাসনের ভঙ্গীতে বললেন।

—'এই দাদারেই বন্ধুদের বাড়ী ওকে নিয়ে যাই।'

—'খেয়ে বের হ তাহলে, রাজার রেস্ট্‌ নিলেই ভাল হতো ও কাল রাতে কিছুই খেল না। ওর শরীরটা না আবার খারাপ হয়।'

—'রাখ তো, অত তুক্‌তুক্‌ করো না তো। ও কিছু কচি খোকা নয়

মা।' রাধার ঝগড়ায় আমি, বন্দনা বেশ উপভোগ করতে থাকি। মাসীমা (হোমিওপ্যাথ) সকৌতুক বললেন, 'এই রাধা বল না যার চেয়ে যার দরদ বেশী তারে বলে—?'

মাসীমা (এ্যালপ্যাথ) এক ধমকে বোনকে থামিয়ে দিলেন, 'থাম্ মুখপুড়ি, তুই আবার ওদের দলে ভিড়লি, বিভীষণ কোথাকার।'

হাসির আওয়াজে বাড়ীটা সরগরম হয়ে ওঠে।

৩৯

আমরা চট্ করে রেডী হয়ে নিতে, যে যার ঘরে দরজা বন্ধ করলাম। পোষাক পাল্টাচ্ছি, দরজায় কেউ আস্তে টোকা দিল মনে হ'ল। দরজাটা খুলতেই হুট্ করে বন্দনার মাসীমা ঘরে ঢুকেই দরজাটা ফের আটকে দিলেন। আমি কিছু বোঝার আগেই বললেন। 'একটা সত্যি কথা বলত মাসীকে? তোমরা কোথায় যাচ্ছ?' বেশ চাপা সুরে কথাটা শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

—'তাই বলুন। এমন ঘাবড়ে দিয়েছিলেন! আমরা তো রাধার কোন্ বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছি;—রাধা বলল না?'

—'মাসীর সাথে শঠতা করতে নেই। তুমি জান। তার নামটা কি—শঙ্খ ঘোষ?'

—'হ্যাঁ, তাই বোধহয়।'

—'ওই ছোঁড়াটা রাধাকে অনেকদিন তুক্ করেছে—' তারপর ঝট্ করে আমার কাঁধটা ধরে বললেন, 'তুমি একটু ভাল করে যাচাই করে দেখবে রাজা—সত্যি-ই ওরা সুখী হবে কি না!'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

—'ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করবে, ওদের কতখানি সিন্সিয়ারিটি আছে। এ বয়সের ভালবাসা তো আবার ঝট্ করে আসে, ঝট্ করে যায়।'

—'ঠিক আছে মাসীমা, আমি কথা দিচ্ছি আমি ইম্পার্শিয়াল্ ওপিনিয়ন্ দেব। মাসীমা 'থ্যাঙ্কু' বলে যেমন এসেছিলেন তেমনি পালিয়ে গেলেন সকলের অজান্তে!

৪০

আমরা বেরিয়েই একটা ট্যাক্সি পেলাম। তিনজনই পেছনে বসে বক্ বক্

করতে করতে 'সমুদ্র-সন্তানের' ফ্ল্যাটে পৌঁছলাম। ভারি হ্যাণ্ডসাম্, শঙ্খ। এক মুহূর্তে আপন করে নেয়া স্বভাব। মা নেই, বাবা আছেন। তিনিও থাকেন কলকাতায়। একমাত্র সন্তান, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়র। ভারত রিফাইনারীজে কাজ করে। মনে পড়ল কারি'ভয় রোডে, ব্যালার্ড এস্টেটে ভারত রিফাইনারীজের বাড়ীটা দেখেছি, বোটহয় পাঁচ না ছ' নম্বর বাড়ী। মা কন্‌ভার্টেড্ খৃষ্টান, বাবা দু-পুরুষের বাঙালী খৃষ্টান। ক্রিশ্চয়ান্ কাল্-চার্ থেকে, বাড়ীতে বাঙালী হিন্দু-পরিবারের কালচারটাই বেশী প্রকট। 'সত্যি কথা বলতে কি খৃষ্ট্‌মাস্-ডে ছাড়া আর কোথায় ধরে রাখতে পারিনি যীশুকে।' হাসতে হাসতে বলল শঙ্খ, ওরফে মাইকেল অলিন্স্।

হাতের চেটোটা আমার সম্মুখে মেলে ধরে বলল, 'বল তো গুরু, আর কতদিন কষ্ট করতে হবে, জীবনে?'

হাতের রেখাগুলো একটু দেখে নিয়ে বললাম, 'খু-ব কষ্ট কিছু এখন করছ নাকি?'

ও বলল, 'দ্যুৎ, শালারা—' বলেই রাধার কট্‌মটে চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'থুড়ী, ব্যাটারা কিছুতেই একটা প্রমোশন্ দিচ্ছে না। শালা—দ্যুত্তোর—মান ইজ্জৎ আর থাকল না।' ওর কথার ধরণে না হেসে থাকা যায় না। রাধা রান্নাঘরে ঢুকেছে। বন্দনা মাঝে মাঝে এসে শঙ্খকে 'জামাই' সম্বোধনে এটা-ওটা শালীসুলভ চপলতা দেখিয়ে যাচ্ছে।

মিষ্টি ফ্ল্যাটটা হৈ চৈ করে মাতিয়ে ফেলল শঙ্খ। খেতে বসেও আটবার শ্যালক ও একবার বোকা-সী বলে জিভ কেটেছে এবং রাধার কাছে আটবার মাফ্ চেয়েছে। এ্যাড্‌জেক্টিভ্‌গুলো স্বভাবতঃই ওপরওয়ালার জন্য, এক-আধটা অবশ্য বোম্বের তথাকথিত সমাজকে উদ্দেশ্য করে-ই। বাজারের মাছওয়ালা কী একটা বলতে গিয়ে অস্ফুট উক্তিও করেছে। বোঝা না গেলেও ওর বলার ধরণটা দেখে না হেসে পারা যায় না। মাছটা খুব ফ্রেশ্ ছিল না।

খাওয়ার পর আড্ডা হচ্ছে মেঝেতে বসে। রাধা বলল, 'তোমার হরস্কোপটা কোথায়?'

—'আমি কি জানি, গুছিয়ে যাও তো তুমি, তারপর আর কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না।' শঙ্খ অভিযোগ করল।

—'ও আচ্ছা ঠিক আছে, ওই রকম-ই থাক, আমি যদি আর হাত দিই তো আমার নামে কুকুর রেখ।'

ইয়ার্কি করতে করতে হঠাৎ সিরিয়াস্ হয়ে ওঠে রাধা। বন্দনা মাঝে মাঝে বোনকে সামলায়—'এই থাম্‌না কি হচ্ছে'···ইত্যাদি বলে।

যখন অবস্থা তুঙ্গে, হঠাৎ 'দেহি-পদপল্লবমুদারম্' ভঙ্গিতে সটান লম্বা, উবু হয়ে রাধার পা জড়িয়ে ধরল শঙ্খ! 'মুঝে মাফ্ কর্ দো ভাই।' 'মাফ্ কর্ দো...' 'মাফ্ কর্ দো' বলে মাথাটা সত্যি সত্যি জোরে ঠুকতে লাগল রাধার পায়ে। আমি আর না পেরে বললাম, 'রাধে—তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে কেমন করে সইবো? একটা কম্প্রোমাইজ কর ডিয়ার—এতো খাওয়ার পর, আমার এখন হস্পিটালের মাথাভাঙ্গা-ওয়ার্ড-এ দৌড়তে মোটেই সাধ নেই।'

অগত্যা ট্রিটী হ'লো। শঙ্খ আর 'শ'-কারান্ত কোন শব্দ ব্যবহার করবে না। রাধা যেভাবে চলতে বলবে তাই মেনে চলতে হবে। এবং তিন নম্বর, অন্য কোন স্ত্রীলোকের দিকে ভুলেও তাকাবে না। অপর পক্ষে রাধা ফ্ল্যাটটা যেমন গুছিয়ে দিয়ে যায়, চাকরটাকে ধমকেটমকে যায় সে সব করে যাবে; এবং সপ্তাহে দু'দিন রান্না করে দিয়ে যাবে,— ফ্রীজ্ থেকে বের করে, গরম করে খেয়ে নেবে শঙ্খ। এরপরেও শঙ্খ একটা তৃতীয় নম্বর রাখতে চেয়েছিল, যেটা রাধা ভেটো দিয়ে দিয়েছে! সেটা হচ্ছে, রাধা তাকে আর শাসন করবে না।

অলিন্সের হরোস্কোপ্টা পাশের ঘর থেকে রাধা-ই বের করে নিয়ে এলো। আমাকে হলুদ রঙের পাকানো রোল ধরিয়ে দিয়ে, আগ্রহে বসে পড়ল মেঝেয়। বন্দনা হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় বলে উঠল, 'ট্রেনের ওই সাউথ্-ইণ্ডিয়ান্ মেয়ে দুটোর হাত দেখেছিলেন আপনি?' হাসতে হাসতে চোখ টিপে বললাম, 'হ্যাঁ, কেন?' বন্দনা বলল, 'ওরা—জিজ্ঞেস করছিল সত্যিই আপনি জানেন কিনা, বলছিল আপনি নাকি ফী চেয়েছিলেন হামিজ্!?'

শঙ্খ আর আমি হেসে উঠি, চীৎকার করে। রাধা ঈষৎ লজ্জিত।

হাসি থামিয়ে বলি, "বলেছে বুঝি?' 'আমি তো ওদের কলকাতায় ফিরে গিয়ে কোন বাঙালী বন্ধুকে জিজ্ঞেস করতে বলেছিলাম!' আবার অট্টহাস্য করে ওঠে শঙ্খ। —'হামিজ্টা কি জিনিস?' বন্দনা গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করে।

রাধা ওকে একটা চিমটি লাগায় লুকিয়ে!

শঙ্খ অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, 'ট্রিটী অনুযায়ী তোমার দিকে তাকানো নিষেধ পেয়ারে, নয়তো জিনিসটা কি, আমি বোঝাতে পারতাম।'

—'শাট্ আপ্।' রাধা কপট ধমক দেয়। বন্দনা কিছু কিছু আন্দাজ করে চুপ করে যায়। এবং হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে কী ভাবতে থাকে। দৃশ্যটা আমার দৃষ্টি এড়ায় না।

হরোস্কোপ্ দেখে-টেখে বললাম, 'তোমার উর্ধ্বতন কর্মচারী, যাঁর ওপর তোমার প্রমোশন্ আটকে আছে, তিনি কি মহিলা ?'

ও অবাক হয়ে বলল, 'ওপরে একজন মহিলা আছেন ঠিক। তিনি-ই বাগড়া দিচ্ছেন ?' বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকে শঙ্খ।

—'না, তবে তাঁকে ঠিকমত ধরলে কাজ হবে মনে হয়—তোমার ব্যাকিং একজন মহিলা।'

—'লাভ নেই—।' কেমন হতাশ হয়ে পড়ে শঙ্খ।

—'কেন ?'

—'ট্রিটী অনুযায়ী অন্য কোন মহিলার দিকে তাকান বারণ।' ধীরভাবে ছাদের দিকে তাকিয়ে বলে।

—'এ্যাই, আমি তাই বলেছি—' রাধা এক ধমক লাগায়।

—'স্যরি। তা নয় ?! ও আচ্ছা।'

বন্দনা তখনও কি ভাবছে।

বিকেলের কফি পান করতে করতে ফের এ্যাস্ট্রলজি আসে।

বলি, 'বার বছরে বৃহস্পতি একবার ঘুরে আসে। সেই হিসেবে আগামী মাসে তোমার লগ্নে বৃহস্পতির প্রবেশ। তখন থেকে ছ'টা বছর তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

যা'হোক কথামত বিকেল থাকতেই আমরা উঠলাম। ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে হাত জোড় করে আমায় বলল, 'প্লীজ রাজা, এ্যাক্সেপ্ট্ মাই ফ্ল্যাট এজ্ ইয়োর কিংডম্, হোয়েন্ ইউ কাম্ নেক্সট—প্লীজ।' দু'বার প্লীজ দিয়ে কথাটা শেষ করেই, বন্দনার দিকে একই রকম হাত জোড় করে বলে, 'কাকীমাদের আর কাকাদের আমার নমস্কার জানাবে—বলবে আমি শিগ্‌গির একদিন টোপর পরে তাঁদেরকে অন্তত একটি কন্যা-দায় থেকে উদ্ধার করে আনবো।'

—'এ্যাই,' রাধা এক ধমক লাগায়—'ও'রা আবার তোমার কাকা-কাকীমা হলেন কবে থেকে—মাসীমা, মেসো এই তো বলতে ?'

কানদুটো নিজ-হাতে মোলে, আবার হাত জোড় করে বলল, 'ট্রিটী অনুযায়ী স কারন্ত শব্দ বলা বারণ তো ?' ট্যাক্সিটা স্পীড্ নেয়!

৪১

ওরা ভেতরে চলে গেছে। আমি পড়ন্ত রোদে দাঁড়িয়ে বাগানটায় ঘুরছি, বন্দনার মাসীমা বাগানে এসে, যেন ফুলগাছগুলোর ঠিক যত্ন হচ্ছে

কিনা দেখছেন—এমনি ভঙ্গীতে আমার কাছে চলে এলেন।

—'কী রকম দেখলে ?' সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে রাধার ডাকে আবার তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেলেন। আমিও, আর কি করি, নিজের ঘরে ফিরে গেলাম।

সন্ধ্যেবেলায় ডাক পড়তেই ডায়েরীটা স্যুটকেসে ভরে ড্রয়িং-রুমে এসে উপস্থিত হ'লাম।

ভিক্টর ফেরেনি যথারীতি। দুই মেসো বসে। আমি ঢোকার পর কলকাতার মাসীমা আর ভগিনীদ্বয় আসন গ্রহণ করল। এটা-সেটা কথার পর মিঃ পি.বি. বললেন,

—'ইয়ে, কিছু মনে যদি না করো, মানে, কথাটা যদি অন্যভাবে না নাও—'

—'অত কিন্তু কিন্তু করছেন কেন মেসোমশাই, বলুন না কথাটা—' জোর দিয়ে বলি।

একটু হেসে কি ভেবে নিয়ে বললেন, 'যতদূর মনে আছে, ট্রেনে তুমি বলেছিলে—মানে একটা খট্‌কা লাগছে ব্যাপারটায়—তুমি তো সোমেশ্বর স্টেটের—ইয়ে, মানে, ইউ হেইল্ ফ্রম দ্যাট ফ্যামিলি—তাই না ?'

মাথা নেড়ে ঈষৎ হেসে মেনে নিই। ঘরের সবাই, মিঃ তালুকদারও অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে আবার পড়ে যাচ্ছেন যে, সেটা তাঁদের মুখ দেখেই মালুম হচ্ছে। সকাল থেকে মিঃ পি.বি. কথাটা নিশ্চয়ই অনেকবার ভেবেও কিনারা করতে পারেন নি। তাই অস্বস্তি চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেসই করে ফেললেন,

—'তোমাদের ফ্যামিলিটাতো-হিন্দু ফ্যামিলি তাই না ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, অরিজিন্যটা তাই, তারপর দুটো ব্রাঞ্চ হয়—'

মিঃ তালুকদার এবার ইন্টারেস্টেড্ হয়ে পড়েন, 'কী রকম, একটু খুলে বল তো—বেশ ইতিহাস-ইতিহাস গন্ধ পাচ্ছি।'

হেসে বলি, 'হ্যাঁ, ছোট্ট একটু ইতিহাস।' ঘটনাটা এইরকম আর কি,—ঔরংগজেব্ ইস্‌লাম্ ধর্ম দিয়ে একজাতি একপ্রাণ করতে চেয়েছিলেন না ! তারই ভিক্টিম্ হয়ে পড়েন আমার এক পূর্ব-পুরুষ। তাঁকে জোর করিয়ে ইস্‌লাম ধর্ম এম্‌ব্রেস্ করিয়ে কোন এক ওম্‌রাহের রূপবতী কন্যার বিয়ে ঘটিয়ে দেন দিল্লীশ্বর। কিন্তু তাঁর আগেই তাঁর হিন্দু-রাণীর গর্ভজাত সন্তান থাকায় একটা গোলমাল বাঁধে। ফলে স্টেট্‌টা অসম দুটো ভাগে বিভক্ত হয়। হিন্দু ভাগের আবার কয়েকশ' জেনারেশন্ বংশবৃদ্ধির সাথে সাথে অনেক ভাগে টুকরো-টুকরো হয়ে, ভায়ে ভায়ে ভাগ হয়ে যায়। মুস্‌লিম অংশে শুধু আমার বাবাই আছেন ! আমার কোন নিজের কাকা-

জ্যাঠা নেই। বিধর্মী হলেও বাড়ীর পূজা-পার্বনে আমরা একসাথেই যোগ দিই। ফলে আমাদের উইংস্‌টা, না ঘরকা না ঘাট্‌কা হয়ে পড়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথেও আমাদের মিল খুঁজে পাই না। আবার একদিকে হিন্দু-রাজারাও অনেক ক্ষেত্রে-ই ধর্মীয় সংস্কার নিয়ে একটু তফাৎ রাখেন আমাদেরকে!'

—'দারুণ ঘটনা তো?'

—'হ্যাঁ দারুণ মেসোমশাই। আর তাই পাকিস্তানে আমরা মুসলমান হয়েও মাইনরীটি ব্লকে থেকে গেছি। আমাদের জমিদারী যাবার আগেই আমাদের যত ফায়ার-আর্মস্‌ এ্যামুনিশনস্‌ সোর্ডস্‌ সীজ করে নিয়ে যায়।'

—'বল কী, যাঁদের অরিজিন্‌ থেকেই মুসলীম, সেই সব ফ্যামিলির আর্মামেন্টস্‌ সীজ করে নি?'

—'না, কিছু ক্ষতি হয় নি। তবে, অরিজিন্‌ যদি ধরেন, তবে পুব্‌-বাংলার গোটা কয়েক পরিবার ছাড়া আর সবক'জনের অরিজন-ই হিন্দু, সাব্‌কাস্ট হিন্দু, আর বুদ্ধিস্টদের একটা শাখা।

—'হ্যাঁ এ কথাটা আমি কোথায় যেন পড়েছিলাম।' মিঃ পি. বি. বলেন। মিঃ তালুকদারও সম্মতির মাথা নাড়েন।

—তবে পুব্‌-বাংলার কোন মুসলমান ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন, এটা স্বীকার করবে না! এটা বোধহয় ওদের একটা খুব দুর্বল স্থান—একটা ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স!'

—'রাইট—তাই মনে হয়।' মিঃ তালুকদার বলেন।

—'কিন্তু এটা তো অস্বীকার করা সম্ভব না যে, কোন একটা সময়, ব্রাহ্মণ শাসন এমন চরমে উঠেছিল; চণ্ডালের ছায়া মাড়িয়ে দ্বিতীয়বার স্নান করত ব্রাহ্মণ দূর দূর করে সাবকাস্টদের মন্দির থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। তাই তৎকালীন ইসলাম্‌-ধর্ম-প্রচারক, সুন্দর সদ্ব্যবহার করলেন, এই সুযোগের। মন্দির থেকে বিতাড়িতদের পরম যত্নে মস্‌জিদে ঠাঁই করে দিলেন।

—'খুব সুন্দর বলেছ। মন্দির থেকে মসজিদ; ওঙ্কার-ধ্বনি থেকে আজান্‌-ধ্বনিতে—খুব সুন্দর বলেছ, এককথায়।' শিল্পী-সদৃশ মিঃ তালুকদার বারবার রিপিট্‌ করতে থাকেন কথাটা।

—'যাকৃগে, নিজের কথায় ফিরে আসি।' একটু হেসে বলি, 'জানেন, বাবা, ঠাকুর্দার সময় থেকেই, বাড়ীর আমলা-কর্মচারী সবাই বংশ-পরম্পরায় হিন্দুই থাকতো। পরের দিকে ঢাকা-সেক্রেটারীয়েট-এর অথবা লোকাল টাওনের মুসলমান বন্ধুরা বাবাকে প্রায়-ই অনুযোগ করতেন, 'চৌধুরী সাহেব, নিজের ধর্মের কাউরে বিশ্বাস করেন না ক্যান্‌ কন্‌তো?' বাবা কি উত্তর

দিতেন জানেন ? বাবা বলতেন, 'কী জান,' হিন্দুরা কেমন কইরয়া খায় দেখ নাই। পাতে কিছু রাইখ্যা পাত ছাইড়া উঠে। এইটা ওদের ধর্ম। আর মুসলমানদের দেখসো না, চাইটা পাত্ সাফ কইরা্ চক্ চক্ কইয়া তবে পাত ছাড়ে। চুরি দুইজনেই করবো, কর্মচারীর ওইটা ধর্ম। তবে, হিন্দুরা নিয়া যা রাখবো, তাতেই আমাদের চইল্যা যাইব ভাল মতে। এই বলে বাবা নিজের রসিকতায় নিজেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেন।'

আমার মুখে পুব-বাংলার ভাষা শুনে রাধা-বন্দনারা খুব উপভোগ করছে দেখলাম। ওদের দিকে একটু চোখ টিপে ইশারায় চা-পানের ইচ্ছা জানাতেই বন্দনা উঠে গেল বয়টাকে বলতে।

—'তোমাদের হিন্দু উইংস্ কোথায়, কলকাতায় ?' মিঃ তালুকদার প্রশ্ন করেন।

—'হ্যাঁ, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন। কেউ কেউ ওয়েল সেটল্ড। কারোর অবস্থা আমাদের মতোই।

—'সোমেশ্বর স্টেটের মহারাজা কোথায়, উনি কি—ও'র নামটা কি যেন-জানতাম—' পি.বি র কথার মাঝখানেই বলে উঠি, 'আত্মচেতন চৌধুরী। উনি তো সাউথ-ক্যালকাটাতেই থাকতেন। এখন ছেলেরা দূরে দূরে সেট্ল করায়, বীরভূমে একটা বাগান-বাড়ী কিনেছেন। ওখানেই বেশী থাকেন। লেখেন তো, বই আছে বাজারে ! বেশ লেখেন। বন-জঙ্গল পছন্দ; সেইসব আলোচনাও পছন্দ করেন। জীবনের রঙ বদলাচ্ছে—বইটাই বোধহয় ও'র শেষ লেখা।'

—'ওটা কী উপন্যাস ?' এবার বন্দনার মাসীমা জিজ্ঞেস করেন। উনি কখন ঘরে ঢুকেছেন, টের পাইনি ; মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছেন।

—'না, হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। আসলে ওটা একটা আত্মজীবনী। কি অবস্থা থেকে কোথায় এসে দাঁড়ালেন, বংশপরম্পরায় মহারাজাধিরাজ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে গেছেন। তিনি নিজেও সেইভাবে বসেছেন। —সেটা, নতুন জীবনের স্রোতে কোথায় হারিয়ে গেল। —বড় ছেলেকে তা দিয়ে যেতে পারলেন না। এতো বড় এবং এতো পুরানো একটা পরিবার কেমন আপ্রুটেড্ হয়ে এ বাংলায় সেট্ল্ করতে চেষ্টা করছে—এইসব খুব টাচী ল্যাঙ্গুয়েজে লিখেছেন। ভালো লাগবে পড়তে। কোন অহমিকার প্রকাশ নেই বা পাব্লিসিটি নেই বইটাতে।'

—'তোমাদের উইংস্‌কে নিয়ে কি লিখেছেন ওঁর বইতে ?'

—'না, বইটায় মূল পরিবারকে নিয়েই সব ঘটনা। তবে আমাদের অস্তিত্ব আছে, এটা কোন একটা প্যারাগ্রাফে আছে বোধহয়। জেনিওলজিতে

১৫

আছেই !'

—'এমনি তোমাদের যাতায়াত আছে ?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোন মনোমালিন্য নেই। যে কোন উৎসবে দুটো পরিবারকে একসাথে পাওয়া যাবে।' হাসতে হাসতে বলি। 'তবে মহারাজা খুব কন্‌জার্ভেটিভ্‌ তো ! আমাদের ছোঁয়া কিছু খান না। এমনকি ঘরে আমি থাকলে জল-ও খান না। জল খেতে হলে আমাকে একটু পাশের ঘরে যেতে বলেন ; কোন অছিলায়। খেয়ে নিয়ে আবার ডাকেন। ছোট-বেলা থেকে অভ্যস্ত বলে, ইঙ্গিতগুলো চট্ করে ধরতে পারি। এটা এতো স্বাভাবিক যে উভয়েই এতে কিছু মনে করি না।'

সবাই খুব আশ্চর্য হন, এ কথায়। তাই আরও বলি, 'আবার ধরুন অক্ষয় তৃতীয়ার দিন অথবা অষ্টমীর দিন ছুটি উপলক্ষ্যে সকালে একটু বেড়াতে গেছি, তখন হয়তো চণ্ডীপাঠ করছেন, আমাকে দেখে ইঙ্গিতে পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে বললেন। পরে, শেষ হলে আমি যখন প্রণাম করলাম, বৃদ্ধ পরম যত্নে আমার মাথায়, গায়ে, কল্যাণ হস্ত স্পর্শ করাতে করাতে ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তোমার কল্যাণ হোক, তোমার অক্ষয় হোক, রাজ্। যদি চণ্ডীপাঠে কোন পুণ্যার্জন হয়, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি সেই জোরে তুমি জয়ী হও, সর্বক্ষেত্রে। বড় কষ্ট করেছ, বড় কষ্ট করেছ।' সেই স্নেহের স্পর্শের কেমন একটা মাদকতা আছে জানেন ! আর ওঁর ঠিক পেছনেই রাজবেশ পরা আমাদের কমন্ এন্‌সেস্টর-এর ছবিটা আমাকে কেমন হিপ্‌নোটাইজ্ করে জানেন ! মনে হয় মহারাজার কণ্ঠে ওই অতীত পুরুষ তাঁর বংশধরকে আদর করছেন, আশীর্বাদ জানাচ্ছেন।'

৪২

কথা বলতে বলতে বোধহয় একটু ইমোশনাল্ টাচ এসে গিয়েছিল। ঘরটা নিঃশব্দতা রক্ষা করছে। সবাই চুপ করে গেছেন। নিস্তব্ধটা আরও ভুতুড়ে হয়ে উঠল, জু-জু-জু করে টেলিফোনটা ডেকে ওঠায়। সবাই একই সাথে ফোনটার দিকে তাকায়। কেউ-ই ওঠে না দেখে ফোনটা আমারই সবচেয়ে কাছে বলেই আমিই রিসিভারটা তুললাম

ওপার থেকে একটা চেনাচেনা মেয়ের গলা পেলাম। রাধাকে চাচ্ছে। রাধার একতরফা কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি।

—'বল।'

—'কি বলতে চাচ্ছিস্ ?'—অবাক !

—'.........'

—'ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে বল, কী বলছিস !' ঠাণ্ডা গলা !

—'.........'

—'কে কাকে ঠকাচ্ছে, সেটা এতো সহজে বিচার হয় না।' এই সেরেছে··· !

—'.........'

—'যাক্, আমায় বলে তো কোন লাভ নেই। আমার পরামর্শে তুমি কিন্তু করনি।' তুই থেকে তুমি ?

—'......'

—'বললাম তো নিজের বুদ্ধিতে যতদূর গড়িয়েছ, বাকীটাও নিজেই পারবে।'

—'......'

—'ওকে তুমি চেন নি, রুণা দেবী।' রুণা— ? ও বুঝেছি এ্যাকৃশন্ স্টার্ট্ করে গেছে। রাধা আর কথা বাড়ায় না। কোনদিক থেকে ফোনটা আগে কাটল বুঝলাম না। রাধা সবাইকার নির্বাক প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড়িয়ে গম্ভীর হয়ে কী ভাবল। তারপর আমাকে বলল, 'এই, তোমার সাথে একটা কথা আছে রাজা।' আমি তৈরী-ই ছিলাম। হেসে উঠে দাঁড়ালাম। রাধা আমার ঘরের দিকে এগোতেই, ওকে ফলো করলাম।

—'রুণা তোমাকে ইম্পস্টার বলছে। বলছে তুমি আত্ম-পরিচয় গোপন করে ওকে ঠকিয়েছ।' রাধা আমার হয়ে রাগ প্রকাশ করছে।

আমি বুঝেও প্রশ্ন করি, 'আত্ম-পরিচয় মানে ? আমার ধর্মীয় পরিচয়টা তো ? সে সুযোগ আর পেলাম কই। ওর রেশমীদি মুসলমানের বৌ। এসব দেখে ওটা বলার স্কোপ্ কোথায় বলত ! আর ও অমন ড্রামা করবে সেটা তো জানা ছিল না আগে !'

—'ড্রামা !!' ঘাবড়ে যায় রাধা। 'কি বলছ ? কিসের ড্রামা ?'

বসন্তকুমারের অফার থেকে যত সংক্ষেপে সম্ভব জুহু বীচের ও গত রাত্রের পোর্টিকোর তলায় ঘটনাটা, ওকে পেশ করি। ও অবাক বিস্ময়ে রাগে ফেটে পড়ে।

বলে, 'ওকী ক্রিমিনাল্ টাইপ্, রাজা ? ভাগ্যিস্ এটা তুমি ; অন্য কেউ হলে আরো কত বিচ্ছিরী স্ক্যাণ্ডালে পড়ে যেত, ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছি।'

—'ফিল্মের লোকেরা ব্যবসার খাতিরে সব করতে পারে, রাধে।' হেসে বলি, 'যেতে দাও। তোমাকে অন্ততঃ ঘটনাটা বলে কি রিলিফ্ পেলাম,

তোমাকে বোঝাতে পারব না। কাল তারপর থেকে সারারাত একটু ঘুমোতে পারিনি।'

—'আর আমি ভাবলাম বন্দনার সাথে তোমার কোন ঠাণ্ডা লড়াই চলছে। ও কাল সারারাত কেঁদেছে। ও বোধহয় ড্রয়ি-রুমেই রাত কাবার করেছে।'

—'হ্যাঁ, ভোরে তোমার ফোন আসার আগে আমি ফ্যান্‌টা বন্ধ করেছি। কি হয়েছে ওর?'

—'বোঝ না?'

—'সত্যিই আমি কিছুই জানিনা। কি হয়েছে?'

রাধা আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা সবাই একরকম। মেয়েরা আর কেমন করে ভালবাসার কথা বলবে বলে দাও। বন্দনা যখন দেখল, তার জিনিসটা অন্যে দখল করে নিচ্ছে—স্বাভাবিক ভাবেই মেয়েদের একমাত্র বন্ধু—'কান্না' দিয়ে কম্‌পেন্‌সেট্‌ করতে চেয়েছে।' রাধার বক্তৃতা মাথায় ঢুকছে না। কি অন্যায় হয়ে গেল! বন্দনা আমাকে ভালবাসে! এখন কি করি! ওকে কি করে বোঝাই!

—'প্রথমদিকে তোমার দিক থেকেই সাড়া ছিল। তোমার ট্রেনের ব্যবহারে, তোমার দৃষ্টিতে।' রাধা বলে চলে, 'বন্দনার মত একটা শান্ত মেয়ের পক্ষে তোমার মত একটা ছেলেকে রিফিউজ করা কঠিন, এটা বোঝ না। তুমি অস্বীকার করতে পার, তুমি ওকে ভালবাসনি!' রাধার জেরায় আমি জেরবার হচ্ছি।

—হ্যাঁ। বাসি। কিন্তু, তুমি যেভাবে ভেবেছ, বন্দনা যেভাবে ভেবেছে, সে ভাবে নয়। একেবারে সম্পূর্ণ অন্যভাবে। বিশ্বাস কর, অন্যভাবে!' আমি কথা বলতে কেঁপে কেঁপে উঠছি!

রাধা আমার নিশ্চুপ, হতবাক্‌ দৃষ্টির সম্মুখ থেকে সরে গেল। খাওয়ার আগে পর্যন্ত শুধু ভাবলামই। কী করে এটা ঘটে গেল। এতো গণ্ডগোল, মিস্‌আণ্ডারাস্টাণ্ডিং, কিছুই হ'ত না। পথের আলাপ পথেই শেষ হয়ে যেত—যদি আমি প্রথমেই আমার ধর্মের পরিচয়টা দিয়ে দিতাম। এটা কি আমারও একটা ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স্‌। আমিও কি আর পাঁচটা মুসলমান ভাইদের মত হিন্দু অরিজিন্‌ মুসলীম কনভার্ট', এসব বলতে লজ্জা পাই? ইস্‌ বন্দনাকে বোঝাতে আমি ভুল করে ফেললাম! ছিঃ বেচারী শুধুই কষ্ট পাচ্ছে। যাকগে যাবার আগে সব ক্লীয়ার করে যেতে হবেই।

রাতে খেতে বসে অনেক পুরোনো পারিবারিক ইতিহাস শোনাতে হ'ল মি তালুকদারকে। পি. বি. ও অনেক প্রশ্ন করছিলেন থেকে থেকে। আসলে বই পড়ে ফ্যামিলি-হিস্টিটা এতো ভালো জানা ছিল যে কেউ প্রশ্ন করলেই একবারে রেফারেন্স উইথ কনটেক্সট শুরু করে দিই! অবশ্য, পরিচয়টা গোপন রাখার চেষ্টাই সর্বাগ্রে থাকে।

শনিবার সকাল থেকে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত সকলকেই বোধহয় এ্যাভয়েড করে গেলাম। বিকেলের আগেই রাধা ঘরে ঢুকে বলল, 'কি হ'ল বক্তিয়ার খিলজী, একেবারে চুপ মেরে গেলে যে? কাটা সৈনিক-এর রিহার্সাল্ দিচ্ছ?'

রাধার পরিহাসে হাসতে পারলাম না। বললাম, মুখ দেখাতে লজ্জা পাচ্ছি রাধে! নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হচ্ছে। আসলে তোমাদের বাড়ীতেও সবাই খুব লিবারাল্. খাবার-দাবারেও কোন প্রেজুডিস নেই দেখে নিজের কথাটা আর বলা হয় নি।'

---দূৎ, থাম তো। ও-সব এ বাড়ীতে কোন ফ্যাক্টরই নয়, শঙ্খকে তাহলে আমি কি করে পাব? মা কী ধর্মের জন্যে আটকাচ্ছেন? ও ছেলে কেমন, সেটাই ফ্যাক্টর।'

—'আসলে, এই ধর্মের খোলসটা আমার কোনই কাজে আসে না, অথচ বড় কষ্ট দেয়। এটা থেকে বেরিয়ে আসাও তো সম্ভব নয় রাধা!' মাটির দিকে মাথাটা ঝুলেই থাকে। রাধা আমার কপালে পড়া চুলগুলো ঠিক করে দিয়ে বলে,

—'দূর পাগল! ওসব নয়। আসলে কি বলব? তুমি আর পাঁচটা ছেলের মত নও। কোথায় যেন একটা দারুন অমিল আছে! সেটাতেই গোলমাল হয় লোকের। কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হাসলাম। ঠিক কি করে হবে, ও বা আমি কেউই জানি না। রাধা হঠাৎ তাড়া দেয়, 'বন্দনা যাচ্ছে না। ঘটনা যাই ঘটে থাকুক, আমাকে তো যেতেই হবে। ভিকু চার্চ গেটে গাড়ী নিয়ে রেডী থাকবে বলে গেছে। তুমি রেডী হয়ে নাও।'

—'আমার যাওয়াটা কি ভালো দেখাবে?' দ্বিধা নিয়ে বলি।

—'কেন নয়? আর তাছাড়া তুমি তো আর জান না, বুণা ফোনে কি বলেছে?'

—'জানি না!'

—'আরে বুণা আমাকে বলতে বারণ করেছে যে! ও চাইছে তুমি

যদি ফাঁকতালে কন্ট্রাক্টে সইটা দাও।' রাধা সকৌতুকে হাসছে! আমিও মুচকি হেসে শেভ করতে বসলাম। বের হচ্ছি না বলে, সকালে ঘুম থেকে উঠে আর শেভ করিনি।

৪৪

চার্চগেটে লাল বেনারসী পরা রাধা, আর ধুতি-পাঞ্জাবী পরা বাঙালী বাবুকে দেখলে, যে কেউ তাকিয়ে থাকবে। তবুও ইচ্ছে হচ্ছিল শঙ্খকে একটু দেখালে মজা হতো। কথাটা সাবওয়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাধাকে বলতে যাব—শঙ্খ !! কোত্থেকে উদয় হলো, ও !!

—'এ্যাই শালা, আমার বৌকে নিয়ে—'

—'কী হচ্ছে কি ফের……' শঙ্খের নিনাদ, নিমেষে ফুৎকারে পরিণত হল, রাধার দাবড়ানিতে।

বললাম, 'এইবার ওকে মাফ্ করে দাও, রাধা, একবার ও জেনুইন্ সম্পর্কে ডেকেছে।'

সম্পর্কের হিসাবটা সেরে, ধাঁ করে আমার বাঁ গালে একটা চুমু খেয়ে ফেললে শঙ্খ। কানে কানে মৃদুস্বরে বললো 'শালাবাবু।' ধমক দিয়ে বললাম, 'আমি বয়সে বড়, দাদা বলে ডাকবে।' ও সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বলল, 'শালাদা ?'

চার্চগেটের সাবওয়েতে অফিস-ফেরৎ যাত্রীর ভিড়ে গম্‌গম্ করছে। তার ভেতর আমাদের পোষাক, আর শঙ্খের আচরণে অনেকেই কৌতুক অনুভব করছে। ওপরে রাস্তায় উঠে দেখি বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টি। আর বের হতে পারি না। ওখানেই তিনজন দাঁড়িয়ে থাকি। ওর মধ্যেই ভিক্টর এসে হাজির। রেগে গেছে। আমাদের নাকি পুলিশ কাউণ্টারে দাঁড়ানোর কথা। রাধাকে বলা আছে। রাধা ভুলেছে। 'অতো সাজগোজের দিকে মন থাকলে কাজের কথা মনে থাকবে কি করে—ইত্যাদি ইত্যাদি।'

শঙ্খকে দেখে বলল, 'তুম্ কাঁহাসে ? যাওগে মেরে সাথ ?'

শঙ্খ মুখটা করুণ করে বলে, 'জী ? ইন্‌ভিটেশন কার্ড নেহি মিলা—উস্‌মে কেয়া হ্যায় ? —ম্যায় ভি ভুখা হু'।' ওর নিজের কথায় নিজেরই আর্গুমেণ্ট শুনে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। বলার ধরণটাই ওই রকম! রাধা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা টাকা শঙ্খকে ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'ফুচকা খেয়ে বাড়ী চলে যাও।' অঞ্জলিপুট হাতে টাকাটা নিয়ে, গাড়ী ছাড়া পর্যন্ত ওই ভঙ্গীতেই দাঁড়িয়ে থাকে ও।

বৃষ্টি একটু ধরেছিল ; আবার তেড়ে এল। ওয়াইপার-এর নেগেটিভ ইণ্ডিকেশন্ এ বারবার মনে হচ্ছিল—ঠিক করছি না, ঠিক করছি না, ঠিক করছি না। আজকে না এলেই পারতাম।

বৃষ্টি ধৌত, পৃথিবীর সমস্ত রঙের আলোয় আলোকিত মেরীন ড্রাইভ-এর এ ছবি যে না দেখেছে, তাকে কথার মালা সাজিয়ে বোঝানো যাবে না।

একগাল হেসে বুণা, ভিক্টর আর রাধাকে নিয়ে বিরাট হল ঘরে উপস্থিত হল। আমিও পশ্চাৎগামী হ'লাম। তৎক্ষণাৎ বিরাট একটা লাল রঙের গাড়ীতে এলো স্বপ্নের নায়ক, রাজেশ! বুণা তাকে 'যতীনদা' বলে ডেকে গাড়ী থেকে নামাল। বুণার মা-কেও দেখলাম, বসন্তকুমারের পাশে পাশে ঘুরছেন। আমি তাঁকে আগে দেখিনি। কাছে আসতেই বসন্তকুমারের গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধ কন্ঠ আমাকে অভিষিক্ত করল। স্ত্রী-র সাথে আলাপ করিয়ে বললেন, 'যূই, দেখ কে এসেছে, বুণার বন্ধু, রাজা—।' উনি একটু মাপা হাসি হেসে আমাদেরকে একটা কোচে নিয়ে বসালেন। ফের দরজার কাছে রীসিভ করতে চলে গেলেন। বেশ ভীড়। অনেক পুরানো ফিলমস্টারকে দেখলাম। প্রেমনাথকে, দিলীপকুমারকে দেখেই চিনলাম। কোন্ ছোটবেলায় রঙীন ছবি 'আন্' দেখেছিলাম! রেশ্মী কোথা থেকে এসে তার উগ্রপ্রসাধন শুধু আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বলল, 'নটি! কেন আসনি আরেকদিন?'

বলি 'দোষটা আমার নয়। বুণা আমার গাইড।'

রেশমী, ঘরের সেণ্টারে মোমবাতি সাজানো পুষ্প শোভিত কেকের টেবিলটার কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'তুমি নাকি বসন্তকাকুর বইয়ে কাজ করবে? দারুণ হবে। বোধহয় তোমার অপজিটে আমি থাকছি। কেমন মানাবে বলতো?'

— 'কী করে বলবো?'

—'চেয়ে দেখ একবার চারদিকে।' রেশমীর কথামত চারদিকে একবার দৃষ্টিটা বুলিয়ে আনতে বুঝলাম,—সবাইকার দৃষ্টি ঠিক, সেন্টারে। একটু হেসে বললাম, 'সবাই টপ্‌গ্ল্যামার—রেশমী গুলশানকে দেখছে।'

— 'তার ভাবি হিরোকেও দেখছে।'

—'না।'

—'না, মানে?'

—'হিরোটিকে আজ রাতের পর আর কোন বোম্বাই-পার্টিতে দেখা যাবে না।'

—'কেন ?'

—'থাকবে না বলে।'

—'তুমি রোলটা করছ না ?!' বিস্ময়ে বড় বড় চোখ করে তাকায় রেশমী।

মাথা ঝাঁকিয়ে একটু হেসে বলি, 'না।' তক্ষুণি রাজকাপুর এগিয়ে আসতেই রেশমী আমায় ছেড়ে ও'কে ধরল, 'কেমন আছেন ?'

পরিষ্কার কল্যাকাল-বাঙলায় ট্র্যাজিক আইডল বললেন, 'এই চলে যাচ্ছে।'

—'!' রেশমী আমাকে ইন্ট্রোডিউস করাব আগেই রাজকাপুর আমাকে বললেন, 'আপনিই সেই নিউফাইণ্ড !' বসন্তবাবু তো আর কে স্টুডিওর তাবং এ্যালবাম ঘেঁটেও হিরো আর পছন্দ করতে পারেন না ! কংগ্রেচ্যু-লেশনস, আই উইশ ইউ এভরী সাকসেস্। আসবেন, আর. কে. স্টুডিওতে। কলকাতার খবর কি ?'

বললাম, 'একই--ঘেরাও, ক্লোজার, স্ট্রাইক, কাঁদানে গ্যাস।'

উনি হেসে বললেন, 'এ ছাড়া কলকাতাকে চেনা যায় না। আরো বাস বাড়াও আন্দোলনে, চারটা বাস পুড়িয়ে দিল ! এ কলকাতাতেই সম্ভব।

আমি আর রেশ্‌মী উচ্চহাস্য-রোলে ফেটে পড়লাম।

রাধা-ভিক্টরের দিকে তাকাতেই রাধা চোখ টিপ্‌ল। ভাবটা এমন—'খুব যে জমিয়েছ ?' ভিক্টর নিকটবর্তী বেয়ারার কাছ থেকে এক গ্লাস মদ তুলে নিল

রাজেশ, রেশ্‌মীর দিকে এগোতেই রাজকাপুর ফিল্মল্যাণ্ডের দাদামণির কাছে গিয়ে বসলেন। অশোককুমার কখন এসে বসে আছেন, দেখিনি। চুলে বেশ পাক ধরেছে। এখনো শুনি অভিনয় করে যাচ্ছেন।

রাজেশ, ঘাড়টা কাত্ করে চোখ দিয়ে কুত্‌কুতে হাসি হেসে বলছে,

'যব্ নিদ্ আয়ে তো খোয়াব আয়ে
যব্ খোয়াব্ আয়ে তো তুম্ আয়ি
লেকিন্ যব্ তুম্ আয়ি, তো নিদ্ না আয়ে
খোয়াব্ না আয়ে।'

রেশ্‌মী দেখলাম একটুও হাসল না। স্ট্রেট্ মুখের ওপর স্নাব্ করল, 'কান্ট্ ইউ স্টপ্ ইয়োর্ এ্যাক্টিং, রাউণ্ড্ দ্য ক্লক্।' বলেই রেশ্‌মী আর দাঁড়াল না। যেন কী একটা হৃদয়-ভাঙার শট্ নেয়া হচ্ছে, এমনি ঢঙে একইভাবে, ঘাড় কাত করে করুণ চোখে রেশ্‌মীর গমন পথের দিকে তাকিয়েই থাকল রাজেশ ! ওর পেছন দিয়ে হেঁটে ভিক্টর আর রাধার

কাছে এসে বসে পড়ি। বেয়ারা আমার ইম্পটেন্স বুঝে তাড়াতাড়ি ড্রিংকস-এর ট্রেটা সম্মুখে ধরে। ওকে ইঙ্গিতে চলে যেতে বলে, রাধার ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে চাপাস্বরে বলি, 'স্টার্ট করিয়ে দিয়ে এলাম।'

রাধা বলল, 'রেশমীকে বললে, তুমি কন্ট্রাক্টে সই করছো না।'

—'হ্যাঁ।'

—'এখনই বললে কেন? যাবার মুখে বললেই হতো।'

—'আমি দেখে যেতে চাই, হাও ফিল্ম পিপল রিঅ্যাক্ট!'

—'ভিক্টর বলল, 'একটা হুইস্কী নাও না।'

—'না। মদ পেটে গেলে বুঝি তুমি বাংলায় কথা বল?'

ও হেসে বলল, 'নেহি।' আরেকটা গ্লাস তুলে নিয়ে বলল, 'আমি যা বলেছিলাম মিলিয়ে দেখ, এরা কেউ হাসে না, ফ্ল্যাটেনস্ দেয়ার লীভস—কারেক্ট?'

—'সব কোই লোগ অ্যাতেলেকচ্যুয়াল বন গিয়া—।'

—'হ্যাঁ, তুমি এখনি এতো খেয়ো না। গাড়ী চালিয়ে বাড়ীতে পৌঁছতে হবে কিন্তু।' আমার ভয় দেখে ও বলল, 'ঘাবড়াও মাৎ।'

রেশমী বসন্তকুমারকে কিছু একটা বলছে। বসন্তবাবু মাথা নীচু করে কথাটা শুনছেন।

বিশ্বজিৎ এসেই মাইকটা নিয়ে বাংলা গান গাইতে বসে গেল। তালিও পেল। গানের চর্চা করে মনে হল।

আশাকে ঘিরে অনেক স্তাবকের দল।

হেমামালিনী আর লীনা চন্দ্রভারকর, এই দুটি বাচ্চা মেয়েকেই দুটো পুতুল ছাড়া কিছুই মনে হয় না। ওরা আজকের দিনের মুকুট নিয়ে নিচ্ছে শুনেছি। হেমাই বেশী।

পার্টি বেশ জমজমাট হয়ে গেছে। ওয়েস্টার্ন কনসার্ট থামতেই সবাই বুণাকে ঘিরে কেকের স্ট্যাণ্ডটার কাছে নিয়ে এল। চারদিক থেকে, যাঁরা দাঁড়িয়েছিল প্রায় সবাই, এবং যারা বসেছিল তাদের কেউ কেউ গোল হয়ে সেন্টারে গিয়ে দাঁড়াল।

৪৬

আমি আর রাধা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। সম্পূর্ণ সাদা লেশের পোষাকে বুণাকে বেশ লাগছে। কবরীতেও সাদা ফুলের ভিড়।

চব্বিশটা (!) মোম, এক ফুৎকারে নিবিয়ে করতালি পেল বুণা, হাসিমুখে

১৬

পাশের তরুণটিকে কি যেন বলল। আমার সাথে চোখে চোখ রেখে চট করে একটা নতুন ছুরি তুলে কেকটা থেকে একটু কাটল। টুকরোটা ও তুলে, না আমার মুখে নয়, ওই সেই তরুণটির মুখে পুরে দিল। হাত-তালির ভেতর এবারও আমার সাথে চোখে চোখ মিলল। ও জোর করে মুখটা ঘুরিয়ে, ওই তরুণটির সাথে পজিশন নিয়ে দাঁড়াল। এবার ডান্স শুরু হবে। যাদের পার্টনার আছে তারা দাঁড়িয়ে গেছে। যার নেই, সে একে-ওকে রিকোয়েষ্ট করছে রাধা আমাকে নাচতে ডাকল। আমি ছুটে এসে বসে পড়লাম। ভিক্টরও দেখলাম পার্টনার জুটিয়ে ফেলেছে। অনেকেই ভাল নাচে। অবশ্য বিদেশী নাচ আমি বুঝি কম। সবচেয়ে ভাল নাচছে বুণা। একজন টায়ার্ড হচ্ছে আরেকজনের কণ্ঠলগ্না হচ্ছে। সে টায়ার্ড হচ্ছে—বুণা আরেকজনকে ধরছে। পাগলের মত নেচে যাচ্ছে বুণা। একজনকে ধরছে, আগের জনকে ছাড়ছে। নাচতে নাচতে আমার সামনে দিয়ে কতবার ঘুরে গেল! কতবার চোখাচোখি হল! একবারও হাসেনি! সাধারণ পরিচিতির হাসি-ও নয়! আমি অবশ্য এটাই এক্সপেক্ট করি। ভেবেছিলাম ও গান গাইলে খুব ক্ল্যাপ দেবো, সে সুযোগ আর পেলাম না।

এক ঘণ্টা পরে খাবার ডাক পড়ল। সবাই হুড়-হুড়, দুর দার করে বুফের লাইন দিল। এ ওকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রথম ভিড়টা হাল্কা হতে, সিনিয়রদের রিকোয়েস্ট করতেই, অশোককুমার উঠে একে ওকে তাগাদা লাগালেন। তিনি নিজে কিছু খান না কোথাও, শরীরের জন্য।

রাধা দু'বার লাইন দিয়ে একবার আমার জন্য, আরেকবার নিজের জন্য নিয়ে এসে, আমার পাশেই বসে পড়ে বলল, 'দ্যুৎ, এই দাঁড়িয়ে খাওয়াটা আমার একদম পোষায় না।'

আশেপাশে অনেকেই দেখাদেখি ওইরকম বসে বসে খেতে থাকল। আমার প্লেটটা খাবার শুদ্ধু পাশের টুলের ওপর রেখে রাধার খাওয়া দেখছি। 'তুমি খাবে না?' রাধা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করে। সঙ্গে সঙ্গে বসন্তকুমার স্ত্রী সহ ব্যস্তভাবে সবাইকে আপ্যায়ন করতে করতে আমার কাছে এসে পড়লেন।

'তুমি খাচ্ছ না? আর কি পছন্দ করবে? চিকেন্ তেংরী কাবাব্টা দেখ টেষ্ট্ করে।' দাঁড়ালেন না। নেক্স্ট্ গেস্ট্কে, ওইরকমই একটা খাওয়ার রিকোয়েস্ট্ করেন, এগিয়ে যান।

রাধা উঠে গিয়ে ভিক্টরকে খুঁজে নিয়ে আসে! বুণার মা-কে বলে ওই ভিড়ের রাজত্ব থেকে মুক্তিলাভ করি।

বাইরে তখনও বৃষ্টি। গাড়ীতে রাধা আর আমি দুজনেই ফ্রন্ট্ সীটে উঠে বসি। আমি মাঝখানে। রাধার দিকে আস্তে বলি। 'ভিকু চালাতে পারবে তো।' রাধা হেসে বলে, 'হ্যাঁ হাঁ।'

যে যার নিজের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। বৃষ্টির ধোঁয়ায় কিছুই প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু ভিক্টর তার বহুল ব্যবহৃত রাস্তাটি ঠিক চিনে নিয়ে, এগোতে থাকে। এতো বৃষ্টির পর কলকাতার রাস্তার কি দশা হতো ভাবছি। এখানে কোথাও ওয়াটারলগিং দেখলাম না! রাস্তা কত মসৃণ।

প্রায় দাদারের কাছে এসে রাধা মুখ খুলল।

—'তোমাকে না আনলেই পারতাম।

— 'দেরীতে বুঝলে।'

—'বুণাটা এতো ছোটলোক ভাবিনি। একবার কথাও বলল না?'

—'বলার কিছু ছিল না তো, ছিল জানার। —সেটা রেশ্মী-মারফৎ জেনে গেছে বলেই—আর এদিকে ঘেঁসল না। এতো স্বাভাবিক রাধা।'

—'ডেকে এনে অপমান করা—'

–'ওভাবে বলছ কেন। ও নিজেও তো কম ইন্সাল্টেড্ ফিল্ করছে না। বাপির কাছে কত ফ্লপ্ড্ হ'ল। আমি ওর গেম্টা ধরে ফেললাম।'

রাধা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'বলিনি তুমি আর পাঁচজনের মত নও। তোমার চিন্তাধারাটাই অন্যরকম।'

গাড়ী পোর্টিকোর ভেতর ঢুকল। কুকুর দুটো খুঁক্ খুঁক্ করে এগিয়ে এসে জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল।

গাড়ীটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে, তালা দিয়ে বৃষ্টির ভেতর দৌড়ে না আসা পর্যন্ত ভিক্টরের জন্য পোর্টিকোর তলায়ই অপেক্ষা করলাম। ও এলে, এক-সাথেই ভেতরে ঢুকে পড়ি। আমি নিজের ঘরে যেতে যেতে শুনলাম রাধা বলছে, 'মা রাজা কিন্তু খাবে। ওখানে ও কিছু খেল না।' মাসীমার কণ্ঠ ভেসে এলো 'এইরে আবার শরীর খারাপ করেছে, না! বললাম ওকে অতো স্ট্রেন করাস নে, সবে জ্বর থেকে উঠেছে……'

স্লিপিং পাজামা-শার্ট পরেই খেতে বসলাম।

—'তোমার শরীর খারাপ?'

—'না তো!'

—'এখানে খেলে না কেন?'

—ওসব খাওয়া আমার সহ্য হয় না। তাছাড়া এমন বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খাব বলেই পেটটা খালি রাখলাম।—ঘী নেই?' ঘরে ঢুকেই খিচুড়ির গন্ধ

নাকে গিয়েছিল।

মাসীমার হাতে ভুনি খিচুড়িটা দারুণ খোলতাই হয়েছিল—অমৃতের মত চেটে পুটে প্লেট খালি করেছি। আমার খাওয়া দেখে টেবিলের সবাই হেসে বাঁচেন না।

৪৮

দারুণ বৃষ্টি হচ্ছে সকালেও। ঘুম ভাঙতে সবাইকার দেরীই হচ্ছে। কি করি, শেভ করে স্নান টান সেরে আরেকটা ঘুম দিলাম। সকালের চা বিছানাতেই দিল বন্দনা কব্জি উল্টে দেখি সাড়ে দশটা! বৃষ্টি ধরেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বন্দনা টুলটা কাছে টেনে নিয়ে বিছানার কাছে বসল হাসিমুখে। আমি শুয়ে শুয়েই চায়ে চুমুক দিচ্ছি। মনে মনে ভাবছি কি করে বন্দনাকে কথাটা বলি।

—'আর কত শুয়ে থাকবেন, উঠুন ?' মিষ্টি করে বলে বন্দনা।

—'এই ক'দিনে বিছানাটার মায়ায় পড়ে গেছি।'

—'শুধু বিছানাটার ?' হেসে ওঠে বন্দনা। শব্দে আকৃষ্ট হয়ে রাধাও ঘরে ঢোকে। উঠে বসে বিছানাতেই জায়গা করে দিতে হয়।

—'বস।'

—'বলছিলাম ঘরটার মায়া কাটাতে পারছি না। মনেই হচ্ছে না এটা তোমরা আমাকে ধার দিয়েছ, এক সপ্তাহের জন্য। তাই এটা ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে।'

—'ছাড়ার প্রশ্ন আসছে কেন ?' রাধা প্রশ্নটা করে।

—'বাঃ, কাজ ফুরিয়ে গেলে কোন অজুহাতে থাকবো শুনি ?'

—'ওঃ তোমার কাজ হয়ে যাবে, আর তুমি শিকল কাটবে না ? —ওটি হচ্ছে না।' রাধা মুখ বেঁকিয়ে বলে।

—'কিন্তু সেইমতই যে ঠিক আছে ম্যাডাম্।'

—'কি ঠিক আছে ?'

—'রিজার্ভেশন্ অব্ এ বার্থ।'

—'মানে, তোমার টিকিট কাটা হয়ে গেছে ?' রাধার প্রশ্ন, বন্দনার অবাক চাউনী।

—'হুঁ।' সংক্ষিপ্ত জবাব দিই।

—'কবেকার রিজার্ভেশন্ ?'

—'কাল সন্ধ্যের।'

—'তার মানে— !'

—'তার মানে অদ্য-ই শেষ রজনী।'

—'তোমার কাজটা!' বিস্মিত রাধা দম নিচ্ছে না।

—'কাল বিকেলের মধ্যেই হয়ে যাবে। ট্রেন রাত আটটায় ছাড়ে।'

—'যাঃ, দ্যুৎ—।' রাধা উঠে চলে যায় হঠাৎ! এরা আমাকে সত্যিই বড় ভালবাসে। বন্দনার চুপ করে বসে থাকা দেখেও বোঝা যায়, ওর ভেতরটা খুব চঞ্চল হয়ে পড়েছে। কিছু বলতে চায়, ও জানেনা কি বলতে হবে।

—'তোমার সাথে কিছু কথা ছিল বন্দনা। সারাদিনে একটু সময় করে—' কথা শেষ করার আগেই রাধা তার মা ও মাসীকে নিয়ে গম্ভীর হয়ে ঘরে ঢুকল। আমি হেসে উঠে দাঁড়ালাম।

—'যাঃ, ও ঠাট্টা করছে'-মাসীমা বললেন। 'তুমি টিকিট কাটলে কখন?' ঠিক জায়গাতেই ধরেছেন, মাসীমা।

—'গত সোমবার, বুণার সাথে এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ভি. টি-তে, তখনই।'

—'ও!' কেমন ম্রিয়মান হয়ে বলেন কলকাতার মাসীমা।

—তোমার কাজের ক্ষতি করব না—ক্যান্সেল্ করলে কি খুব অসুবিধে হবে?' বোম্বের মাসীমার প্রতিটি আন্তরিক শব্দ আমাকেও মুহ্যমান করে দেয়। ড্রয়িং-রুমে দলবল নিয়ে গিয়ে বসি। খবরটা ওখানেও পৌঁছে গেছে। ভিক্টর এসে আমার পাশ ঘেঁসে বসে, কাঁধে হাত রেখে নিঝুম হয়ে বসে থাকল। বললাম 'কেয়া দোস্ত্।'

ও গম্ভীর হয়ে বলল' 'নেহি। কুছ্ নেহি। বিল্‌কুল্ কুছ্ নেহি।' থেমে থেমে কেটে কেটে বলে ভিক্টর। প্রবাসী বাঙালী বন্ধু ভিকু, অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

মিঃ তালুকদার বললেন, 'তাহলে সেদিনকার মতই কাল বেরিয়ে পড়ব। তুমি ফিরে এসে রেস্ট্ নিয়ে দাদার থেকেই ট্রেনে চেপো।'

মাসীমা আপত্তি করলেন, 'কি দরকার অত সকালে বের হবার? দুপুরে খেতে দেরী হয়ে যাবে। তার চেয়ে দুপুরে খেয়েই কাজটা ও সেরে আসুক—অফিসে তো বিকেল পাঁচটা অবধি কাজ হবেই। রাতে খেয়ে এখান থেকে স্টার্ট করবে 'খন।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'সকালে গেলে একটা সুবিধে, গাড়ীটায় লিফ্‌ট্ পাব। নয়তো এক কাজ করা যায়—দুপুরে খেয়ে একেবারে লাগেজ্ নিয়ে বের হয়ে যাই। রাতে ট্রেনে খেতেই সুবিধে হবে, মাসীমা।'

—'লাগেজ্ নিয়ে অফিসে ঘুরবে নাকি ?' রাধার প্রশ্ন।

—'না, ওটা লাগেজ্-রুমে রেখে দিয়ে আসব ভি টি.-তে।'

সেদিন দুপুর এবং রাত্রিতে খাওয়ার টেবিলে বিশেষ ডিশ্ ছিল! খুব হৈ-চৈ করে বিদায়ী উৎসব হচ্ছে, আমার জন্য।

৪৯

রাতে তখন শুয়ে পড়েছি, দরজায় টোকা পড়ল। শব্দটা আরেকবার শুনে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলাম। মাসীমা।

বললাম, 'আসুন।' ঘরে এসে মাসীমা দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে খাটে এসে বসলেন।

—'বল।'

—'আমিও সারাদিন সুযোগ করতে পারিনি। সব সময়েই ওরা ঘিরে রেখেছিল।' হাসতে হাসতে বলি। 'শঙ্খকে, আপনি দেখেননি মাসীমা ?' কাজের কথায় চলে আসি।

—'হ্যাঁ, দেখেছি। আমার সামনে তো খুব বেশী আসেনি!'

—'আমি এটুকু বলতে পারি মাসীমা। নিজের বোনের জন্য রেকমেণ্ড্ করার মত পাত্র এই শঙ্খ। ও খৃস্টান বলে আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে ওর সাথে বিয়ে দিন রাধার।' বেশ জোর দিয়ে কথা কটা বলি।

—'ধর্মের কোন গোঁড়ামি আমাদের মধ্যে নেই রাজা। সব ধর্মই লোককে ভাল হতে বলেছে, ঈশ্বরকে পাবার পথের সন্ধান দিয়েছে। আমার কাছে কোন ধর্মই ছোট নয় কেউ বড়-ও নয়।' একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমার মনে হয় ওরা জীবনে সুখী হবে ?'

—'এ কথা বলা খুব কঠিন মাসীমা। খুব দেখে-শুনেও বিয়ে দিলেও তো এমন অনেকছার দেখা যায় আজকাল, ঘর ভেঙে গেছে ?'

—'হ্যাঁ তা ঠিক। তবে এখানেই দিয়ে দিই'

—'হ্যাঁ দিয়ে দিন। আর যত তাড়াতাড়ি পারেন দিন।'

—'কেন ?'

—'ওদের কথাটাও ভাবুন! চার-পাঁচ বছর ওরা অপেক্ষা করে আছে, এই লগ্নটার।' হেসে ফেলি, 'ধৈর্য্যচ্যুতি, অনেক সময় বিপথগামী করে কিন্তু!'

মাসীমা একটু বসে থেকে ওঠবার মুখে বললেন, 'বিয়েতে কিন্তু তুমি অবশ্যই আসছ। তখন মাসখানেক থেকে যাবে কেমন ?'

বললাম, 'মাসখানেক থাকতে পারবো কিনা জানি না, আমি ঠিক আসব দেখবেন। কথার নড় চড় হবে না।'

স্নেহবৎসল মাসীমা, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে, দরজা খুলে চলে গেলেন। এ'দের আত্মীয়তার বন্ধন ছিঁড়ে চলে যেতে কষ্ট হবে না? কে বলবে মাত্র সাত-আট দিন আগে এ'দের সাথে পরিচয়! যেন কোন অদৃশ্য জন্ম-সূত্রে এ'দের সাথে গাঁথা হয়ে গেছি।

৫০

বেশ সকালে ঘুম ভাঙল। উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে, ড্রয়িং-রুমে এসে দেখি বন্দনা একা বসে বসে কি ভাবছে।

—'মর্ণিং।'

ও হেসে আমাকে বসতে বলল।

বললাম, 'ভালোই হয়েছে একটা কথা তোমাকে বলব বলব করে বলা হয়নি— আচ্ছা তোমার মনে আছে বেশ মজা করেই বলতে শুরু করি। 'সেই ট্রেনে তোমাকে একটি মেয়ের কথা বলেছিলাম?'

—'হ্যাঁ, তারাবিবি?' বন্দনা ঘাড় কাত করে বলল। চোখে তখনো চিক্ চিক্ করছে কি বলব, সেটা ভাবছে!

—'তারাবিবি কে জান?'

—'না তো! আপনি বলেন নি!' ওর চোখে সন্দেহ।

—'তারাবিবি, আমার জীবনের একমাত্র সুখ, আহ্লাদ, স্নেহ-ভালবাসার কেন্দ্র। আমার একমাত্র বোন।'

—'আপনার বোন! কোথায় সে?'

—'পূর্ব-পাকিস্তানেই, শ্বশুরবাড়ীতে ছিল। ওর কোন খোঁজ পাইনি আজও। হয়তো ভালোই আছে, এতো বড় একটা লড়াই হয়ে গেল। একটা নতুন রাষ্ট্র-র পত্তন হ'ল। তবুও দুই বাংলায় যাতায়াত সুগম হল না,—আজও। তারাকে খুঁজতেও যেতে পারিনি।'

—'কোন চিঠি-পত্তরও লিখে দেখেন নি?'

—'হ্যাঁ দেখেছি। কোন উত্তর আসে না। চিঠিগুলো পৌঁছোয় কিনা কে জানে। এখনো অবস্থা ঠিক স্বাভাবিক বলে মনে হয় না।'

—'আপনার বোনের কথা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন?' বন্দনা লিঙ্ক ধরে দেয়।

—'হ্যাঁ জানো, ট্রেনে তোমাকে প্রথম দেখার পর থেকে আমি

কিছুতেই তোমাকে না দেখে থাকতে পারছিলাম না। তোমাকে যে কোন অছিলায় একটু ছুঁতে একটু দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল, থেকে থেকে।'

—'কেন?' কাঁপা গলায় বন্দনা জিজ্ঞেস করে।

—'তোমার মুখ চোখ, গড়ন, কথা বলা, সব, সব কিছুর আশ্চর্য মিল; আমার তারার সংগে! ওকে শেষ দেখেছি দশ বছর আগে। এখনও হয়তো ঠিক তোমার মতই বড় হয়েছে—তোমার মতই সুন্দর দেখতে হয়েছে!'

বন্দনা কেমন চুপ করে যায়। চোখের দিকে তাকিয়ে থাকছে না। মেঝের কার্পেটের ডিজাইন দেখতে ব্যস্ত।

কজের কথার লিঙ্ক ঠিকই নিয়ে আসি, -পর পর,

—'তোমার মেসোমশাই সেদিন বলছিলেন মনে আছে? তোমাকে সমুদ্রের ধারে যেতে নিষেধ করেছিলেন। তুমি হয়তো জানো, তোমার কয়েকজন পূর্বপুরুষের নামের সংগে তোমার নিজের দাদার নামটাও যুক্ত হয়েছে। একই কারণে! সমুদ্রে ডোবাটা হয়তো কাকতালীয়, কিন্তু আঘাতটা তোমার ফ্যামিলিকে একটু দুর্বল করে ফেলেছে।'

'আপনি এসব কথা কি করে জানলেন?' বন্দনা অবাক হয়ে বলে, 'আমার তো কোন নিজের দাদা নেই!'

—'হ্যাঁ, ছিল! তোমাকে হয়তো কোন কারণে বলা হয় না। সে বেঁচে থাকলে আমার বয়সী ই হতো। আর সেই কারণেই মাসীমার এতো স্নেহ আমার প্রতি। উনি আমাকে ট্রেনেই কথাটা বলেছিলেন। সেই মুহূর্তেই আমি তাঁর মৃত ছেলের আসনটা নিয়ে নিয়েছি। তাই তোমাদের সংগে এ-বাড়ীতে উঠে আসতে শেষ পর্যন্ত আর কোন সংকোচ করিনি।'

বন্দনা কি কাঁদছে? ও আস্তে উঠে ধীর পায়ে এগোতে থাকে। আমি বসে বসেই বলি, 'আমার ব্যবহারে যদি কোন অন্যরকম কিছু পেয়ে থাক, তার জন্য না হয় আমি-ই বড় হয়েও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি'— বন্দনা দরজার কাছে দাঁড়ায়, পর্দাটা ধরে ফেলে। ও কি পড়ে যাবে? মনে হ'লো চুড়ির আওয়াজ কানে এলো! কেউ দ্রুত পায়ে দূরে সরে গেলেন! মাসীমা কি? তাই হবে। চুড়ি তো আর কারো হাতে নেই।

আমি তখন দাঁড়িয়ে উঠেছি। বন্দনার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলি, —'তুমি আমার তারা হয়ে যাওনা বন্দনা? হবে?' বন্দনা তার উদ্গত অশ্রু ঢাকতে ছুটে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। আমি অনেকক্ষণ ওইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে বাইরের দরজা খুলে বৃষ্টি-ধৌত সকালের ফোটা ফুল দেখতে বাগানে নেবে পড়লাম।

৫১

অফিসের যাত্রী দু'জন যখন প্রস্তুত হয়ে গাড়ীতে উঠবেন, আমি এগিয়ে গিয়ে মিঃ তালুকদারকে বললাম, 'আপনার সাথে বিকেলে আর দেখা হচ্ছে না, বিদায়টা এখনই চেয়ে নিই।' আমার প্রণাম করতে যাওয়া হাতটা ধরে ফেলে, বুকে টেনে নিয়ে. মিঃ তালুকদার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'কাম্ এগেন্, কাম্ এগেন্—মাই সান্।' বলেই গাড়ীতে উঠে অন্যদিকে খুব গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে থাকলেন! ভিক্টর এসে শেক্ হ্যাণ্ড করে বলল, 'স্টেশনে যেতে চেষ্টা করব। আবার এলে এখানেই উঠো কিন্তু।'

গাড়ীটা বেরিয়ে যায়। পেছনে তাকিয়ে দেখি বাড়ীর আর সবাই পোর্টিকোর তলায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে. মৌনব্রত অবলম্বন করে আছেন।

দুপুরে খেতে একটু আগেই বসলাম সবাই। আমার আবার দুটোর সময় 'কাস্টোডিয়ান্'কে মিট্ করতে হবে। বন্দনা একটু অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে খেয়ে যাচ্ছে কথা বলছে না। রাধা স্নিগ্ধ চোখে আমার খাওয়ার তদারক করছে। মাসীমা অনেক যত্নে এটা-ওটা আইটেম্ বারবার বলে, পাতে তুলে দিচ্ছেন। অনেক আপত্তি সত্ত্বেও শুনছেন না।

৫২

ট্যাক্সিতে লাগেজ্ তুলে নিলাম নিজেই। ছোক্‌রা চাকরটা অতি কষ্টে আমার ব্রীফ্-কেস্‌টা তুলে আনলো মাথায় করে। একেবারেই বাচ্চা ওটা! ওর হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিতে ও একেবারে সমস্ত কটি দাঁত মেলে ধরল নিঃশব্দে। চোখটা, উপরি পাওনায়, গোল্লা হয়ে গেছে!

রাধার দিকে চেয়ে বললাম, 'এই, ঘরটা একটু ফাইনাল চেক্ আপ্ করে এসো তো, কোন দরকারি জিনিস ফেলে গেলাম কি না?' রাধার সাথে বন্দনাও ভেতরে ঢুকে গেল। সেই ফাঁকে দুই মাসীকে প্রণাম সেরে নিলাম। মাসীমাদের আলিঙ্গন-মুক্ত হয়ে শেষ কথাক'টি বলতে বলতে ট্যাক্সির দরজা খুলে দাঁড়াই। রাধা-বন্দনা খালি হাতেই এসে দাঁড়ায়—স্বাভাবিক। ট্যুর্ করে করে, আমার কখনো কিছু ফেলে আসা স্বভাব বিরুদ্ধ।

যখন কিছু আর কথা বলার থাকে না সেই মুহূর্তটাতেই ট্যাক্সিটা, ধীর গতিতে মাটি কামড়ে কামড়ে, শিকড় তুলতে তুলতে গেটের বাইরে চলে এল।

১৭

বাদল-ভাঙা রোদের আঁচটা খু-ব চোখে লাগে। ট্যাক্সিটা বাঁক নিতে ছায়া পেয়ে বাঁচলাম।

পথে সেই লক্ আউট্ কোম্পানীটা খুলেছে মনে হ'ল। ধর্মঘটিরা নেই। সিকিউরীটি গার্ড্ মস্ত দরজাটা ঠেলে একটা গাড়ীকে পাস করাল।

কলকাতার এল্ নাইনের ট্রলি বাসগুলোর মত এখানে প্রায় রুটেই ওই বাস। তফাৎ, ভিড়টা এখানে বড়ই পাত্‌লা।

রেলওয়ে ট্র্যাকের সমান্তরাল রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকে দূরে সরে গেল পথটা।

৫৩

ভি টি-র লাগেজ রুমে জিনিসপত্র রেখে, স্লিপ্ নিয়ে বাইরে এসে, আর একটা ট্যাক্সি ধরে, কারিম্ভয় রোডের বিরাট ম্যান্‌শন্‌টার সামনে যখন এসে দাঁড়ালাম, তখন ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় দুটো।

অনেক অফিসের ভিড়ে কাস্টোডিয়ান অব্ এনিমি প্রপার্টির ঘরটা নতুন লোকের পক্ষে খুঁজে নেয়াই মুস্কিল। দুই পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীর, এ্যাড্‌হক্ রিলিফ দেবার দেড়শ কোটি টাকা যার হাত হয়ে বের হচ্ছে, তার অফিসের - গর্ব করার মত একটা সাইন্ বোর্ড পর্যন্ত নেই!

৫৪

সেই মাদ্রাজী ক্লার্কটি আমার দিকে একবার চেয়েই উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসতে বলল। এক সপ্তাহের ব্যবধান, এর শান্তজীবনে হয়তো কোন ঢেউ তোলেনি, আমার ভাগ্যের মত। তাই আমায় এক নজরেই চিনেছে।

এ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট্ কাস্টোডিয়ান্ মহিন্দর সিং, কী একটি নোট দিতে দূরের টেবিলের কাছে এলেন দেখলাম। আমার দরকার এর বস্‌কে, আগে। ওখানে ফেল্ করলে একে ধরবো, এই ইচ্ছা।

আমার আগের দিনের স্লিপ্ লেখা কাগজটাকে ভদ্রলোক অমন যত্ন করে রেখে দেবেন ভাবিনি। তারিখটাকে নিজেই কেটে আজকের তারিখটা বসিয়ে, রঙ্গস্বামীর টেবিলে পাঠিয়ে দিলেন।

দু'এক মিনিটেই কল্ এলো। ক্লীন শেভ্‌ড্; পঞ্চাশোত্তর, স্বাস্থ্যবান, সৌম্য মুখমণ্ডলের অধিকারী এম্. কে. রঙ্গস্বামী—পূর্ণ ব্যক্তিত্বে ভরা। হাই-মাইয়োপিক্ কাচের গোল গোল রীং-এর ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানোটা যেন ভেতর পর্যন্ত পড়ে ফেলছেন।

বাঁ-হাতের ভঙ্গীতে আমায় একটা চেয়ারে বসতে বললেন। হাতে একটা নীলাভ ফাইল। ভেতরের কাগজপত্র মন দিয়ে দেখছেন।

—'ইয়েস্ মিঃ চাউটদ্রূড়ী!' গম্ভীর কণ্ঠ—মুখের ভেতর অবস্থিত স্যালাই-ভারী গ্ল্যাণ্ড্‌গুলোকে শুকনো খটখটে করে দেয়। উনি আরও একটু বলেন, 'হাউ ক্যান্নাই হেল্‌প্যু?'

বললাম, 'আই হ্যাভ্ কাম্ অন্ দ্য ওয়ে ফ্রম্ ক্যাল্‌কাটা টু—' বাধা দিয়ে চাড়ী বললেন, 'ওয়েল্, আই ক্যান্ রেকগ্‌নাইজ্ বেংগলীজ্ ফ্রম্ আদার্ ইন্‌ড্রিয়ান্‌স্। নাউ, হোয়াট্ নেক্সট্?'

বিনীতভাবে ওঁর সই করা চিঠিটাই, ওঁর টেবিলে এগিয়ে ধরলাম। এক ঝলক দেখে নিয়েই বললেন, 'হোয়াট্ ইউ ওয়্যার ডুয়িং অল্ দিজ ডেজ? স্লীপিং?? হোয়াই ডিডনট্ ইউ এ্যাপ্লাই আর্লিয়ার্? উই ওয়্যার্ এ্যাডভার্ট্াইজিং সীন্স সিক্সটিফাইভ—'

খুবই সংকুচিত হয়ে বলি, 'ইট্ মীস্‌ড্ আওয়ার্ নোটিস্ এ্যাণ্ড্—'

—'ইউ ডন্‌ট্ রীড নিউজপেপার্‌স?'

—'ইয়েস উই ডু, বাট এ্যাজ মাই ফাদার ইজ এ্যান ওল্ডম্যান, এ্যাণ্ড আই ওয়াজ পোস্টেড আউটসাইড ক্যাল্‌কাটা, উই—'

মনে মনে বললাম—তোমার এ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখে অন্ততঃ পূর্ব-বাংলার কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি, ভারত গভর্ণমেন্ট সত্যিসত্যি টাকা দেবে—কেউ বিশ্বাসই করেনি! আমাদেরও ওই দশা। স্বামী সাহেব আমার বাবার ফাইল্‌টা আনতে বললেন, একজনকে। সে আসার আগেই প্রশ্ন করলেন, 'হু আর্ ইয়োর্ কো-শেয়ারার্‌স?'

—'মাই ফাদার্, মাই সিস্টার এ্যাণ্ড মাইসেল্ফ, উই থ্রী আর্ মাই ফাদারস কো-শেয়ারস।'

— হাউ!' চোখ কপালে তুলে বললেন।

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'উই কাম অব দ্য মিতাক্ষরা গ্রুপ সো—' কিছুতেই মিতাক্ষরার ইংরেজী প্রতিশব্দটা মনে এলো না।

আমার ফাইল্‌টা খুলতে খুলতে বললেন, 'মিটাকরা? —হোয়াটস দ্যাট!'

—'এভরি ডাইরেক্ট মেম্বর অব দ্য ফ্যামিলি বিকামস এ কো-শেয়ারার অব হিজ ফাদার ফ্রম হিজ ভেরী বার্থ। এ্যাণ্ড অলসো হিজ মাদার—'

বাবার হাতের লেখা পুরানো ফরমটা পড়তে পড়তে ঝট করে বললেন, 'আব্দুল্ রহমান চৌধুরী! ইয়োর ফাদার?'

—'ইয়েস।' উত্তর দিই।

—'হোয়াই আড় ইউ হিয়ার ?' আর কেন, তোমায় খোষামোদ করতে, আবার কী! তবু বললাম, 'যাস্ট্ টু সেট্ মাই কেস্ ইন্ অর্ডার।'

—'নো—নো, হোয়াই ইউ আর ইন ইন্ডিয়া ?' এতোক্ষণে বোধগম্য হ'ল ব্যাপারটা। মুসলমান হয়েও, পাকিস্তান ছেড়ে কেন ভারতের বাসিন্দা! এ প্রশ্ন সবাইকার। অথচ ভারতীয় মুসলীম কমিউনিটিকে কেউ এ প্রশ্ন করবে না 'হোয়াই ইউ আর হিয়ার ?' ভারত, 'সেকুলারিজম'-এ বিশ্বাসী। যাক, আবার সেই পারিবারিক ইতিহাসের পাতাটা ফরফর করে উল্টে গেলাম, স্বামী সাহেবের অবাক হয়ে স্থির হয়ে যাওয়া, চোখের সম্মুখে।

বললাম, 'হোয়েন দ্য গভর্ণমেন্ট অব প্যাকিস্তান সীজড্ আওয়ার গানস্ এণ্ড অদার সীকিউরিটি আর্মস্ - মাই ফাদার ডিসাইডেড টু—।'

'আই সী।' খুব গম্ভীরভাবে বললেন, 'ডু ইউ হ্যাভ এনি কমন শেয়ার উইথ ইয়োর হিন্দু কাউন্টারপার্ট—দ্য অরিজিনাল ফ্যামিলি ?'

—'ইয়েস।' একটু ঢোক গিলে বললাম, আওয়ার হাউজেস এ্যাণ্ড হোমস্টেড ল্যাণ্ড আর কমন বাট প্রপারলি পার্টিশনড্।'

—'হ্যাভ ইউ এনি ডকুমেন্ট ফর দ্যাট ?'

—আই হ্যাভ ওয়ান ম্যাপ উইথ সীগনেচারস অব দ্য কো-শেয়ারস্।'

—'হুম! ডু ইউ হ্যাভ আদার ডকুমেন্টস্ অব ইয়োর ক্লেমস্ হিয়ার ?'

বাবার কাছে জমিদারী চলে যাবার পর গোটা তিনেক চিঠি এসেছিল। খাসল্যাণ্ড গভর্ণমেন্টের হাত থেকে বুঝে নিতে, অনুরোধ। খাসল্যাণ্ডের মধ্যে ফরেস্ট আছে, এগরিকালচারাল-ল্যাণ্ড আছে, আর আছে 'হাতড়' অর্থাৎ জলমহল। কিন্তু তার কোনটা কত একর জমি, সে উল্লেখ নেই তাতে! এইটে বলা এখন ঠিক হবে, কি, না—

—'সাম হাউ আই উইল বী এবল্ টু প্রুভ—'বলে ফেলি।

—'নো- ইন্‌ডাইরেক্ট বীজনেস হিয়ার—ব্রিং ডকুমেন্টস এ্যাণ্ড টেক্ মানি—আই এ্যাম রেডি হিয়ার টু গিভ ইউ মানি।' নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন রঙ্গস্বামী! ইয়োর হিন্দু কাউন্টার-পার্ট মাইট বী এবল টু প্রভাইড—'

বললাম, 'আই এক্সপেক্ট আই উইল বী এবল টু প্রোডিউস ডকুমেন্টস—দ্যাট আই উইল রীসিভ ফ্রম মহারাজা অব সোমেশ্বর স্টেট।' মহারাজা বলেছিলেন 'তোমারে নিশ্চয়ই আমি ডকুমেন্ট দিবাম। আমার কাসে সমস্ত ডকুমেন্ট ছবির মত সাজানি আসে।' আরও বলেছিলেন 'আমার ছেলেদের কোন ইন্টারেস্টই নাই—তাদের টাকার দরকারও নাই। তোমার জন্যে আমি নিশ্চয়ই নিয়া আইবাম। এখন শরীরটা ভাল যাইতাসে না। ছেলেদের একজন কেউ কলকাতায় না আইলে, তো—একা ট্রেনে চাইপ্পা—যাওন যাইত

না। সাহস হয় না রে—আইজ্ কাইল নিজের উপরে আর ভরসা করন যায় না। তোমারে ডকুমেন্ট আমি নিশ্চয়ই দিবাম। তোমার দেশের প্রতি খুবই টান আসে এইডা আমার খুবই ভাললাগসে।'

কো-শেয়ারের কথায় কাস্টোডিয়ান বললেন' 'ওহ দিজ প্রবলেমস আই হ্যাৎ নট্ট ফেসড ইন দ্য ওয়েস্ট।' হাত নেড়ে নেড়ে বিদ্রূপ করে বলতে থাকেন। কথাটা একদম বিশ্বাস করতে পারলাম না। কো-শেয়ারার ইজ কো-শেয়ারার। শরিক কোনদিন আত্মীয় হয় না। ওয়েস্ট অর্থাৎ পাঞ্জাবে শরিকী ঝামেলা একই ছিল বাপু! তোমার কুবেরের ভাণ্ডার যেমন অকৃপণ হাতে পশ্চিমের দিকে খুলে দিয়েছ—পুবের দরজাটাও সেইভাবে খোলা থাকলে দেখবে, শরিকী ঝামেলা. এখানেও নেই!

শেয়ার নিয়ে এখানে কী ঝামেলা হচ্ছে, স্বামী সাহেবের মুখে শুনে তো আমি থ! কলকাতায় এবারের হিয়ারীং-এ একজন ক্লেমেন্ট্, তাঁর একমাত্র সহোদর ভ্রাতা সম্বন্ধে উক্তি করছেন 'হি ইজ নট এ লিগ্যাল সান অব মাই ফাদার। আই এ্যাম দ্য অনলি সাকসেসর অব মাই ফাদারস প্রপার্টি---!'

এসব শুনে নার্ভাসই হয়ে পড়লাম। বাবার আর সব হিন্দু কো-শেয়ারার-দের মুখগুলো মনে পড়ল। এ'দের যে কেউ এ ধরনের মিথ্যা উক্তি করতে কুণ্ঠিত হবেন বলে মনে হলো না। তিনপুরুষ ধরে ভাগ হতে হতে মহারাজা এখন যতটা সম্পত্তির অংশীদার, আমার বাবাও, নিজের কোন ভাই বা কাকা জ্যাঠা না থাকায়, ওই সমান অংশের অধিকারী। এই ব্যাপারটা, অন্য কোন শরিক ভালো চোখে দেখেন না।

কাস্টোডিয়ান সবশেষে বললেন, 'আই ক্যান গিভ টুয়েন্টি লাকস টু ওয়ান ব্রাদার, এ্যাণ্ড যাস্ট টুয়েন্টি রূপীজ টু হিজ কো-শেয়ারার।' বললেন, 'আই অ্যাম গড্ড্! আই অ্যাম প্রোটেক্টেড ফ্রম অল সাইডস!' বললেন. 'আই ক্যান অফার এনি এ্যামাউন্ট দ্যাট আই থিঙ্ক বেস্ট।' চোখের সম্মুখে দেখলাম স্বয়ং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ আবির্ভূত হয়ে বলছেন, 'সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং……।'

৫৫

বাবার ফাইলটাকে আবার পথে এনে, অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম, তখন ঠিক চারটে! পুরো দু'ঘন্টা ভদ্রলোক আমাকে সময় দিয়েছেন! কলকাতা থেকে এতদূর ছেলেটা এসেছে—এইসব ভেবেই হয়তো! অথবা, স্বামী সাহেব বকতে খুব ভালোবাসেন, তাই?

সাউথ্-ইণ্ডিয়ান্ ভদ্রলোক ইশারায় আমার কাজ সমাধা হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। আমিও এগিয়ে গিয়ে ওকে-ও ধন্যবাদ দিলাম। একটা চেনা চেহারার ভদ্রলোক পেছন ফিরে, ক'টা টেবিল দূরে বসে, কথা বলছেন নীচু স্বরে। কথা বলতে বলতে ওদিকেই তাকাচ্ছি বারবার, ঘাড়টা ফেরালেই দেখব চিনি কিনা। চট্ করে চোখে পড়ল, ফাইলের তলা দিয়ে আপাতঃ অনিচ্ছুক কেরাণীটির হাতে কতকগুলি লম্বা লম্বা, কালচে-নীল রঙের কাগজ, পাচার হয়ে গেল !! ভদ্রলোক কে ? কী সাহস !

ইনিও কাস্টোডিয়ানের দর্শনাভিলাষি। বেয়ারা খবরটা দিতেই, উনি উঠে দাঁড়ালেন। ঘুরে আমাকে দেখেই লাফিয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বলল, 'রাজা ! তুমি এখানে !?' হাসতে হাসতে ওর থাবার তলা থেকে নিজেকে মুক্ত করে বলি, 'বোধহয় উদ্দেশ্যটা এক, এ্যাপ্রোচ্টা আলাদা।' ও কিছু না বুঝে, অথবা বুঝেই চোখ টিপে বলল, 'বস, তোমার কাজ হয়ে গেছে ? আমি একটু কথা বলে আসি স্বামীর সাথে। তুমি যেও না, খু-ব দরকার আছে।' বলেই আর দাঁড়ালো না, কাস্টোডিয়ানের ঘরে ঢুকে গেল। ধুতি-পাঞ্জাবী পরা, স্থূলকায়, সৌম্যদর্শন, শচীকান্তকে বেশ জমিদার, জমিদার দেখতে, কিন্তু !

শচীকান্তর সঙ্গে আমার কোন ফর্মালিটির সম্পর্ক নেই। ও খু-ব মিশুকে। ওর সাথে বার দুয়েক শিকারেও গিয়েছি। ডুয়ার্সে আর তুরার কাছে 'বাঘমারা'তে।

৫৬

বসে বসে সাউথ্-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোকের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম। এই 'স্বামী সাহেব' থার্টি নাইন থেকেই কাস্টোডিয়ান অব্ এনিমি প্রপার্টি। সাউথ্ আফ্রিকা থেকে ইনি-ই গিয়ে বিতাড়িত ইণ্ডিয়ানদের টাকা নিয়ে এসেছিলেন। পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া—সম্পত্তি থেকে নন রেসীডেণ্টদের টাকা, এখানে ছিল একশ' বাহান্নকোটি ! আর পাকিস্তান, নন্-রেসীডেণ্ট হিন্দুদের টাকা পেয়েছিল তিনশ' তিপ্পান্নকোটি ! যুদ্ধের পর, পাঞ্জাবকে দিয়েছিল—বিরাশি কোটি ! এ থেকেই সব খরচাটরচা বাদ দিয়ে রয়েছে তিপ্পান্ন কোটি টাকা। খুব শান্ত ভাবেই টাকার অঙ্কগুলো শুনছিলাম। হঠাৎ মনে হলো একশো লাখে এক কোটি হয় ! ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল তখনি। তাহলে ঠিকমত ডক্যুমেন্ট্ সাবমিট করতে পারলে ভালোমত টাকাই পাওয়া যেতে পারে ! পাঁচ অঙ্কের ভাবা

সংখ্যাগুলোর বাঁয়ে, হঠাৎ আরও একটি সংখ্যা দেখতে পেলাম যেন ? কত হাজার নয়, কত লাখ পাওয়া যাবে, সেটাই চিন্তা হওয়া উচিত ! 'ব্রীং ডকুমেন্ট্ এ্যান্ড টেক্ মানি...' কাস্টোডিয়ানের কথাগুলো মনে হলো। সেই সাথে মনে পড়ল, পাঞ্জাবের বেলায় ডকুমেন্ট্ দেখার প্রয়োজন হয় নি ! ! !

এদের কফি খাবার টাইমে আমার সামনেও এক কাপ কফি রাখল বেয়ারাটি। সাড়ে চারটায় এ্যাসিস্ট্যান্ট্ কাস্টোডিয়ান্ চলে গেলেন। দু'জন কেরাণীও খস্ল। পৌনে পাঁচটা-নাগাদ কাস্টোডিয়ানের সাথে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এল, শচীকান্ত সান্যাল। ভদ্রতাসূচক উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গী করে আবার বসেই থাকি স্বামীসাহেব খুব তড়বড় করে কথা বলতে বলতে অফিস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন. সাথে একনিষ্ঠ শচীকান্ত সম্পূর্ণভাবে আমার কথা বিস্মৃত হয়ে! তাজ্জব! অন্য কেরাণী ক'জন গোছগাছ করে উঠে পড়ছে। আমি আর কি করি ?

করিডর দিয়ে চলার সময় সদ্য অফিস ভাঙা ভিড়ের ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেলতে ফেলতে রাস্তায় এসে দাঁড়াই। দেখলাম দন্তদন্ত হয়ে শচী আসছে। আমায় দেখেই বলল, 'আরে চলে এলে কেন ? চল, চল ওপরে।' অনেকগুলো চলমান গাড়ীর ব্যূহ ভেদ করে আবার ফিরলাম।

—'আর কি হবে ? অফিস তো বন্ধ হয়ে গেছে।'

—'মহিন্দর সিং চলে গেছে ?' শচীর অন্যমনস্ক প্রশ্ন।

—'হ্যাঁ, ও তো আগেই বেরিয়ে গেল।' ভিড়ের উল্টোদিকে পাশাপাশি আর হাঁটা যায় না। আমি পেছন পেছন চলি। আবার ঘরে প্রবেশ করতেই বৃদ্ধ বেয়ারাটি সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে থাকে। শচীকে দেখলাম বেয়ারাটির ঘাড়ের ওপর দিয়ে কি যেন দেখছে ! কয়েকজন দারোয়ান লম্বা লম্বা দরজাগুলো বন্ধ করে ছিটকিনি আটকাচ্ছে। ঘরটায় দুটি বাল্ব্ জ্বলছে ; তবুও, কেমন অন্ধকার অন্ধকার ! শচী দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ওর ফেলে আসা এ্যাটাচীটা তুলে নিল। ওর দৃষ্টি, টেবিলের ওপর তখনও পড়ে থাকা ফাইল্গুলোর ওপর। হঠাৎ অসাবধানতায় এ্যাটাচীটা খুলে গিয়ে ভেতরকার কাগজপত্রগুলো সব ছড়িয়ে গেল মাটিতে, কিছু চেয়ারে ! বৃদ্ধ বেয়ারাটি সঙ্গে সঙ্গে এসে নীচু হয়ে সেগুলো গুছিয়ে তুলতে লেগে গেল। নীচু আমিও হতে গেলাম। শচী ইশারায় আমাকে হাতের কাছের ফাইলটা খুলতে ইঙ্গিত করল ! আমি বিস্ময়ে বোকা হয়ে দেখলাম, ফাইলের ভেতর থেকে একটি তিনটাকার ষ্ট্যাম্পের ওপর এ্যাফিড্যাভিট্ করা দলিল চট্ করে বের করে, সেই জায়গায় বৃদ্ধের হাত থেকে তক্ষুনি তুলে নেয়া ওই রকমই

একটা দলিল রেখে, নিপুণ হাতে ফাইলের রঙীন ফিতে বেঁধে ফেলল ! ব্যাপারটা বলতে যত সময় লাগল ঘটল কিন্তু তার অনেক—অনেক কম সময়ে !

যেন কিছুই হয়নি এমনি ভংগীতে, বেয়ারাটিকে সার্ভিসের জন্য পাঁচ টাকা (!) টিপ্‌স্‌ দিয়ে ফেলে, এ্যাটাচী নিয়ে মেজাজে বেরিয়ে পড়ল। পেছন পেছন রোমাঞ্চিত ও নির্বাক-আমি !! এবং বোধহয় প্রাপকটিও।

ট্যাক্সিতে বসে একটা আনন্দের ধোঁয়া ছেড়ে শচী বলল, 'তুমি উঠেছ কোথায় ?'

—'দাদারে, একটা পরিচিত বাড়ীতে।' সংক্ষেপে বলি।

—'চল আমার হোটেলে। ওদের ফোন করে দাও, এখানেই রাতটা কাটিয়ে যাবে।'

—'উঁহু। আমার আজকের ট্রেনে কোলকাতায় যেতে হচ্ছে।' হাসতে হাসতে বলি।

—'আরে দাদু, কলকাতায় গিয়ে কি হবে। ওতো আছেই !' কৌতুক করে ঠোঁট উল্টে বলে, 'বোম্বেটা এই সুযোগে একটু বেড়িয়ে নাও।'

—'আমি সাত দিন সাত রাত্রি ধরে বেড়িয়েই যাচ্ছি—আর না, আর ভাল লাগছে না।' ধীর সংযত কণ্ঠে বলি।

—'এ্যা, বোম্বে ভালো লাগছে না ? বল কী ?' বিস্ময় গড়িয়ে পড়ে কণ্ঠে, চোখের পাতায়, ভ্রু-জোড়ায়। 'তোমার রিজার্ভেশন্ আছে ?' শচী আর একটু প্রশ্ন করে জেনে নেয় 'লগেজ্ কিছু নেই সাথে ?'

—'আছে ভি. টি তে। এখন হাতে সময় আছে। চল তোমার হোটেলে একটু আড্ডা মারি, ততক্ষণ।'

৫৭

অল্প দূরেই, তিন অথবা আড়াই তারকার একটি হোটেলে গাড়ীটা দাঁড়াল। একটা টু সিটার সেল্ফ্ কন্‌টেইন্‌ড্ রুম্। ইণ্টারকমে রুম্-সার্ভিস্‌কে কিছু নির্দেশ দিয়ে বিছানায় বসল শচী।

—'স্বামী কি বলে ?' ছোট্ট প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল একটা। ওর নিজের ঘটনাটা ও নিজে না বললে, আমি আর জিজ্ঞেস করি কি করে ? ওটা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ।

—'কিছু না তো। আমাদের কেস্‌টার জন্য এসেছিলাম। বলল, সময় হয় নি। বলল, ডকুমেন্ট ছাড়া কিছু পাওয়া যাবে না।'

—তোমাদের স্টেট্ তো কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্‌-এ ছিল ! তোমাদের আর চিন্তা কি ডকুমেন্ট্ তো সাজানোই আছে।' নিশ্চিন্ত সুরে বলে, উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়। নীল রঙের উর্দি পরা বেয়ারা এসে দুটো এশিয়া সেফেন্‌টিট্‌না আর দুটো ঝক্‌ঝকে কাঁচের গ্লাস রেখে গেল সেন্টার টেবিলে। দুটো বিছানার ঠিক মাঝখানে।

বীয়ার-এর ছিপি খুলে দুটো গ্লাসে সমান সমান ঢালল শচীকান্ত নিজেই, এতটুকুও ফেনা না কেটে।

—'আঃ !' একটা আত্মপ্রসাদ-সূচক শব্দ করে গুছিয়ে বসল খাটে। ওর চাপে ডানলোপিলো গদিটা বেশ ঢুকে যায় মাঝখানে। চারপাশে বিছানার চাদরে ছাতার স্পোকের মত রীংকল্ ফুটে ওঠে।

বললাম, 'নাহ্। বাবার কাছে লেখা তিনটে চিঠি আছে শুধু। তাতে এইটুকু প্রমাণ করা যাবে, অনেক খাস্‌-ল্যাণ্ড্ ছিল। তার কোথায় কি, বা কত একর, এ সবের স্মৃতিই ভরসা।' রীলাকট্যান্টলি বলি।

শচী ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'সে কি, আরে না না, ডক্যুমেন্ট ছাড়া এসবের কোন লাভ নেই ! যা-তা একটা এ্যামাউন্ট দিয়ে দেবে। তুমি যোগাড় কর ডকুমেন্ট্। এ্যাফিডেভিট্-এ আইটেম্‌গুলো ঠিক সাজিয়ে দিয়েছো তো !'

—'এ্যাফিডেভিট্ তো এখনো চায় নি !'

—'ওঃ ! তাহলে তোমার অনেক দেরী আছে।' বীয়ারের গ্লাসটা এক চুমুকে ফাঁকা করে ফের ভর্তি করে নিল। আমাকে একবার ইশারাও করল গ্লাসটা তুলে নিতে। আবার বলল, 'এ্যাফিডেভিট্ করার আগে এবার কাগজপত্র যোগাড় করতে উঠে পড়ে লাগো। মহারাজার কাছে চাও না। ওঁকে যদি উইট্‌নেস্ করে দিতে পারো, তা-লে কেল্লা ফতে।' হেসে ওঠে ও। 'ওঁর বড় ছেলে মেঘবর্ণকে ধর। সে এখন ইন্দিরার লোক ! তার কেস্‌টার সঙ্গে নিজেকে একবার মিলিয়ে ফেলতে পারলে—ওঁদের যত দেবে, তোমরাও ততই পাবে। তোমার বাবার আর মহারাজার তো এখন সমান শেয়ার না ?'

—'মহারাজা তো দরখাস্ত-ই করেন নি।' ওর কথার উত্তর দিইনি।

—'এ্যা—কেন ?' হতবাক শচী !

—'উনি বলেন, ওঁদের দরকার নেই টাকার। ছেলেরা ওয়েল এস্টা-ব্লিশ্‌ড্। ওঁর জীবনও শেষ হয়ে এসেছে। এখন আর ওই কটা টাকা কোন কাজে আসবে।'

—'উনি কত টাকা এক্সপেক্ট্ করেন—ওঁর ভাগে ?' শচীকান্তর গম্ভীর

কণ্ঠ।

—'মহারাজা বলেন—ভাগে হাজার পাঁচশেক্ আইবো এর বেশী আশা কইরো না।' মহারাজার সুরেই কথাটা বলতে গিয়ে, হেসে ফেলি।

শচীকান্ত বলে, 'ও'র আর দোষ কি! প্রাক্তন জমিদারদের সকলেই ওই দশা। আমাদেরও ওই দশা। সাড়ে ছয়হাজার একর ফরেস্ট্—বাবা কত ধরে গেছেন জানো?'

আমি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়েই আছি। মনে আরেকটা প্রশ্ন জেগেছে।

—'কত জানো? পঁচিশ হাজার টাকা! একহাজার টাকা করে একর ধরলেও পঁয়ষট্টি লাখ টাকা দাম হয়।' শচীর খেদোক্তি।

বললাম, ফরেস্ট, জমিদারীর সাথে একোয়ার্ড হয়ে যায়নি কেন বলতো?'

—'বরে! জমিদারী যাবার আগেই তো ফরটিনাইনের প্রাইভেট্ ফরেস্ট্ এ্যাক্টে ওগুলোর ম্যানেজমেন্ট একশোবছরের জন্য নিয়ে নিল।' ওটা তো তোমার খাস্ প্রপার্টী—ওটা একোয়ার করতে পারে না।' প্রোফেসারের ভঙ্গীতে কথাটা শেষ করল শচী। শচী অবশ্য প্রোফেসরী-ই করে। কলকাতার কোন কলেজে।

—'প্রাইভেট্ ফরেস্ট? —আমাদেরটা তো রীজার্ভড্ ফরেস্ট হিসেবে নিয়েছিল!' চিন্তিতভাবে বলি।

—'রীজার্ভড্ ফরেস্ট্? তাহলে বোধহয় এটার ওনারশীপ্ ভেস্টেড্ হয়ে গেছে! তুমি কলকাতায় গিয়ে রীজার্ভড্ ফরেস্ট এ্যাক্টটা পড়ে নিও তো। যদি ওনারশীপ ভেস্টেড না হয়, তাহলে সেই পয়েন্টগুলো টুকে নিয়ে প্যানেলকে বোঝাতে হবে। শীড্ম্যাপ্ আছে তো—কত একর? একটা প্রিসিডেন্ট্ করাতে হয়......'

—'নাঃ শীড্ম্যাপ্ তো নেই। বাবার কাছে, মহারাজার কাছে শুনেছি সব শুদ্ধু বেশ কয়হাজার একর ফরেস্ট্ আছে, জয়েন্ট এস্টেটের। বাবার অংশ, দু'হাজার একর মত হবে। মহারাজারও ওইরকম।'

—'শীড্ম্যাপ যোগাড় করতে হবে তো।'

—'কোথায় পাবো?'

—'ঢাকায় চলে যাওনা! এক সপ্তাহের প্রোগ্রাম্ করে, সব ডকুমেন্ট্ নিয়ে চলে এসো। ঢাকা গেজেটে সব পাবে। এগ্রিকাল্চারাল্ ল্যাণ্ডের আর-ও ম্যার-ও যোগাড় হয়ে যাবে। ঢাকায় কোথায় উঠবে বলে দেব'খন।'

শচীকান্তর সোজা সল্যুশন্! আমার চুপ করে থাকাটা দেখে নিয়ে, এক চুমুক খেয়ে, বলল, 'যদি একটু বেশী টাকা খরচ কর, তাহ'লে কলকাতায় বসেই সব ডকোমেন্ট পেতে পারো।'

—'স্টেট একুাইজিশন ডিপার্টমেন্টে কাজ করতো একটা লোক। —সেই কাগজপত্র যোগাড় করে দেবে, বাঙলা-দেশ থেকে।'

—'গেজেটের নোটিফিকেশন-ও খুঁজে দেবে?'

—'হ্যাঁ, তার জন্য হয়তো ঢাকায় যেতে হবে তাকে। সেই চার্জটা করবে।'

—'কি রকম টাকা নেবে?'

—'তুমি কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা কোরো, আমি ইন্‌ট্রোডিউস্ করে দেব।'

আরো দুটো এশিয়া সেভেন্‌টিটু এসে ভিড় জমাল। আমার ওই একমেবাদ্বিতীয়ম্ প্রথমবারে ভরা গ্লাসটা ফাঁক করে উঠে পড়লাম।

—'চল তোমাকে তুলে দিয়ে আসি।'

—'থাক না কী দরকার, আমি চলে যাব।' তবু নীচে ট্যাক্সি পাওয়া পর্যন্ত শচী দাঁড়িয়ে এর ওর অনেকের গল্প বলল।

৫৮

এই সাতদিনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কখণ্ড মহাবিশ্বের অন্ধকারে ডুবে দিল। লোড্‌শেডিং-এর প্রকোপ এদিকেও আছে, তবে কম। হঠাৎ আলো থেকে এসে দারুণ অন্ধকারের ভেতর দিয়ে পথ করে যেতে হচ্ছে, শতশত স্থূল-যানের কুটিল দৃষ্টির আঘাত সইতে সইতে। কেন জানিনা মনে হচ্ছে থেকে, থেকে, আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি? আকাশের মুখ ভার।

৫৯

ভি টি র প্ল্যাটফর্মে যখন ঢুকলাম, ট্রেনটা তখনই সাইডিং থেকে টেনে আনা হলো। —যাত্রীর ব্যস্ততা, কুলি হাঁকা হাঁকি—আমি তখনো চুপ করে লাগেজের সামনে দাঁড়িয়েই আছি। কুলিটি সীট খুঁজে নেবার তাগীদ্ দিচ্ছে। আমাকে ছাড়লে, আরেকটি যাত্রীকে পকেটস্থ করতে পারে হয়তো।

সীট্ এ্যালোটমেন্ট্ ক্লার্ক কামরার নির্দিষ্ট দেয়ালে, কাগজগুলো সেঁটে দিচ্ছে। অনেকের সাথে গলা বাড়িয়ে আমার অবস্থানটা দেখে নিতে চেষ্টা করি। বিফল হয়ে দণ্ডায়মান এ্যাটেনডেন্ট্ ক্লার্ককে আমার নামটা বলি। ও চট্ করে ওর কপিটাতে চোখ বুলিয়ে বলে, 'এফ কেবিন, লোয়ার বার্থ।'

কুলিকে ইশারায় ডেকে নিয়ে দরজার কাছে পৌঁছে খেয়াল হলো 'এফ' কেবিন হয় কম্পার্টমেন্টের এ মাথায়, না হয়তো একদম ওই মাথায়। কোন দরজা দিয়ে ঢুকলে কাছাকাছি হবে ভাবছি, একজন দরজার কাছে এসে বলল, 'দু'নম্বর 'বী' হ্যায়, উস ক্যাবিনমে উঠাও।' কুলি এবং কতকগুলি বাচ্ছা, ক্যাও ম্যাও করে উঠে গেল। আমি ভিড় করিডরটা এড়িয়ে, ওমাথার দরজা দিয়েই প্রবেশ করলাম। কুলিকে তিনটে টাকা দিতে, সে একটি কথাও না বলে, আমার হোল্ডলটা খুলে, বিছানাটা পেতে দিয়ে চলে গেল।

বিছানার চাদরটা চারপাশে ভাল করে গুঁজে—বালিশটাকে মাঝখানে সরিয়ে জানালা ঘেঁসে বসলাম। আর একটিও বাঙালী মুখ চোখে পড়ল না। অনেক যাত্রীর মেলায় কাকে যেন এক্সপেক্ট করছি, অথচ কারোই তো আসার কথা নয়! ভিক্টর অবশ্য বলেছিল সময় পেলে স্টেশনে আসবে।

স্টেশনে ঢোকার মুখে দেখেছিলাম আকাশে মেঘ। এখন ট্রেন ছাড়ার মুখে বৃষ্টি নামল। শেষ মুহূর্তে জলে ভেজা মালপত্র নিয়ে ঢুকল একজন আর্মি অফিসার আর তার পেছন পেছন ততোধিক স্নাতঃ, একজোড়া স্বামী স্ত্রী। আর্মির ভদ্রলোকটি আমার দিকের আপার বার্থের নাম্বার মিলিয়ে জিনিসপত্র ঠিক করে রেখে, আমার বিছানাতেই বসে পড়ে একটু হাসলেন। আমার থেকে অল্প বড় হবে বয়সে। ক্লীন শেভড পাঞ্জাবী। উল্টোদিকের কাপলটি পাশাপাশি বসে, নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ব্যস্ত। মহিলাটি নিঃসন্দেহে সুন্দরী। ফিল্ম-এ্যাকট্রেস এর ভংগী, কথায়, ঢঙে, সাজসজ্জায়। বেশ কনশাসলি আঁচলটি হাতের ওপর ফেলে দেওয়া। বোধ হয় গুজরাতী।

রাতের খাবার অর্ডার দেবার পরই, ট্রেনটা নড়ে উঠে গতিশীল হলো। কেন জানিনা প্ল্যাটফর্মের প্রতিটি কোণে বারবার দৃষ্টি ঘুরে আসতে থাকল; কাকে যে খুঁজলো কে জানে।

ভি টি ছাড়বার পরেই বৃষ্টির ছাঁট আসায়, শার্সীটা নামিয়ে দিতে হলো। উল্টোদিকে আমার দেখাদেখি কাঁচটা নামিয়ে দিলেন মহিলাটি। ওইটুকু হাওয়ার দমকেই ম-ম করে উঠল দামী এসেন্সের গন্ধ। ক্যাবিনে অনেকক্ষণ থেকেই চাপা সৌরভ ভেসে বেড়াচ্ছিল। এবার তার উৎস অনুধাবন করলাম। হঠাৎ মনে হলো স্যুটকেসে বুলার দেয়া প্যাকেটটা রয়েছে। সেই সাথে মনে পড়ল বাঘনখের মালা খুঁজে বন্দনাকে দেয়া হলো না। বেচারী চেয়েছিল একটা শখ করে। খুব খারাপ লাগছে এখন।

দাদারে ট্রেনটা ঢুকল আধঘণ্টা বাদে। গতি শ্লথ হতে হতে ট্রেনটা একসময় থামল। শার্সীটা তুলে দিতেই প্ল্যাটফর্মের কোলাহল ক্যাবিনে

এসে ঢুকল। হঠাৎ-ই চোখে পড়ে গেল রাধাদের বাড়ীর অনেকেই এদিক ওদিক ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে উঁকি দিয়ে আমাকে খুঁজছে। ওঠবার সময় লক্ষ্য করেছিলাম আমার আগের কম্পার্টমেন্টটা স্লীপার-থ্রি টায়ার। চট করে স্যুটকেসটা খুলে হাতড়ে প্যাকেটটা ধরেই ছুটে করিডর ধরে ওপাশের দরজা দিয়ে বের হলাম। মিঃ পি বি.-কে ঠিক দরজার মুখে পেলাম।

—'মেসোমশাই!' ডাকতেই পুরো দলটা ওখানে পুতুলের মত থেমে গিয়ে 'এই তো রাজা!' বলে চ্যাঁচামেচি করে হাসতে লাগল। মনে পড়ল বন্দনার বাবা কাল রাতে ফেরেন নি, মাসীমার কাছে শুনেছিলাম। কে এক বন্ধু থাকেন কোলাবায়, সেখানেই রাত কাটিয়েছেন, আজ একটু আগেই হয়তো ফিরেছেন. এরা ধরে নিয়ে এসেছে। শঙ্খ জড়িয়ে ধরল পেছন থেকে। কানে কানে বলল—না 'শালাদা' নয়। বলল, 'তুমিই আমার গতি করলে দাদা!' বুঝলাম রাধা মারফৎ খবরটা পেয়ে গেছে।

ওর আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে বন্দনার বাবাকে প্রণাম করতেই উনি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'আরে, রাস্তায় না রাস্তায় করতে হয় না।' পিঠ-টিঠ খুব চাপড়ে দিলেন. বললেন; 'তোমার কাজ হয়েছে?' হেসে বললাম 'হ্যাঁ! ঝামেলাটা ছাড়িয়ে গেলাম এবার আশাকরি অল্পদিনেই কল পাব।'

—'কাজ যে হয়েছে, সেটা তোমার চোখ দেখেই মালুম হচ্ছে।' রাধা জানাল। 'হাতে ওটা কী?' রাধাই প্রশ্ন করল। ওর হাতে লাল ফিতেয় বাঁধা প্যাকেট্টা ধরিয়ে দিয়ে বললাম, 'এতে যা আছে, দু'জনে ভাগ করে নেবে।' ইশারায় বন্দনাকেও দেখলাম।

—'কী আছে এতে?' রাধা অবাক হয়ে প্যাকেটটা টিপছে। 'তুমি তো আর জানতে না, আমরা আসবো স্টেশনে—' রাধা ঠিক জায়গায় ধরেছে। আমারই উচিত ছিল আজ সকালে ওদের বাড়ীতেই এটা দিয়ে দেওয়া। তবু বাঁচার জন্যই বললাম 'না তোমরা না, ভিক্টর আসবে বলেছিল।' ভিক্টর হেসে সম্মতি জানাল ভাগ্যিস! নিখরচায় সেন্টের প্রেজেন্টেশন্ পাচার করে দিয়ে বেশ রীলিভড্ হলাম। এতক্ষণ বন্দনা একটাও কথা বলেনি। ওর ভুল ভেঙে যাবার পর থেকেই ও কথা বন্ধ রেখেছিল। মেসোর তাগাদায় ট্রেনে উঠে পড়লাম। সীগ্ন্যাল্ দিয়ে দিয়েছে। বৃষ্টি মুসলধারে পড়ছে। করিডর দিয়ে ফের নিজের জায়গায় এসে বসলাম। জানালার ওপাশে আমার বন্ধুরা তখন ভিড় করে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ রাধা বলল 'তুমিও যাচ্ছ না কি, পৌঁছে সংবাদ দিও।' অবাক হয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি! কি বলতে চাইছে ও! আমি তো যাচ্ছি-ই! হঠাৎ-ই পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি। শঙ্খও উঠেছে আমার পেছন পেছন!

মিষ্টি মিষ্টি হাসছে। ট্রেন এক্ষুণি ছেড়ে দেবে। ওকে জোর করেই নাবিয়ে দিয়ে এলাম।

ফের জানালার কাছে আসতেই মোশন্ নিল ট্রেনটা। আমার বাড়ানো হাত সবাই ছুঁলো। একটু দ্বিধা করে বন্দনাও চট্ করে চেপে ধরল আমার হাতটা। ট্রেনের সাথে দুই-পা হেঁটেও এলো। অনেক কষ্টে আবেগ ভরা কণ্ঠে বলল 'দাদা— ।' ট্রেনটা তখনই স্পীড্ নিল।

৬০

তখনই লম্বা প্ল্যাট্ফর্মের মাঝামাঝি এ এস. এম -এর ঘরের সম্মুখে নিয়ন লাইটের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, সাদা লেসের জন্মদিনের সেই পোষাকে, স্থানুর মত একদৃষ্টে তাকিয়ে, দাঁড়িয়ে আছে বুণাকুমার !! নিজের অজান্তেই সীট্ ছেড়ে ঝুঁকে উঠে গিয়েছিলাম। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যেতেই সবাইকার সপ্রশ্ন দৃষ্টির সম্মুখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। আমার স্যুট্কেসটা তখনও খোলা পড়ে আছে। ওটাকে নীচু হয়ে বন্ধ করে সীটের নীচে ঠেলে দিই।

৬১

খাবার দিতে দেরী আছে। আক্কেরী না নাসিক্-এ কোথায় দেয় জানিনা।

আমার বার্থের আর্মি অফিসার, একটু ইতস্ততঃ করে খুব কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন। আমি তাকাতেই বললেন, 'উড্ ইউ মাইণ্ড্, ইফ্ আই ফিক্স্ এ ড্রিঙ্ক ফর ইউ ?' চট্ করে বুঝে নিলাম। আমি অনুমতি দিলেই উনি একটু মদ্যপান করতে পারেন। আমি বললাম,

—'থ্যাঙ্কস্, আই ডোন্ট ড্রিঙ্ক এ্যাল্কোহল্ ভেরী অফন্। ইউ মে হ্যাভ ইয়োরস।' আমি অজানা লোকের সঙ্গে কখনও মদ খাই না। তাছাড়া যেটা খাই, সেটা বীয়র। বীয়র তো আর মদ নয়! লোকটি নাছোরবান্দা 'আই এ্যাম্ ফিক্সিং এ স্মল্ ওয়ান্ ফর ইয়ু।' আমার ইতস্ততঃ ভাবের মধ্যেই ও একটা ফ্লাস্ক্ থেকে প্লাস্টিকের মগে ঢেলে দিল খানিকটা। নিজেও ভর্তি করে নিল। ক্যাবিনে যে আর দু'জন আছে সেটা একদম বিস্মৃত হয়ে, ও আমাকে যুদ্ধের অনেক চমকপ্রদ ঘটনা শোনাতে লাগল। পঁয়ষট্টির ওয়ার-এ প্যাটন্ নগরী কি করে বানালো—ইণ্ডিয়ান্ আর্মি, কি করে কচ্ছের ছাম্বে ও লীড্ করেছিল একটা স্কোয়াড্রন, আর অডিয় ভিসুয়াল

এফেক্ট্ দেখাচ্ছিল, হাত নেড়ে আর কণ্ঠস্বরের ওঠানামায়। ভদ্রলোক এমন একটা সিকোয়েন্স্ তৈরী করে ফেললেন যে ওই ম্যাগনেটিক, এ্যাটমস্‌ফিয়ারে বাকী দুটো প্রাণী কখন আকৃষ্ট হয়ে আলোচনায় যোগ দিতে লেগেছে, খেয়ালই হয়নি। সবচেয়ে মজার কথা, তিনজনেই একই সোর্স থেকে মদ এবং গল্প আহরণ করে যাচ্ছি! যুদ্ধের গল্পেরও একটা মাদকতা আছে।

গল্প একটু থামল, কোন স্টেশনে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে। বেয়ারা এসে আমার আর মিঃ সুনীল বার্ণালার খাবার দিয়ে গেল। আশ্চর্য দু'জনের ডায়েট-ই এক ড্রাই চিকেন আর চাপাটি। খেয়াল হলো, গল্পের রেশ টেনে নিতে তখন আর আপত্তি করিনি—কিন্তু মাথাটা বেশ ভার ভার লাগছে। পেগের তো আর মাপ ছিল না।

৬২

ঘুম থেকে সকালে উঠে চুপচাপ কাঁচের জানালা দিয়ে সূর্যোদয় দেখছি। বাকী তিনজন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কটা দিন আগেই একটা সূর্যাস্ত মনে পড়ে যায়। 'আই লভ্-ইয়্যু রাজা' এখনো রোমাঞ্চিত হয় শরীর। কী তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঝাঁপিয়েছিল সেই কণ্ঠের অধিকারিণী। ওর সবটাই কি অভিনয়! সব অভিনয়! আর দাদার স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকাটা! আমার যদি ভুল না হয়—নিশ্চয়ই ওর দুচোখ-এর জলের ধারা, গাল বেয়ে পড়ছিল। অভিনয় দিয়েই হয়তো শুরু করেছিল। --কিন্তু কখন কোন সূতোর সূক্ষ্ম টানে, নকলটা আসল হয়ে গেছে, ও হয়তো তা বুঝতেও পারেনি। ওর বয়েসটাও তো কম! মাত্র চব্বিশ!

ব্রেক্‌ফাস্টের কিছু পর, গতকালের রিটার্ণ দিলেন মিঃ শর্মা, সস্ত্রীক। ওদের সাথে, বেতের বাস্কেটে বোম্বাই—এশিয়া-সেভেনটিটু, ও চারটে ঝক্‌ঝকে কাঁচের গ্লাসও বের হলো।

তারপর এই চলতে থাকল। ড্রিংকস্ এবং খাওয়া। খাওয়া এবং ড্রিংকস্। দু'পক্ষের কেউ কমতি যায় না। না কন্‌জাম্প্‌শান্, না স্টক্ ইন্ হ্যাণ্ড পজিশান্! তাজ্জব্ শুধু আমি। এরা পারেও খেতে! শচীকান্ত থাকলে আজ জমতো ঠিক। ও বোধহয় পরশুর টিকিট পেয়েছে, বলেছিল, মনে পড়ছে।

এরই মধ্যে লক্ষ্য করলাম মিসেস্ শর্মা বেশ আত্মীয়া-সুলভ ব্যবহার করছেন, আর্মির মিঃ বার্ণালার সঙ্গে। মিঃ শর্মা, দুপুরে যখন অচৈতন্য হয়ে দুলছেন গাড়ীর তালে তালে, এবং আমিও ঢুলুঢুলু। তখন চকিতেই দেখে-

ছিলাম মিসেস্ শর্মার ঠোঁট, দেহ নিষ্পেষিত হচ্ছে মি: বার্ণালার হাতের পেশীর চাপে। আর দেখতে ইচ্ছে হয় নি! ইচ্ছে করেই মুখটা দেয়ালের দিকে জোর করে ঘুরিয়ে রেখেছিলাম। এবং নিজের অনিচ্ছাতেই আবার জুহু বীচের আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করতে লাগলাম। আধো জাগরণে এবং স্বপ্নেও। আসলে বেশী ড্রিংক করলে ঠিক ঘুম আসে না-। কেমন একটা কোমা ধরনের স্টেজ্। ভেতরে পুরো জ্ঞান বাইরে তার অভিব্যক্তি নেই। চিন্তার মায়াজালের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে থাকি।

স্টেশনগুলো, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে, পেছনে উধাও হয়ে যাচ্ছে। তাদের এক-আধজনের সঙ্গে আমার পূর্বে একবারই পরিচয় হয়েছিল। বাকীরা অজানা। যাবার পথটা ছিল, আগ্রহের, আনন্দের কোমল পরশের হাতছানির। ফিরতি পথটা উদাসিকতায় ভরা!

একটা সময় বুঝলাম, পুরো ক্যাবিনটাতে আমি একা! বাকী তিনজন যাঁর যাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছেন। আমার পথ তখনো অনেক বাকী। অনেক দূর যেতে হবে, একা।

৬৩

ঘরে ঢুকতেই মা বললেন, 'ওই তো রাঙ্গু এসে গেছে।' বাবা ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন হাসিমুখে। ট্যাক্সি থেকে মাল নামিয়ে বিল মিটিয়ে কাছেই গাড়ী ব্যাক করার জায়গাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে এলাম। প্রণাম করে উঠছি মা বললেন, রাধা কে রে?' অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি কি করে জানলে ওই নাম?'

-- 'তোর পৌঁছ সংবাদে ওরই নাম ছিল তো নীচে।' বাবা টেলিগ্রামটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'বেশ লিখেছে ভাষাটা।'

এতো ফাজিল রাধাটা, লিখেছে— কমলা চৌধুরী (আমি 'কমল'-ই বলেছিলাম ও ভুল করেছে)--ইয়োর সান্ ইজ আণ্ডার গার্জেনশীপস্ অফ ফোর এ্যাডালটস এ্যাণ্ড থ্রী টেণ্ডার হ্যাণ্ডস ইন এ হোমলি এ্যাটমসফিয়ার — ডোন্ট বী ওয়ারীড আন্টি -- রাধা।!!

হাসতে হাসতে বললাম, 'পাগলী একটা।' জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে ঘটনাগুলি টুকরো টুকরো জোড়া লাগিয়ে, বর্ণনা করতে লাগলাম। স্নান করে এসে খেতে বসে, বাকীটা। খেয়ে উঠে শেষটা বলতেই বাবা বললেন, 'গ্র্যাণ্ডস'। 'মিশন সাকসেসফুল!'

সিনেমায় নাবার সুযোগ প্রত্যাখান, এবং শচীকান্তর সাজেশন গ্রহণ। এ-

দুটো-ও. টপিকসের মধ্যে মজা করেই বললাম। বেশ 'ডেসক্রীপটিভ ওয়েতে।' 'সব কথা' অবশ্যই বলা যায় না। একটু রেখে ঢেকেই। মা পছন্দ করবেন না, তাঁর একমাত্র ছেলেকে কেউ খারাপ বলার সুযোগ পাক। সিনেমা-টিনেমা সম্পর্কে মায়ের ধারণাটা, কিঞ্চিৎ নক্কারজনক।

চুপ করে বোম্বাই ব্যাপারটা অনুধাবন করে নিয়ে অবশেষে মুখ খোলেন মা, 'তাহলে বলছিস অন্ততঃ একটা বাড়ী করার মত টাকা দেবে?'

—'বাড়ী! ঠিকমত কাগজগুলো যোগাড় করতে পারলে, তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী টাকা পাওয়া যাবে! শচীকান্ত তো বলে—তোমাদের অতবড় স্টেট, তোমাদের আর চিন্তা কি?— ও, ঝট্ করে হিয়ারিং-এ বসতে বারণ করছে। বলছে টাইম নিয়ে কাগজপত্র গুছিয়ে একবারে এ্যাপীয়ার হতে।'

৬৪

মা কিঞ্চিৎ চিন্তিত মুখে বলতে থাকেন 'না, না, ঈশ্বর, বেশী টাকা আর চাই না। যেটুকু দরকার সেইটুকু দাও। তার সাথে অশান্তি যেন না আসে আল্লাহ।' অদৃশ্য শক্তিময়ের উদ্দেশ্যে দুহাত পাতেন মা। ওঁর জীবনের চাহিদা বড় কম। যখন চাহিদার বয়স, তখন সমস্ত রকম সৌভাগ্য তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। বিগত তিরিশটা বছরের নির্যাতন আর অপমান তাঁকে সকল জাগতিক চাহিদার বহু উর্ধ্বে এক অজানা অবস্থায় উন্নীত করেছে।

এখন বেশী কিছু নয়, দু-এক কাঠা পায়ের নীচের জমিন আর মাথার ওপর এতটুকু আচ্ছাদন — ব্যস্। সেটা নিজের হবে। যেটা ছেড়ে দিতে, কোন বাড়ীউলী লোয়ার কোর্টে ইজেক্টমেণ্ট কেস ফাইল করবে না। আনবে না স্পেস রীকোয়ারমেণ্টের সাজানো মামলার ঘৃণীত-তাগিদ। করপোরেশনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে লুকোনো স্টপার বন্ধ রেখে জল আটকাবে না মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

এই সামান্য শান্তিটুকু মা কি পাবেন! তিরিশ বছর পর? জীবনের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে--শেষ মুহূর্তের শ্বাস নেবার মতন এতটুকু বাতাস।

২য় পর্ব

আমার আদরের কলকাতা

১

এরপর কলকাতা 'সল্টলেক, গড়ের মাঠ আর ঢাকুরিয়া লেকের মিলিত ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত দীর্ঘশ্বাসে ভরা, কলকাতা, এরিয়েল শোভিত গগনচুম্বী মাল্টিস্টোরীড্ বিল্ডিং আর ছেঁড়া ন্যাকড়া মেলা বস্তির, পাশাপাশি সহ-অবস্থানের কলকাতা। অসংখ্য, কিলবিল করা পথের সরীসৃপ গতিতে, হিল্ খসা চটির ঘসড়ানির সাথে অজস্র অজ্ঞান, বাংলার বেকার। সম্পূর্ণ উদাসীন অবাঙালী ইণ্ডাস্ট্রীয়ালিস্ট-এর নতুন গাড়ীর পোড়া পেট্রোলের গন্ধে মাতাল—কিছু বেকার। কলেজী-জ্ঞান লাভের মূল্যহীন সার্টিফিকেট লেখা কাগজের পাণ্ডুলিপি হাতে, শিক্ষিত কিছু যুবক। আর বুড়ি কলকাতাকে তিলোত্তমা করার স্বপ্ন নিয়েছে যাঁরা—তাদেরই সৃষ্ট সর্বগ্রাসী পথের হাঁ-গুলো দেখে ভয়ে কুণ্ঠিত—কলকাতা স্বয়ং !! তখন বর্ষার রূপ লোডশেডিং-এর সহ-মর্মিতায় তুলনাহীন ! আর এই সর্বকিছুর ফাঁকে-ফোকড়ে, কোনায়, কোনায়, অগুন্তি ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে কিছু কবি। তারা প্রেমের কবিতা লেখে ! আজও ! হৃদয়ে ডুবুরি নাবিয়ে যখন এক ফোঁটাও শাঁস নেই তখন কী হবে, প্রেমের কবিতা লিখে—বুঝি না ! আর রাজনীতি নিয়ে যারা কবিতা লেখে তাদের গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে আমার।

২

তৃষিৎ রায় এর কবিতা 'দেশ'-এ বের হয়নি ঠিক-ই। তবুও ও কবি। শুধু দেশ কেন, অমৃত, শিলাদিত্য, সন্দেশ বা অমনি নামী দামী ; অথবা অনামী কোন, বার্ষিকী, ত্রৈমাসিকী, মাসিক এমন কি পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক সচল বা অচল পত্রিকাতেও ওর লেখা বের হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি ওর নিজের পয়সায় ছাপানো আইভরি ভিজিটিং কার্ড-এ ছাড়া, আর কোথাও 'তৃষিৎ রায়' এই নামটা ছাপার অক্ষরে নেই। যদিও চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি তৃষিৎ ! ডাকটিকিট লাগানো নিজের ঠিকানা লেখা খাম সাথে পাঠালে সাতদিনও গুনতে হয়নি ওর। কবিতা ফেরৎ এসেছে। খাম না পাঠালে অবশ্য ফেরৎ আসে না। তবে ছাপাও হয় না। তৃষিৎ তার জন্যে লজ্জিত, কিন্তু দুঃখিত

নয়। তৃষিৎ-এর প্রধান গুণ ও প্রেমের কবিতা লেখে না। এবং কবি বলেই হয়তো অন্যের সুখ-দুঃখটা অনুভব করে। স্বাভাবিক ভাবেই সহমর্মী হয়ে উঠতে পারে। ওর অনুধাবন করার তীব্রতা, ওর এক্সপ্রেশন্‌লেস্ মুখের ওপর ছায়াপাত না করলেও কথা বলার ধরণ দেখেই বোঝা যায়, ও কী ভীষণ হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছে পরিস্থিতিটা। বোধহয় ঠিক এই কারণেই ও আমার বন্ধু থেকে গেছে। ওকে বিশ্বাস করে অফিসের কথা ঘরের কথা নিশ্চিন্তভাবে আলোচনা করা যায়। তৃষিৎ-ও আমাকে সেইভাবেই নেয়।

৩

কলকাতায় এসেই তাই ওর সাউথ্‌-এণ্ড পার্কের বাড়ীতে হানা দিই। এখনই উঠে পড়ে লাগতে হবে ডক্যুমেণ্ট্‌ যোগাড় করার কাজে। মাতুল বলেছেন লাইব্রেরীগুলো খোঁজ করতে। পুরানো গেজেট্‌-টেজেট্‌-ওল্ড-সেক্রেটারীয়েট্‌ বিল্ডীং, এশিয়াটিক্‌-সোসাইটী, পি.এম.জি. অফিসের দোতলায় এইসব লাইব্রেরীগুলোতেই পাওয়ার সম্ভাবনা। খুঁজে বের করতে হবে। সবচেয়ে অসুবিধে, কোন রেফারেন্স্‌ নেই। কোন্‌ সালের কোন্‌ ভলিউম্‌-এ কি নোটিফিকেশন্‌ থাকতে পারে, সে সম্বন্ধে বাবা-ও কিছু বলতে পারছেন না! অনেক খোঁজা!

তাই একজন হেল্পার চাই। তৃষিৎ ছাড়া আর কাকেই বা বলি। কে আর নিজের কাজ ছেড়ে পরের জন্য ব্যাগার খাটবে। একটা সুবিধে—তৃষিৎ-বেকার! ওর অবশ্য চাকরী করার দরকার নেই।

ওকে বলতেই, ও লাফিয়ে উঠল। বলল, 'তুই কি ছুটি নিবি অফিস থেকে?'

—'না, এতো ছুটি দেবে না কোম্পানী। সকালের কাজ সেরে, দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত এই ঘোরাঘুরিটা সারতে হবে। বাইরে খেয়ে নেবো!' প্রোফেশানটার এই সুবিধেটা দারুণ! সকাল থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত ফিল্ড-ওয়ার্ক করো। তারপর অফিস না থাকলে, বাড়ীতে রেস্ট্‌! সন্ধ্যেবেলায় আবার কনসাল্‌ট্যান্টস দেখতে যাও। অফিস ডিউটী না থাকলে দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অনেকটা সময় নিজের করে পাওয়া যায়! এই ঘণ্টা-তিনেক কাজে লাগাতে হবে; না ঘুমিয়ে।

তৃষিৎ বই-এর পোকা। লাইব্রেরীর সীস্‌টেম্‌ ওর নখদর্পনে। ও তখনই ফোন্‌-গাইড্‌ খুলে ওর জানা-অজানা গোটা চারেক লাইব্রেরীতে খোঁজ নিয়ে ফেলল।

—'না—রে—' খুব ভাবিত গলায় বলল 'সব লাইব্রেরীতে গেজেট রাখে না তো।'

বললাম, 'এশিয়াটিক্ সোসাইটিতে দেখ তো!' ওর অর্থ-অনুধাবক দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'পার্কস্ট্রীটের মোড়েই সোসাইটির বাড়ীটা দেখিস নি?'

—'ও, হ্যাঁ—।' পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ঝুঁকে নাম্বারটা দেখতে দেখতে বলল. 'পার্ক হোটেলের একটু আগে তো?'

—'হুঁ', হল্ এণ্ড এ্যাণ্ডারসনের উল্টোদিকে।' দুবারের চেষ্টায় কানেক-শন্ পাওয়া গেল। 'হ্যালো। এখানে কথা বলুন—' বলে ফোনটা আমাকে এগিয়ে দিল তৃষিৎ।

বললাম, 'দেখুন, একটা খোঁজ পেতে পারি?'

ওদিক থেকে অল্প বয়স্ক পুরুষ কণ্ঠ বলল 'বলুন—!'

—'আমি একটা গেজেট্ খুঁজছিলাম—'

—'কি ব্যাপারে বলুন।'

—'ইস্ট পাকিস্তানে জমিদারী এ্যাকুইজিশন্-এর নোটিফিকেশন্স্ থাকে সেই গেজেটে!' আসলে গেজেট সম্বন্ধে আমার কোন আইডিয়াই নেই।

—'ও বুঝেছি, ঢাকা-গেজেট—!'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে আপনাদের?'

—'ধরুন লাইন্‌টা আপনাকে ডিপার্টমেন্টে কানেক্শন্ দিচ্ছি. হ্যালো—ধরুন।'

বললাম, 'হ্যাঁ, ধরে আছি—'

এবার এক প্রৌঢ় কন্ঠ ভেসে এলো। তাকে আদ্যোপান্ত সব বললাম আবার।

—'গেজেট্ তো আছে, কোন্ ইয়ারটা চাই?'

বললাম, 'ফিফ্‌টিটুতে একোয়ার্ড হয়েছে—আমার মনে হয় পরপর কয়েক বছর খুঁজতে হবে—আমি কি যাব আপনাদের ওখানে?'

—'আসতে পারেন, তবে গেজেটের যা অবস্থা, আপনি পাবেন কিনা সন্দেহ।'

—'কেন?'

—'লাইব্রেরীর ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ে······থাক্‌গে একটু ধরুন তো লাইন্‌টা—।'

কার সাথে কী যেন কথা বলে নিলেন—বললেন। 'হ্যালো—'

—'বলুন ?'

—'না, গেজেটে এখন দেয়া হচ্ছে না।'

—'না, আমি বলছিলাম, আমি যদি মেম্বর হয়ে নিই—।'

—'না—তা নয়। বইগুলো একটা ঘরে স্তূপ করা আছে ওগুলো খুঁজে মিলিয়ে দেয়া যাবে না।' ভদ্রলোক ক্রমশঃ গম্ভীর হচ্ছেন।

বললাম, 'আমাকে যদি এ্যালাউ করেন আমি-ই খুঁজে নিয়ে, ওখানে বসেই দেখব।' গলার স্বরে যথাসম্ভব অনুনয় ফুটিয়েই বলি।

ভবি ভোলবার নয়। বললেন, 'না অসুবিধে আছে।'

তৃষিৎ কথা শুনে যাচ্ছিল আমার দিকে তাকিয়ে। রিসিভারটা জায়গা মত নামিয়ে বললাম, 'অসুবিধে আছে।'

তৃষিৎ বললো, 'না এভাবে হবে না। চল্ বেরিয়ে পড়ি।'

তাই ঠিক হলো। গোলপার্কে তখন অফিস-যাত্রীর লাইন নেই। ফাঁকা মিনিবাসে উঠে বসতেই গাড়ীটা ছেড়ে দিল।

পার্কসার্কাস এভিনুতে ঢুকতে বাংলাদেশ মিশনের বাড়ীটা দেখে মনে হলো—গেজেট্ এখানেও থাকা সম্ভব। এটা ফেরার পথে টাচ করতে হবে। তৃষিৎ-কে বলতে, বুদ্ধিটা সে-ই দিল।

৪

জানালায় নিবিষ্ট-চিত্ত তৃষিৎকে ঠেলে বলি, 'নতুন কিছু লিখলি এর মধ্যে ?' কিছু লিখলে ও আমাকে একবার পড়িয়ে নেয়। একটু দুষ্টু দুষ্টু হাসি হেসে বলল।

—'একটা খবর আছে।'

—'কী রকম ?' আমি উৎসুক হই।

—'স্বাধীনবাজার' থেকে আমায় দেখা করতে বলেছে।'

—'আবার কবিতা পাঠিয়েছিলি ?'

—'না, কবিতা নয়, এবার একটা ছোটগল্প পাঠিয়েছিলাম—তোকে পড়াবো।' কবিতার মাঝে মাঝে ও গল্পও লেখে জানতাম।

বললাম, 'আমার পড়া নয় ?'

—'না; তুই যেদিন বোম্বে গেছিস সেদিন রাতে শেষ হয়েছে।'

—'তো চ আজ যাবি ?'

—'পরশু দুপুর বেলায় সাগর গাঙ্গুলীর সাথে ওদের অফিসে দেখা করতে লিখেছে—তুই যাবি আমার সঙ্গে ?'

—'নিশ্চয়ই যাব। তোর মনে হয় গল্পটা সীলেক্টেড হয়েছে?' প্রশ্নটা করেই ফেলি।

—'আশা করতে পারি, ধন্য আশা কুহকিনী—।' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেলে তৃষিৎ। পথচারীদের উদ্দেশ্যে ক্লীনার তখনো চীৎকার করে চলেছে দরজাটা আধখোলা রেখে, মুখটা বাইরে বের করে, 'ল্লাউসী, ল্লাউসী, পার্ক স্ট্রীট—চৌরঙ্গী-ল্লাউসী-ল্লাউসী।' একজন উঠল, একজন নামল মিন্টো পার্কের স্টপেজে।

—'সাগর গাঙ্গুলী, পত্রিকা অফিসের কে রে জানিস?'

—'ওই বোধহয় সিলেকশন করে আজকাল। শান্তিময় ঘোষ—যতদূর জানি, এ ডিপার্টমেন্ট দেখেন না আজকাল।'

৫

জি পি ও ছাড়িয়ে ডানদিকে টার্ণ নেবার মুখে নেবে পড়লাম। এ-পাশের দপ্তর দিয়ে সেক্রেটারীয়েটের নীচতলায় বিরাট লাইব্রেরী রুমে ঢুকলাম। এনকোয়ারীতে ঢাকা-গেজেট-এর কথাটা বলতে, বৃদ্ধ একজন তরুণকে ডেকে দিলেন। তিনি বললেন, 'আপনারা মেম্বর?'

বললাম, 'না তো।'

—'তাহলে সুপরীন্টেণ্ডেণ্ট-এর সাথে কথা বলে পারমিশন নিতে হবে।' ঘরটা পাশেই পার্টিশন করা ঢুকতে গিয়ে দেখলাম; নাম কি সাম-ভট্টাচার্য। উল্টোদিকে অনেক ক'জন বসে, চা পানে রত। বিরক্তভাবে আমাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী চাই?'

সবিনয়ে বললাম, 'ঢাকা গেজেট্ আছে আপনাদের এখানে, আমি একটু দেখতে চাই।'

—'কে বলল গেজেট্ আছে এখানে?' বেশ রাগতঃ!

—'ওই বাইরের কাউণ্টারে একজন।' ভদ্রলোক এবার বেল বাজিয়ে পূর্বের সেই তনয়কে ডাকলেন। তার সংগে কিঞ্চিৎ বচসা হলো। 'এদেরকে ঢুকতে দিয়েছ কেন?'...ইত্যাদি! এখানে নাকি স্লিপ্ নিয়ে ঢোকার নিয়ম, অথচ আমাদেরকে কেউ আটকায়নি পথে।

এবার আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না আপনাদের দেয়া যাবে না।'

বললাম, 'খুব জরুরী দরকার ছিল, আপনি অনুমতি করলে এখানে বসেই দেখতে পারি।'

সব শুনে বললেন, 'আপনি আপনার ডিপার্টমেন্ট্-হেডকে দিয়ে চীফ্

সেক্রেটারীর কাছে এ্যাপ্লাই করুন রেফারেন্স্ দিয়ে।'

—'কতদিন লাগবে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

—'খুব তাড়াতাড়ি হলে মাস তিন-চার তো বটেই।'

—'!!' সরকারী দপ্তরে কাজ করিনা শুনলে পরে হয়তো ঘাড় ধরে বের করে দেবে! নিঃশব্দে বেরিয়ে আসি দু'জন। 'অতঃ কিম্?'

খুবই অসুবিধেয় পড়া গেল।

৬

পি. এম. জি. অফিসে পিসতুতো দাদা আছেন। এই এমার্জেন্সীর মধ্যেও দেখলাম তিনি মেজাজে সাড়ে এগারোটারও পর ঢুকেছেন! ফর্সা রঙ টক্‌টক্ করছে, রোদ থেকে এসে। আমাদেরকে ইশারায় বসালেন দুপাশের দুটো চেয়ারে। উল্টোদিকে চেয়ার নেই, যাতায়াতের পথ বন্ধ হয় বলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বাড়ী থেকে পালিয়ে এক মামতো আর এক মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গ নিয়ে আর্মি ক্যাডারে ছিলেন। ডিসিপ্লীন্ অভ্যেসটা ওখান থেকেই রপ্ত। ফাইল-টাইলগুলো যথাস্থানে স্বহস্তে সাজানো। নিজের পয়সায় কেনা পালকের ঝাড়ন দিয়ে নিজেই ধুলো ঝাড়েন। ডিপার্টমেন্ট্ চেঞ্জ্ হলে, প্রথমেই খুঁজে পেতে বৃটিশ আমলের পুরোনো মেহগিনি কাঠের টেবিলটা, চেয়ারটি যোগাড় করে আনেন। তারপর কব্জা-টব্জা নিজেই খরচা করে সারিয়ে, নিজের পরিচর্যায় তাকে দুদিনেই ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে করে তোলেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বাতিকটাই ও'কে কলঙ্কশূন্য রেখেছে। ক্রিম্ কলারের সার্ট, আস্তিন গোটানো এবং পাটভাঙা ধুতি। এই বারো-মাসের পোষাক। শীতে খুব বেশী হলে, আট ভাঁজ করা খয়েরী শালটা কাঁধে ফেলা। খুলে কখনো গায়ে দেন না। বলেন 'শীত কোথায়?' পার্সোনালিটি চোখে, থুৎনিতে এবং সুদৃঢ় কব্জিতে। এমন প্রেস্টিজিং পার্সোনালিটির জন্যেই তিনি পি. এম. জি. অফিসের এ-কোণ থেকে ও-কোণ ওপরওয়ালা থেকে আরম্ভ করে দারোয়ান, এমনকি টিফিন আওয়ার্সের চা-ওয়ালার পর্যন্ত, প্রিয়।

অ-ডিসিপ্লীন যেটুকু, সেটা বরাহনগর থেকে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছনো। টেবিল পরিষ্কার রাখার তাগিদেই কাজটুকু চট্ করে সেরে ফেলে, ফাইলটাকে ছেড়ে দেন। দরকার হলে নিজেই উঠে এঘর-ওঘর থেকে ইনফর্মেশন কালেক্ট করে নিয়ে আসেন। থাকেন অফিসে অবশ্য সন্ধ্যে ছয়টা-সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত। ফলে ইমার্জেন্সীর আওতায় ওকে প্রথম তিনদিন পড়তে হয়েছিল মাত্র।

৭

গুছিয়ে বসে এক গ্লাস জল খেয়ে নিয়ে বললেন, 'বল ভাই, বোম্বাই-সংবাদ বল ?' তৃষিৎ-কে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আদ্যোপান্ত সব শোনালাম, অতি সংক্ষেপে। আজ সকাল থেকে ঢাকা গেজেট্ খোঁজার অভিজ্ঞতা শুনে, উঠে গিয়ে বড়বাবুকে কানে কানে কিছু বললেন। বড়বাবু আমার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে ফোন করলেন কাকে। দাদার সাথে একটু পরেই দোতালায় নেবে এলাম লাইব্রেরী ঘরে। দরজায় ব্যাগটা জমা দিয়ে টোকেন নিয়ে যার সামনে উপস্থিত হলাম, তিনি আমার প্রায় সমবয়সী, মিঃ ব্যানার্জী। সব শুনে তিনিও নিরাশ করলেন। বললেন, 'ঢাকা গেজেট কিছু আছে। কিন্তু এমন অগোছালোভাবে স্তূপ করা— ও দেয়া যাবে না।' ওই ভদ্রলোকের কাছ থেকেই সাজেশান্ পেলাম প্রথম ন্যাশানাল লাইব্রেরীর কথা।

বি-বা-দী বাগে এসে মাতুলের অফিসে না গিয়ে, চলে যাওয়া যায় না। তৃষিৎকে নিয়ে পি. এম. জি. অফিসের কোণ থেকে চলন্ত ট্রামে উঠে, স্ট্রাণ্ড রোড পৌঁছলাম।

৮

এখানে একেবারে সাজ্‌সাজ্ রব পড়ে গেছে। টেলিফোন করে, চিঠি লিখে, যাকে যেখান থেকে পেরেছেন যোগাযোগ করেছেন মামা। পুব্-বাংলার যত আত্মীয়-স্বজন। সবাইকে দিয়ে ক্লেম্ করাচ্ছেন। এ্যাফি-ডেভিট্-এ কি লেখা উচিত বলে দিচ্ছেন। আবার ডকুমেন্ট্ যোগাড় করার হদিশ দিচ্ছেন, কাউকে কাউকে। ভিড়-এর ঠেলায় ছোট্ট অপরিসর অফিস ঘরখানা থৈ থৈ করছে। পার্টনার কচি সেন তাঁর স্বভাব সিদ্ধ বাজখাঁই গলায় কাকে চীৎকার করে টেলিফোন করছেন। এই ঘরেই বসবার অনেক-গুলো চেয়ার। কিছু পরিচিত, কিছু অর্ধ-পরিচিত এবং কিছু সম্পূর্ণ নতুন মুখ, আসনগুলো দখল করে আছেন। চেনা এক-আধজন হেসে বললেন, কতদূর ? হিয়ারীং হইসে ?'

কেউ সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন 'বাবা কত টাকার ক্লেইম্ দিসে ?'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেন-মশাই-এর টেবিলে সযত্নে রক্ষিত ওঁদেরই ফ্যাক্টরীতে কোনকালের তৈরী মেশিন-পার্টস্-এর ভগ্নাবশেষগুলো হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে, মৃদু হেসে, মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তরগুলো এড়িয়ে চলি।

ভেতরের ঘর থেকে মামার বক্তৃতার টুকরো টুকরো কথা এবং বাস্তু

অভিব্যক্তি ভেসে আসছে। রিসিভারটা যথাস্থানে সশব্দে রেখে সেন-মশাই বললেন, 'কি গো ভাগ্নে, তোমাদের এখন লাখ্ লাখ্ ব্যাপার—'

—'কোন্ ব্যাপার ?'

—'সে কি ইস্টবেঙ্গল-এর জমিদাররা এখন লাখ্ ছাড়া কোন কথাই বলেনা হে। তুমি আছ কোথায়! যাও যাও ও-ঘরে মামা বাৎলাচ্ছে সকলকে, ঢুকে পড়!'

—'না, বের হোক কিছু লোক, একটু ফাঁকা হলে ঢুকবো।'

—'আরে, না, না, কেউ বের হবে না। এই চলবে রাত আট্টা পর্যন্ত।'

—'আটটা ?'

—'তবে ? যাও টোল্-এ গিয়ে বস।' অবস্থা খারাপ দেখে হাসতে হাসতে এবং আস্তে আস্তে ভিড়ের পেছন দিয়ে মুখটা বাড়াই। টোল্ কোথায়! এ যে সম্পূর্ণ একটা ইউনিভার্সিটি—মামার অফিস-ঘরে! যত রাজ্যের স্ট্যাম্প্ কাগজ-এর হাতে লেখা টাইপ করা দলিল। আর বস্তা পচা কিছু নোংরা কাগজের স্তূপ! তার থেকে পাঠোদ্ধার করা হচ্ছে। মামার এক্সপার্ট ওপিনিয়ন্-এর আশায় সব হাঁ করে রয়েছে।

—'একটু কথা বলতে পারি ?' এ্যানাউন্স্ করলাম—প্রেজেন্স-টা।

সচমকে মামা এবং ঘরশুদ্ধ দণ্ডায়মান মানুষগুলো চমকে আমার দিকে একসঙ্গে তাকাল। মামা চীৎকার করে হেসে উঠে আমাকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে নিয়ে জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, 'এই যে আমার ভাগ্নে লুক্ এ্যাট্ দিস্ ইয়ংম্যান্—আমরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি আর এইটুকু ছেলে (!) বোম্বে গিয়ে, 'স্বামীকে ম্যানেজ করে চলে এল।' তারপর দু'মিনিট ধরে আমাকে অসংখ্য অজস্র প্রশ্নবাণের মুখে ঠেলে দিয়ে বলতে গেলে একেবারে ভি. আই. পির আসনে বসিয়ে, সেই ফাঁকে নিবন্ত সিগারেটটা জ্বালিয়ে, ফুক ফুক করে ধোঁয়া ছেড়ে, কয়েকটা ভাউচারে সই করে ফেললেন। একটা লম্বা সবু কাগজের ফালিতে, কার এ্যাকাউন্টে যেন, একটা আশি পয়সা, একটা দেড় টাকা এবং দুটো পঁচিশ পয়সা লিখে ফেললেন। যিনি লোকের লাখ্ লাখ টাকা পাবার পথ বাৎলে দিচ্ছেন তাঁর এ কি আচরণ! কাস্টোডিয়ানের অফিসটা, চোখের সম্মুখে একটু ভেসেই মিলিয়ে গেল।

বুঝলাম মামা বেচারী, সারাদিনে অফিসের কাজ করার কোন ফুরসৎ-ই পাচ্ছেন না। আমি তখন—

'স্বামী—সাহেব কি বলুলেন ?' 'স্বামীর এ্যাটিচুড্ ক্যামন্ দেখল্যান ?'

'স্বামী কি মাদ্রাজী' (!) 'রঙ্গস্বামীর ইংরাজীতে কথা কয় না হিন্দীতে ?'

২০

এবং সবচাইতে আশ্চর্য 'স্বামী সাহেব ক্যামন দেখতে ?' —এইসব প্রশ্নের যথাসম্ভব 'যুক্তিপূর্ণ' ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

একটু সুযোগ পেয়ে মামাকে ঢাকা-গেজেট্ না পাওয়ায় কাহিনী ব্যক্ত করলাম। ঢিলে দাঁত জোড়া সামলে নিয়ে উনি বললেন, দাঁড়া বোস্ না—' চাপা গলায় হিসাব দেখতে দেখতে ঠোঁটের কোণ দিয়ে ফুক্ ফুক্ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'একজন লোক আছে। কদিন বাদেই এসে পৌঁছোবে।' টাকাটা একটু বেশী নেয়। শচী বলে দিয়েছে, সেই রেটেই দিতে হবে, উপায় নেই! এটু বেশী হয়ে যায়! তবুও ভেবে দেখ্।' প্রথম থেকেই ভেবে যাচ্ছি! অসংলগ্ন কথাগুলো, খু ব অভ্যস্ত লোক ছাড়া আর কারও বোধগম্য হওয়াটাই অসম্ভব!

—'লোকটা কোত্থেকে আসবে?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে ফেলি। খেইটা সত্যিই ধরতে পারছি না!

—'বাংলাদেশ থেকে! আগে সাড়ে আট্ আনির পীয়ারীবাবু এইগুলো আনতেন। আমার একটা কম্পেনসেশন্ রোল্ এনেছেন—তার পাঠোদ্ধার করা দুঃসাধ্য—আর ওই টার্মগুলো জানি না তো! কয়েকটা নিজেই বুঝলাম 'লীমা' মানে নীচু জমি। 'কান্দা' মানে জানিস?'

উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে বললাম, 'জমির আল্?'

—'কী?' একটু কানের দোষ হয়েছে মামার।

—'ধানের ক্ষেতের পাশে আল্ দেয়া থাকে না?'

—'না, আল্ না। শচীর বাড়ীতে সেদিন গিস্‌লাম! কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম 'কান্দা' মানে কি কওতো? শচী তো নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবে, হাসিতে ফেটে পড়ে বলল 'উঁচু জমি।'

—'ফালট্ কি বল্‌তো?'

—'দ্যুৎ! আমি কি ডিক্‌শনারী? কাস্টোডিয়ানের সামনে কি এ সবের পড়া মুখস্থ বলতে হবে না কি?'

—'নাঃ। এটা ঠিক হলো না।' সিগারেট্-এর নিবন্ত শেষ অংশটুকুর মায়া ত্যাগ করে বললেন। 'তুই একটা বুদ্ধিমান ছেলে, তুই যখন একটা কাজ করবি, সব বুঝে নিয়ে করবি। না, এসবের দরকার নেই ঠিক-ই। আর তুই তো কাজ, নাইনটি পার্সেন্ট্ সেরেই দিয়ে এসেছিল। এখন ফর্মালিটি শুধু হিয়ারীং এ বসার। ঘাব্‌ড়ানোর কিছু নেই, ঘাবড়াস না, একদম ঘাবড়াস না।' মামা আমায় সাবধানবানী দিয়ে কতকগুলো দু'নয়া পয়সা বারবার গুণে, টেবিলের তলা থেকে আনা একটা প্লাস্টিকের কৌটোয় ভরে রাখলেন। বাঁদিক থেকে ইলাস্‌ট্রেটেড্ উইক্‌লীর মলাট কেটে

বানানো থাম থেকে অনেকগুলো দশ টাকার নোট বের করে ফর্‌ফর্‌ করে গুণলেন। ভাউচারটা দেখলেন, আবার টাকা গুণলেন। আবার ভাউ-চারটা চেক্‌ করলেন। এমনি ছ'বার হলো। সপ্তমবারে আবার টাকার বাণ্ড্‌টা গুণতে যেতেই বললাম,

—'দুশো সত্তর আছে ওখানে।'

থেমে গিয়ে বললেন, 'দেখেছিস তো ঠিক, সাতাশটা ?'

'হুঁ।'

পিন্‌ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটা পাথর চাপা দিয়ে রেখে বললেন, —'একটু বসবি—এদের ছেড়ে দিই— ?'

—'রাত আটটা বাজবে শুনলাম !'

হেসে বললেন, 'কে বলেছে, কণ্ঠ ? আর বলিস না—একদম পছন্দ নয় কাজটা—জঘন্য কাজ—খালি শবিকের কথাবার্তা ; বস না শুনতে পাবি।'

—'না, আমার এক বন্ধু আছে সাথে। ঢাকা গেজেট্‌ খুঁজতে ওকে নিয়ে এসেছিলাম।'

—'তাহ'লে কি ঠিক করলি ?'

—'কোনটা ?'

—'বাংলাদেশের ওটা,—আসবে তো কদিন বাদে ! তোর সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেব কি বলিস—অফিসের ফোন-নাম্বারটা লিখে দিয়ে যা।' একটা কাগজ আর পেন্সিলটা এগিয়ে ধরেন। আমি হিপ্‌ পকেট থেকে কোম্পানীর মনোগ্রাম-অঙ্কিত ভিজিটিং কার্ড'টা ওঁকে ধরিয়ে দিয়ে—ওঁর ছাত্রকুলের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসি। পেছন থেকে যথারীতি সেই লেক্‌চার আর অবোধ্য প্রশ্নবাণ কানে ভেসে আসতে থাকে।

৯

কণ্ঠ সেনের সাথে তৃষিৎ নিজেই আলাপ করে ফেলেছে দেখলাম। একটা চেয়ারেও বসতে পেরেছে এতক্ষণে ! সেন মশাই-এর কোন কথার উত্তর দিচ্ছে তৃষিৎ—বলছে, 'এতো লোক তো আর মিথ্যের পেছনে দৌড়তে পারে না—।' আমায় দেখে তৃষিৎ উঠে দাঁড়াল।

বললাম, 'চলি, সেন মামু !'

—'চললে ? বাবা কেমন আছেন ? আসেন না কেন আজকাল ?'

বললাম, 'রোদে বের হলে আজকাল খুব স্ট্রেন হয় বাবার—তাই। তাছাড়া বাবার পেটটাও তো ভাল না।'

সেন-মশাই ঝট্ করে লিঙ্ক পেয়ে গেলেন।

—'ও পেটে ব্যথা হয়! বাবাকে আমলকি খেতে বলবে। বাজারে যান তো উনি? বলবে টাকা খানেকের আমলকি আর আধপোটাক বীট্-নুন্ নিয়ে আসতে। মা-কে বলবে—ওগুলো ডুমো ডুমো করে কেটে রোদে শুকিয়ে রাখতে। শুকিয়ে গেলে বীট্নুন্ মিশিয়ে খেতে দেবে, বাবাকে। দেখবে, এ্যাসিড, বদ্হজম্, মাথাধরা, গা-বমিবমি, পিত্তির দোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য সব ম্যাজিকের মত লোপ পেয়েছে। তুমিও খেয়ে দেখো।'

—'কেন, আমার আবার কি হলো?'

—'না, হয়নি, হতে কতক্ষণ। টৈ-টৈ করার চাক্রী করছ তো, তাই বলছি। আজ এ রেস্তোঁরায়, কাল ওই হোটেলে খেয়ে পেটের তো আর কিস্সু নেই তোমাদের। আমলকিটা খেও বুঝলে। পরে বলবে, সেন-মামু কথাটা বলেছিল, তখন শুনলে হতো।'

হেসে ঘর থেকে বের হচ্ছি পেছন থেকে ডেকে বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে, আমার বাড়ীতে কিছুটা করা আছে! হরলিকসের শিশিতে ভরা। এনে রাখবো। তুই নেক্স্ট্ যেদিন আসবি নিয়ে যাবি বাবার জন্য বুঝলি—?'

—'আচ্ছা?' বলে বেরিয়ে আসি তৃষিৎকে টানতে টানতে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলি, 'আরম্ভ হলে থামানো দায়। তবে খুব মজার মজার কথা বলেন তো—খুব সময় কেটে যায়। তোকে চিনল কি করে রে?'

তৃষিৎ বলল, 'ওর ছোটভাই কানন, আমার বন্ধু, তোদের প্রোফেশনে আছে তো, চিনিস না?'

—'হ্যাঁ, চিনি।' শর্টকাট করে বিবাদী বাগে এসে ফের মিনিবাসে চড়লাম। 'পার্কস্ট্রীট্'—'গুরুসদয়'—'গড়িয়াহাট'—'গোলপার্ক'—হকারদের মত চীৎকার করে প্যাসেঞ্জার তুলছে, ক্লীনার। মিনিবাসটির চালক—ইঞ্জিন চালু রেখে, এই ছেড়ে দিলাম—এই ছেড়ে দিলাম—পোজ্ দিতে, দিতে, পাশে দণ্ডায়মান একটি ফোড়ের সাথে আড্ডা দিচ্ছে। ভর্ত্তি না হোক, অন্ততঃ দুপুরবেলায় ফাঁকা বাসটাকে কি করে আর টার্মিনাস্ টু টার্মিনাস নিয়ে যায়!

হঠাৎ তৃষিৎ বলে উঠল, 'ভদ্রলোকের নাম কণ্ঠি কেন রে?'

অবাক হয়ে তাকালাম, 'নামে কি এসে যায়! ও'র বাবা আমার সাথে কন্সাল্ট করেন নি কি করে বলবো।' জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টিটা ছুঁড়ে দিয়ে বলি। সারাটা দিন একটাও কাজের কাজ হলো না। খারাপ লাগছে, তাই।

তৃষিৎ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'অমন কণ্ঠস্বর, অমন দশাসই চেহারার মানুষটার নাম কঞ্চি হল কেন ?' আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল একে নিয়ে। এই কবিরা যে কখন কোথায় একটা গাঁটে আটকে যায় বুঝতেই পারি না।

—'অসুবিধেটা কোথায় হচ্ছে তোর ?'

তৃষিৎ চুপ।

আবার বললাম, 'তুই কি নাম সাজেস্ট্ করতিস ?'

ও গম্ভীর হয়ে বলল, 'বাঁশ।'

উচ্চহাস্যে ফ্রন্ট সীটে বসা কণ্ডাক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেললাম।

—'কেন ?'

ভদ্রলোকের সব ব্যাপারে একটা বিদ্রূপ মেশানো ফোঁড়ন কাটা স্বভাব। আর নিজে যা বোঝেন, তার বাইরে সব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে উড়িয়ে দেন। বাঁশ নয়, উনি একটি বাঁশঝাড় !' দাঁতে দাঁত চেপে বলে তৃষিৎ। 'তোদের এই সব টাকা পয়সা কিস্সু-ই নাকি কোনদিন পাবি না—উনি বললেন।'

হেসে বললাম, 'ওঁর আর কি দোষ বল। বোম্বাই যাবার ছুটির দরখাস্ত করতে,—সেল্স্ম্যানেজার—জেরায় জেরায় কারণটা জেনে নিয়ে ঠোঁট উল্টে বলেছিলেন, সোনার হরিণের পেছনে দৌড়চ্ছ ? আসলে এ ব্যাপারটা সবাই বোঝে না ঠিক। এদিকের লোক, পুব্-বাংলার জমিদারদের খুব আণ্ডার-এস্টিমেট্ করে দেখবি ! তুই এদিকের কাউকে তোর পারিবারিক পরিচয়টা দিস—এই ভাবটাই পাবি।'

১০

মিনি, যখন সার্কুলার রোড ছেড়ে সার্কাস এভিনুতে ঢুকছে তখন হুট করে মনে পড়ে যেতেই তৃষিৎকে বললাম, 'এই, আর একটু কষ্ট করবি—মিশনটা হয়ে যাই, আয়।'

মেন্ গেট্ বন্ধ। পাশের অপরিসর নীচু দরজা দিয়ে প্রবেশ করলাম। বাঁদিক ঘেঁসে এক কামরার একখানি ঘর। একগাদা বাংলাদেশী জটলা করে আছে। ভিজিটরস্—স্লিপ ইস্যু করছে একটি লোক চেয়ারে বসে। সামনে খোলা বিরাট একটা খাতা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাহায্যকারীর সংখ্যা পাঁচজন। তাদের যৌথ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো। 'কার সঙ্গে দেখা করবেন ?' বসা লোকটির প্রশ্ন।

সোজাসুজি ডেপুটি হাই-কমিশনার-এর নামই বললাম।

—'আপনার এ্যাপয়েন্টমেণ্ট্ করা আছে ?' দ্বিতীয় একজনের প্যাঁচ।

—'না।'

—'তাহলে তো হবে না।' সমস্বরে!

—'আজকে দেখা করা যায় না?' এমন কি কাজ ভদ্রলোকের ?

— 'না! এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যেতে পারেন।'

—'কবে দেখা করা যাবে ?' ভদ্রলোক ফোন করে ভেতর থেকে কাউকে জিজ্ঞেস করে বললেন, 'সামনের সপ্তাহে হবে!'

বললাম, 'আমার দরকারটা ঢাকা-গেজেট্-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে।' একটু ভেবে নিয়ে লোকটি স্লিপে আমার নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে খাতাটা এগিয়ে দিল। সইটা করেই খেয়াল হলো এদের সব ব্যাপার বাংলাভাষায়। ততক্ষণে. ইংরাজী হরফে অটোগ্রাফ্টা দান করে ফেলেছি আমি!

দোতলায় উঠে যেতে বললেন। কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। স্লিপ্টা পড়তেই পারলাম না! ঈষৎ পড়ে বলল 'পি আর ও. মনে হচ্ছে।'

দোতলার বিরাট হলগুলো পেরিয়ে. এক কোণায় কয়েকজনকে চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে আড্ডা মারতে দেখলাম। পি আর ও-র হদিশ জিজ্ঞেস করতে একজন তিনতলায় উঠতে বলে. আবার গপ্পে মত্ত হলেন! তিন-তলায় সিঁড়ির পাশেই নতুন নীল ভারী পর্দার বেমানান বাধা ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে একজন 'জাহান আলি খাঁ।' সদৃশ প্রৌঢ়ের সম্মুখীন হলাম।

ভদ্রলোক বসতে বলে, ফোনে কার সাথে কথা সেরে নিচ্ছেন। বসে বসে বসে মনে দুটি ভাবেরই উদয় হচ্ছিল। প্রথমটি, আমরা যেন বাংলা-দেশে-ই কোন অফিসে বসে আছি। এসেছি কলকাতা থেকে! দ্বিতীয়টি. তোদেরকে রেকগ্নাইজ্ করলাম আমরা, স্বাধীন করে দিলাম আমরা—আর তুই ব্যাটা আমাদের জন্য তৎপর না হয়ে অন্য বাজে কাজ, সারছিস আগে!'

—'বলুন, আপনাদের জন্য কি করতে পারি?' পূব-বাংলার সুরে কলকাতার বাক্যটি শুনলাম।

—'দেখুন. আপনি হয়তো জানেন, এনিমি প্রপার্টী এ্যাক্টে. ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট কিছু টাকা দিচ্ছেন আমাদের। আপনাদের এখানে তো ঢাকা গেজেটগুলো আছে। আমাকে যদি খুঁজতে দেন—'

বাধা দিয়ে বললেন. 'ও ঢাকা গেজেট—। ও বুঝেছি! ও—তো নেই—।'

—'হাই কমিশনার অফিসে তো থাকারই কথা, তাই না?' জোর দিয়েই বলি।

—'হ্যাঁ, ছিল। ওই লিবারেশন মুভমেণ্টের সময় আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।' হাসতে হাসতে খুব কৃতিত্বের সাথে বললেন, 'অনেক খুব দরকারী কাগজপত্র-ও ওই সাথে গেছে।'

খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তবু-ও বললাম—!. 'ও আচ্ছা, ডেপুটী হাই-কমিশনার-এর সাথে দেখা করে বললে কি উনি ঢাকা থেকে ডক্যুমেন্ট আনতে সাহায্য করবেন?'

—'না, এটা তো আমাদের এক্তিয়ার না। ময়মনসিংহের জমিদার কি যেন নাম—আচাজ্জি!'

আন্দাজে বললাম, 'এস. কে?

উনি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, উকিল তো ভদ্রলোক? উনি এসেছিলেন এই ব্যাপারেই! আলাপ হলো অনেকক্ষণ—সুবিধে হয়নি—।'

—'ব্যারিস্টর আচার্যি কোন হেল্প পাননি এখান থেকে?'

—'না, এখান থেকে কিছু করা সম্ভব না। আপনারা দিল্লীতে যান। হাই-কমিশনার অফিস যদি কিছু করতে পারে।'

উঠে দাঁড়াতে ভদ্রলোক বললেন, 'আবার আসবেন-আপনার জমিদারী কোথায় ছিল।' পি আর. ও-কে এসব বলতে হয়!

—'সোমেশ্বর স্টেটের নাম শুনেছেন?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ ও তো বিরাট সম্পত্তি, অনেক পুরানো ফ্যামিলি। ও আচ্ছা, আচ্ছা……।'

ভুল করে অন্যদিকের একটা কাঠের অপরিসর সিঁড়ি দিয়ে নীচে চলে এলাম। এলাকাটা বোধহয় প্রোটেক্টেড-প্লেস্ ছিল।

বাইরে এসে মনে হলো, এরা ইচ্ছে করলেই পারে। করবে না। এত বছরের ভারত-বিদ্বেষী মন কি আর রাতারাতি পাল্টায়! 'ক্রোমোসোম্' বা জীন্-এ দাগ ধরে গেছে। এদের অণুতে অণুতে হিংসার আগুন। ঠেকায় পড়ে মুক্তি ফৌজের সাহায্য নিয়েছে। সুযোগ পেলেই ছোবল দেবে না, একথা এখনই হলফ করে বলা যায় না। সবাই তো আর মুজিব নয়। অবশ্য মুজিবের অতীত ইতিহাসও-যাকগে আমার কি! দেশের জনক ইজ দেশের জনক। ভাল হলেই ভাল।

পার্কসার্কাস অবধি হেঁটে হেঁটে এগিয়ে যাওয়া যায়। ওখান থেকে ট্রাম-বাস একটা কিছু পেয়ে যাবো।

তৃষিৎ নিরুপদ্রব্ কণ্ঠে বলল, 'একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস।'

ভাবলাম আমার মনের কথাটাই ও বলবে। 'বললাম কি হলো ?'

—'মিনিবাসগুলোর ভাড়া ট্যাক্সি থেকে কিছু কম। কিন্তু বাসের ভাড়ার ধারে কাছে নয়। আবার এমনভাবে রুটটা নেয়, একটা ট্যাক্সি হলেও তাই নিত। ট্যাক্সির মতই যেখানে সেখানে হাত দেখালে থামে।'

—'তাতে কি ?'

ও হেসে বললো, 'নামটা মিনিবাস কেন ! ম্যাক্সি-ট্যাক্সি হলেই ভালো মানাতো না ?'

আবার সেই নাম সমস্যায় পড়েছে তৃষিং ! কবিদের সতিাই বোঝা দায় !

১১

বোম্বে থেকে ফেরার দিন দশেকের মধ্যেই কাস্টোডিয়ানের রাবার স্ট্যাম্প দেওয়া, হাতে ঠিকানা লেখা, অতি পরিচিত ক্রিম কালারের খামটা এলো। অন্যবারের তুলনায় বেশ মোটা এবং ভারী ! ভেতর থেকে তিনটে প্রিন্টেড কাগজ বের হলো। তার দু'টি এ্যানেক্সিওর ওয়ান এবং টু্য, অন্যটি একটি কাভারিং চিঠি, যার বক্তব্য খুব স্পষ্ট।

প্রথমতঃ, স্ট্যাম্প কাগজের ওপর এ্যানেক্সিওর ওয়ান-এ যে 'ওথ' নেবার বয়ান আছে, তার প্রোটোটাইপ তুলে নিয়ে ঠিক তার পরেই প্রপার্টী শীডুল্-গুলো ডেমি পেপারে সাজিয়ে টাইপ করতে হবে পরপর। প্রথমে এগরি-কালচারাল ল্যাণ্ড। তারপর হোমস্টেড ল্যাণ্ড এবং স্ট্রাকচারস অর্থাৎ বাড়ী-ঘর। এরপর আর যা কিছু আছে, যেমন কমপেনসেশন এর টাকা, বা অন্য কোন ব্যাঙ্ক ডিপজিটস...এইসব। সবশেষে ক্লেইমেন্টের সই, উকিলের অথেন্টিকেশন এবং শেষে ম্যাজিস্ট্রেট বা নোটারী পাবলিকের সীলমোহর—ব্যস।

দ্বিতীয়—এ্যানেক্সিওরটি দু'জন সাক্ষীর জন্য। 'ওথ'-এর বয়ানটুকু আলাদা। স্ট্যাম্প কাগজে অমুকচন্দ্র অমুকের পুত্র, অমুকচন্দ্র অমুকের যতদূর জানি নিম্নবর্ণিত শীডুল্ অনুযায়ী সম্পত্তিগুলো ছিল। এবং তারপর ক্লেইমেন্টের যে শীডুল, সেটা ডেমি পেপারে প্রিন্ট করে সাক্ষীদের আলাদা আলাদা সই অথেন্টিকেশন সীলমোহর,—ব্যস।

চিঠিতে দিনকুড়ি বাদের একটা এ্যাফিডাভিট পাঠানোর দিন ধার্য্য করা আছে !

ফর্মগুলো পেয়ে বাড়ীতে একটা উত্তেজনা উত্তেজনা ভাব : বোম্বে যাবার

ব্যাপারটা তাহলে ফলপ্রসূ হয়েছে !! আমাদের কেসটা তাহলে সত্যিই হচ্ছে ? আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম এতদিন কেস নাম্বারের আগে একটা এন্-সি । তিন হাজার তিনশ পাক্ এইভাবে থাকতো। এইবার এন্-সি-র জায়গার 'ই-জি' এসেছে !

১২

দশটায় মামাবাড়ি হাজির হলাম। মাতুল বারান্দায় একা বসে খাচ্ছেন। বাঁ-হাতে বাংলা কাগজের হেড্‌লাইনগুলো দেখে যাচ্ছেন। আমায় দেখে খুব একটা বড় করে মুচ্‌কী হেসে বললেন, 'আয় বস।' টেবিলের আর এক পাশে রাখা চেয়ারে টাল করা শাড়ী জামার ওপরেই বসে পড়ে বললাম, 'ই জি' মানে কি ?'

বড় বড় চোখ করে বললেন, 'কি পাগলের মত কথা কস্, 'ই জি' আবার কি ?' বাড়ীতে দিশী ভাষায় এবং অফিসে দিশী সুরে, কলকাতার ঢং-এ কথা বলার অভ্যাস মামার।

—'কেস-নাম্বারের আগে এন-সি থাকতো, এখন……'

হেসে ফেলে বেরিয়ে আসা দাঁতটাকে আবার দু'বারের চেষ্টায় যথাস্থানে নিয়ে, মুখের ভেতরের খাবারটা আস্তই গিলে ফেলে বললেন, 'তাই ক, কি হঠাৎ য়িজিয়িজি করতাছিস, ফুঃ।' অনেকক্ষণ নীরবতা পালন করে বললেন। 'শচীকান্তর সঙ্গে তোর কেমন খাতির আসে ?'

বললাম, 'আলাপ আছে- ভালই—কেন ?'

—'ওর কাসে যা, ওর কাসে যা—' খুব ফিস ফিস করে অদৃশ্য কান-পাতা লোকদের বাঁচিয়ে বললেন, 'একটা কথা কই, কাউড়ে, কইস না।' অনেকক্ষণ চুপ 'শচী ইচ্ছা করলে একটা কেস্ উত্রাইয়া দিতে পারে—এই কথা কইয়া দিলাম। ব্যস, আর কমু না - ওরে গিয়া ধর।' এমন গম্ভীর ভাবে পিলে চমকানো সুরে বললেন, মনে হলো কলকাতার প্যানেলে শচীও আছে। বোম্বেতে কিছু আভাস দিল না তো ! ওর সাথে দেখা করতে অবশ্য বলেছিল।

বললাম, 'ন্যাশানাল্ লাইব্রেরীর মিঃ দত্ত শচীর খুব প্রশংসা করছিলেন।'

—'দত্ত কে ? এস্‌কে দত্তগুপ্ত ট্রাইবুনাল জাজ ! তোর সাথে আলাপ হইয়া গিসে ?' খুব আশ্চর্য্য হয়ে যান মাতুল !

আমিও ততোধিক ব্যগ্রতা প্রকাশ করে ও'র ভ্রম-সংশোধন করে দিয়ে কণ্ঠস্বর একটু চড়ায় তুলে বলি, 'না, না। ন্যাশানাল্ লাইব্রেরীর অ্যানেক্স

২১

বিল্ডিং এর সিক্সথ ফ্লোরে—'

কথাটায় বাধা দিয়ে মামা বলেন, ধমকে, 'ওঃ। ওর নাম দত্ত না কি? তা, কি কয়?'

বললাম, না শচীর কথা বলছিল—শচী-ই নাকি প্রথম খোঁজ করে, ঢাকা গেজেটের তখন সব ছড়ানো ছিটোন ছিল—মেইন্-বিল্ডিং-এ। পর-পর অনেক এনকোয়্যারী শুরু হওয়ায়, দত্ত, রীকুইজিশন করে সমস্ত ঢাকা গেজেট ও-বিল্ডিং থেকে এ-বিল্ডিং-এ আনিয়ে নিয়েছেন।'

—'এ্যানেক্স বিল্ডিং? কি কইলি, সিক্সথ ফ্লোর?' মামা শুধোন।

—'হ্যাঁ, নিউজ পেপার সেকশন বলে ওটাকে! লিফট আছে—প্রায়ই আউট অব অর্ডার থাকে অবশ্য—হেঁটে উঠতে দম বের হয়ে যায়—।'

—'গেলেই দেখতে দেয়? নাকি মেম্বব হইতে হয় আগে।' মামা জেনে নিচ্ছেন।

—না, ডেইলী-রীডিং-রুম-কার্ড ইস্যু করে—।'

—'মেইন বিল্ডিং থেকে?' মামা জানেন।

—'হ্যাঁ, ওখান থেকেও নেয়া যায়। তবে, এ্যানেক্স-বিল্ডিং এর দোতলায় আর একটা রীডিং-রুম আছে, ওখান থেকেই কার্ড নিয়ে লিফটে সাততলায় চলে যাওয়াই সুবিধে। মেম্বর হয়ে কি লাভ; আপনি তো আর বাড়ীতে ওই গেজেটগুলো এনে খুঁজবেন না!'

—'তুই কিসু পাইলি, তোদের—।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বলি, 'নাঃ। খুব স্ট্রেনুয়াস জব! এক-একটা বছরের পাঁচ-ছটা করে ভল্যুম্। কাশীদাসী মহাভারত এক-একখানা। জানুয়ারী থেকে জুন আর জুলাই থেকে ডিসেম্বর। তার পার্ট ওয়ান, পার্টওয়ান-এ পার্ট টু্য, থ্রি, ফোর…অনন্ত!'

মিষ্টির প্লেটটা থালায় তুলতে গিয়ে, কি মনে করে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'খা।'

বললাম, 'না, আমি এইমাত্র—।'

—'ইয়ার্কী মারতে হইব না, ফাজিল্ ছেলে—খা, খাইয়া ফ্যাল্'

অগত্যা একবারেই বড় মিষ্টিটা দু'আঙুলের আলগোছা টোকায় উদরস্থ করি। দ্বিতীয় সন্দেশটি বাঁ হাতে ধরে মুখেরটা চিবুতে-চিবুতে বলে চলি 'কোন রেফারেন্স নেই তো, তাই প্রতিটি পাতা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে প্রচুর টাইম লেগে যায়। ফিফ্‌টিটু্য থেকে সিক্সটি পর্যন্ত ঢাকা গেজেট আছে।'

—'খুব টাইম লাগে না! দেখি কবে যাই! সময়ই হয় না। অফিসে তো সবাই হাসে। ভাবে সব পাগলের প্রলাপ। গভরমেন্ট কখনো টাকা

দেয়। শুধু শুধু পণ্ডশ্রম।' একটু ভেবে বলেন, 'কথাটা ঠিকই। এইদিকে তো আর যুদ্ধ হয় নাই। যুদ্ধ হইসে পশ্চিমে। আমরা আর কই যুদ্ধ দেখলাম ?' উঠে মুখ ধুতে বেসিনের কাছে গেলেন।

—'বাঃ! যুদ্ধ কি শুধু রক্তপাত, বন্দুকের গুলি নাকি ?' তর্কে নেবে পড়ি—'কটা জীবন গেল, ব্যস ? আর যারা এরজন্য সর্বস্ব হারিয়ে এদেশে এসে পথের ভিখিরী হলো। যারা, একটুকরো রুটির অভাবে, চিকিৎসার অভাবে স্বাধীন দেশের নোংরা বস্তিতে চোখ বুঁজল—এটা যুদ্ধ নয় ?'

—'এই, এই—তুই—পার্টীর সুর ধইরা ফেলাইসস্! থাম থাম, কইস না, কইস না—' দু'হাস নেড়ে নেড়ে ফোকলা চুপসে যাওয়া মুখে হস্ত-ধৃত দাঁতকটি সেট করে আবার বললেন, 'দয়া, স্রেফ দয়া কইরা বাঙালীদের দিতাসে। নাইলে কেউ দেয় নাকি ?'

—'কেন ? এটা আইন! ইন্টারন্যাশানাল ল্য! ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড'-ওয়ার থেকে চলেছে!' রেগে গেছি আমি 'দিতে ওরা বাধ্য। কেউ খোঁচায়নি—তাই দেরী, নইলে পাঞ্জাবের সাথে সাথেই আমাদের পাবার কথা।'

—'আরে তুই দেখি অনেক জানিস ?'

—'এতো সবাই জানে।'

—'দ্‌র। কেউ কোন খবর-ই রাখে না! খালি শরিকী। এখন শরিকী মিটাই—না……না এদের কেস সাজাই! ভাল লাগে না আমার! ধীরেনটা এখনো আইল না। কাগজপত্র কি আনবো কে জানে ? হুঁ্যা ভাল কথা—' আমার দিকে ফিরে খবরের কাগজটা ভাঁজ করে ব্যাগে ভরতে ভরতে বলেন, 'ধীরেন আসলেই তোর কথা কমু—নে। টাকা একটু বেশী নিব। তা হইলেও দেওয়া উচিত। ভাইবা দ্যাখ, আমাদের পক্ষে বাংলা-দেশ যাওয়া সম্ভব না। গেলে খরচা-ও কম না। তাল পামু না! তার চেয়ে, ও, ওই ডিপার্টমেন্টের লোক, ওরে দিয়া আনানোই ভাল। কি কস ?'

—হুঁ্যা। আমার তো তাই মনে হয়। তবে, জেনুয়াইন কাগজ আনবে তো ?'

হেসে ফেলে বলেন, 'এইটা কইসস! আমার তো 'আর-ও আর গুলো দেইখা একটুও বিশ্বাস হয় না। হাতের লেখা পড়া অসম্ভব। শচী তো কয়, না—জেনুইন। যা-ওক-গা, তোর সাথে একদিন এক্সিকিউট না, কি কইলি, এ্যানেক্স-বিল্ডিং-এ যামু। বুঝলি তো ? তুই খুঁইজা যা। ঘাবড়াস না, একদম ঘাবড়াস না।' ড-য়েশূন্য-ড় উচ্চারণে দাঁতটা আবার বইরে প্রোজেক্টেড হলো ভীষণভাবে।

বললাম, দাঁতটা ভাল ডেণ্টিস্টের কাছে বাঁধাচ্ছেন না কেন ? হিয়ারীং-সময় আবার কাস্টোডিয়ানের সামনে টেবিলে ছিটকে না পড়ে।'

হেসে বলেন, 'আর কইস্ না, মণ্ডলের কাসে যাওয়াই হয় না। যামু এর মধ্যে, দেখি।' চিন্তিতমুখে বিরাট ভারী ব্যাগটা খুলে কি একটা খুঁজে না পেয়ে ভেতর-ঘরে ঢুকলেন। ফিরে এসে ব্যাগটা আবার খুঁজলেন – আবার ভেতরে গেলেন—এই চলল খানিকক্ষণ। হঠাৎ খেয়াল হতে বললাম, 'খুঁজছেনটা কি ?'

—'এ্যাঁ, সীগারেট্টা কোই রাখলাম –।' বিড়বিড় করছেন। খাবার টেবিলের ওপর থেকেই দেশলাই আর প্যাকেটটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে উঠে পড়লাম। অফিসের দেরী হয়ে যাচ্ছে।

বললাম, কদিন 'এক্স্‌টেন্‌শন্‌ চেয়ে চিঠি দিই, কি বলেন ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ওতে কোন অসুবিধা হয় না। আমি তো একবছর হইল টাইম্ নিতাসি ! ডকুমেণ্ট্ ছাড়া হিয়ারীং এ বইসা কোন্ লাভ আসে ?'

বের হবার আগে 'দাদিমা'কে বলে আসতে ভেতরে গেলেন। এক সাথেই বের হলাম।

—'তুই অফিস যাবি না ? গেজেটে বাবা-জ্যাঠামশাইয়ের নামে কিছু চোখে পড়ে নাকি নজর রাখিস হ্যাঁ !'

ঘাড় নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ'। হাঁটতে হাঁটতে বললাম, 'ইজি মানে কি বললেন না ?'

—'ফুঃ স্—এইটা একটা প্রবলেম্ নাকি ?' একটু আপন মনে বিড়বিড় করে নিয়ে বললেন, 'বাড়ী যাবি তো ওইদিকে যা ?' একটু দাঁড়িয়ে বললেন, 'তা—হইলে ওই কথাই থাকলো ?' আমার চোখের দিকে, প্যারালাইজিং একটা দৃষ্টি ধরে রেখে বললেন 'এন্ সি. মানে নিউ কেস্, আর ই. জি. মানে এক্স্‌গ্রেশিয়া—তোর সঙ্গে যামু তা হইলে একদিন চলি।' মাতুল চলে গেলেন ওঁর ফ্যাক্টরীর দিকে। দুপুরের পর যাবেন বিবাদী বাগ।

১৩

সেল্‌সম্যানেজারের ঘরে আমাদের চারজনের যে ডাক পড়বে এটা জানা কথা ! এটা সপ্তম মাস। আজ পর্যন্ত ডেফিসিট্, পৌনে ছয়লাখ টাকা ! গত বছরের করেস্‌পণ্ডিং সেল-ফিগার থেকেও দেড়লাখ টাকা কম ! বিজয় শতপথী, যথাসম্ভব গম্ভীর কণ্ঠে সাজেশন দিল মেট্রোনিডাজোল্-এর ওপর সেলস স্টাফ যে ইন্‌সেনটিভ্‌স পাচ্ছে, সেটা যদি আমরা কেমিস্টকে দিই,

তাহলে এই বোনাসে এ্যালিয়োর করে, অনেকটা 'ডোপ্' হিসেবে ব্যবহার করে, কিছুটা ডেফিসিট্ মেক্-আপ করতে পারি।'

এম্. পরদীপ, তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলো, 'না, ভাই, এই কোম্পানীতে কোন ইনসেণ্টিভের পয়সা ছিল না। দু'বছর হলো যতই হোক, কিছু পাচ্ছে, সেটা কেড়ে নিলে রীপার্কাশান হোবে।'

আমি সাপোর্ট দিয়ে বললাম, 'বরঞ্চ সুপারভাইজারদের কমিশনটা ছেড়ে দেয়া যেতে পারে, কিন্তু মেন-এ্যাট দ্য-ফার্স্ট-পয়েন্টের মুখের গ্রাস সরিয়ে নিও না।'

দেবরাজ ভট্ট-র জন্যই এতোক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। ঢুকেই কমেন্ট করল, 'চল, বাম্বুটা নিয়ে এসেই বসি।' সবাই হেসে উঠে সীগারেট আদান-প্রদান করে আবার শুরু করল। সেলসম্যানেজার ফ্রী হলে, এঘরে খবর পাঠাবেন।

এম. পরদীপ বলল, 'নেহী ভাই চাউধুরী, দে'র ইজসাম থিং রং সাম-হোয়্যার। সেল করতে চাইলে, সেল করা যায় না? সাপ্লাই পোজিশন থ্রু আউট্ দ্য ইয়ার হ্যাম্পার করেসে।'

বিজয় বলল, 'সেলস-এইডস-এর ওই একই অবস্থা। সেই আইটেমটাই থাকবেনা; যেটা যে মাসে প্রোমোশন হবে। লিটারেচার চাইলে পাওয়া যায় না একটা—।'

—'এসব ভাবলে মনে হয়……' হাসতে হাসতে বলি, 'ম্যানেজ্মেন্ট্ চাইছেনা কোম্পানীর সেল্স বাড়ুক! নাকি ক্যাপাসিটি-ই নেই।'

পরদীপ চিন্তিত মুখে বলল, 'ডি. জি এস. এন. ডি-র রেট্ কন্ট্রাক্টের অতবড় অর্ডারটা সাপ্লাই হলো না টাইম্লী! কেমন কড়া চিঠিখানা এসেছে দেখেছ?'

ভট্ট কেশে নিয়ে ব্যাগটা গুছোতে গুছোতে, ট্রাউজারটা ওপর দিকে টানতে টানতে বলছে, 'গভর্ণমেন্ট ব্যবসা থাকুক, ট্রেডের কথা বল, ট্রেডের কথা ভাব। আমাদের ট্রেডের ওপরেই আসছে বাম্বুখানা!'

—'তবে এটা ঠিক।' বিজয় বলে, 'ইন্সেন্টিভ স্কীমটারও কোন মানে হয় না! কোন ছেলেকেই এ্যালিয়োর করে না। ডিস্ট্রিক্টের ছেলেগুলোই যা একটু লাভবান হবার আশায় খাটে—কলকাতার জয়েন্ট্ পুল্-এর ছেলেরা চেষ্টাও করে না।'

—'সবাই ভাবছে, ওরা তো করছে, আমি না করলেও কিছু এসে যাবে না। ইন্সেন্টিভ জয়েন্ট্ পুলে ঠিক এসে যাবে।'

—'এদেরও দোষ নেই' পরদীপ বিদ্রূপ করে ওঠে 'এতোকাল ইনক্রিমেন্ট

দিবার স্টাইল দেখেছ না? যে কাজ করেছে সীনসিয়ারীলী, সে স্রেফ এক্সট্রা পাইল ফাইভ রূপীজ। আরেকজন অনেক কম খেটে কোন ডিসক্রিপেনসীজ ফিল করল না! একটা সেলস-এর স্টাফ্ সারা বৎসরে ষাট রূপয়ার ডিফারেন্স্ কি ফিল্ করবে, বোল।'

—'কারেক্ট্!' চুপ করে ভাবি। 'ম্যানেজমেন্টের কী পেরেন্ট্ কোম্পানীর প্রতি ইন্টারেস্ট কমে যাচ্ছে! বাট্ হোয়াই—! স্যাটেলাইট্ কোম্পানী থেকে লোন-লাইসেন্সে্ পেরেন্ট কোম্পানীর প্রডাক্ট তৈরী করে নেয়া হচ্ছে। এইভাবে স্যাটেলাইটগুলো দাঁড়িয়ে গেলে, তাদের নিজেদের প্রডাক্ট মার্কেটে দেবে। পেরেন্ট কোম্পানীর শেল্টারে সুন্দর দাঁড়িয়ে যাবে নিজের পায়ে। তখন কি এতোবড় এস্টাব্লিস্‌মেন্টের প্রতি, এই দিনে দিনে বেড়ে ওঠা বিভিন্ন দাবীর প্রতি, ম্যানেজমেন্টের কোন সহানুভূতি থাকবে?'

টী-বয় ভোলা এসে খবর দিল সেলসম্যানেজার ডাকছেন। ঘরেব টেনশন—দেয়ালের গ্রাফে, জানালার পর্দায়, টেনশন-চেয়ারে, টেবিলের ফাইলগুলোতে, টেনশন—বসের চশমার কাঁচে!

—'সো ইউ হ্যাভ ফেইলড।' ঘরের শান্তি ভঙ্গ করলেন, বস। 'ভেবেছিলাম ওয়েস্ট-বেঙ্গল-এর ভার তার প্রপার গার্জেনদের হাতে তুলে দিয়েছি। আমি নিশ্চিন্ত মনে ওয়েস্টার্ণ ইণ্ডিয়ার এক্সপানশন স্কীমে হাত দিয়েছিলাম—এদিকে নজরও দিইনি। আর তোমরাও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছ! আর এতদিনের বুনিয়াদ ধ্বসে গেছে, এই কটা মাসে!' তারপর অনেকক্ষণ মুখের চোখের এক্সপ্রেশন দিলেন! ডানদিক, বাঁদিকে ঘাড় কাত করে 'ট্যাবলো' প্র্যাক্‌টিস করলেন! আমরা চারজন ভূতের মত বসে থাকলাম—অন্ধকার অডিটোরিয়মে।

'প্রপার গার্জেন' শব্দটা আলোড়ন এনেছে আমাদের সকলের মধ্যেই সন্দেহ নেই! সাত আট বছর ধরে এক-একটি 'রেপ' একই এরিয়াতে, বোরডোমের অন্ধকারে পচ্‌ছে। তাদের কাছ থেকে কি কাজ এক্সপেক্ট করবে কোম্পানী? এরিয়া রী-শাফ্লিং-এর কথা আজ তিনবছর ধরে ডেফারড্ হয়ে থাকছে—কেন? সুপারভাইজারদের কথার দাম দেয়া হয়েছে কি? আর আমরাই 'প্রপার গার্জেন?' পিত্তি জ্বলে যায়!

—'অথচ দিল্লীব্রাঞ্চের কি দারুণ এ্যাচিভমেন্ট। প্রত্যেকের ফর্টি পার্সেন্ট ফিফ্‌টি পার্সেন্ট রাইজ। অক্টোবরেই টারগেট কম্প্‌লিট্ হয়ে যাবে!' —বস বলে গেলেন।

খুব স্বাভাবিক কথা! মনে মনে বলি। দিল্লীর ব্রাঞ্চে এতদিন কোন কাজ হয়েছে নাকি? ওখানে পুরো মার্কেটটাই এক্সপ্লোর করা বাকী!

সেলের রাইজ হবেই। তিনবছর হলো তিনটে ছেলে ওখানে ঘুমুতো! এখন তাদের ওপর চাপ এসেছে। তাছাড়া; সাপ্লাই লাইনটা—তার কী সেল, কী স্যাম্পল,—কোনটা ওদিকে গোলমাল হয়েছে, শুনি – !

কে তর্ক করবে? সুপারভাইজারের চাকরীটাই এমনি। নীচের থেকে লাথি এবং ওপরওয়ালার গলাধাক্কা। চুপ করে স্টীম অফ হতে দেওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে। তবু কুঁকিয়ে একটু বলেই ফেলি, 'শুধু আমাদের নয়, অনেক মাল্টিন্যাশানাল-হাউজের সেল-ও খুব ডাউন।'

ছাইয়ের ওর ঘৃতাহুতি দিলাম। বজ্রকণ্ঠ হলো, 'মাল্টিন্যাশানাল হাউজের পাঁচকোটি টাকার সেলে দশলাখ ডাউন, কোন ফ্যাক্টর নয়। তোমার অবস্থাটা কোথায় দাঁড়ায় ভেবেছ? অস্তিত্ব থাকে?'

চুপ হয়ে যাই। একথাটা ঠিক। আর তিনজন এমন কুলুপ এঁটে রয়েছে– ! একা আর কথা বলা সমীচীন মনে করলাম না।

১৪

নীরবতা ভঙ্গ করল এবার বন্ধ দরজাটা। নক করেই ঢুকে পড়ল কৈশোরে মাখামাখি সদাহাস্যময় টুকুন্। সবাই একটা রিলিফ পেল যেন। কি একটা ড্রাগের স্যাম্পল নিতে এসেছিল। আমাদের বস্‌কে 'কাকু' সম্বোধনে কাত করে দিয়ে ও যখন চলে যাবে, তখন আবহাওয়াটা আরও লঘু করার জন্যই 'ওকে' বললাম, 'কি হলো এটা?'

ও আদো গলায় বলল, 'কোন্‌টা?'

পোষাকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, 'জীবনে প্রথম দেখলাম তুমি এমন পরিষ্কার ধোপ-দুরস্ত পোষাক পরতে পারো।' সবাইকার মিলিত হাসির মধ্যে লজ্জিত টুকুন এই প্রথম উত্তর না দিতে পেরে, পালাল! ওর বাড়ীতে, বাড়ীর সামনে রাস্তায়, অফিসের সোশিয়াল গ্যাদারীং-এ সর্বত্র টুকুনকে একটা তিন সপ্তাহ ধরে না ধুয়ে ব্যবহার করা অনেক ছোপ সমেত পাজামা, আর তার ওপর, সাইজে বড় বোতাম বিহীন, গুরু পাঞ্জাবী, একই রকম লাট হয়ে যাওয়া পোষাকে দেখেই অভ্যস্ত। নিজেকে আঁতেল ভাবার এটা ওর নিজস্ব পরিকল্পনা। ভিক্টর কলকাতায় এলে, ওকে দেখানো যেত!

—'এরকম কমেন্ট কোরো না।' বিজয় শতপথী চাপা স্বরে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করল। এ-ই কিন্তু ভবিষ্যতে ওর বাবার শেয়ার-হোল্ডিং-এর জোরে, ডিরেক্টর হয়ে বসবে!

সেল্‌স্‌ম্যানেজার কথাটা একটু শুনে ফেলেছেন। বললেন, 'কি, কী কি

হলো ?' গলার স্বরে পূর্বের আর্টিফিশিয়াল্ টেন্শন্টা নেই।

হাসতে হাসতে বললাম, 'আপনাকে বলা যায়, যদি কথাটা আর কাউকে না বলে দেন— !'

—'এ্যাঁ, এতোখানি সীরিয়স্ ব্যাপার ?!' রাজেশ খান্নার মত ঘাড় কাত্ করে বললেন।

পরদীপ্ বলল, 'হ্যাঁ-জী, ফিউচার্ ডিরেক্টর সম্পর্কে কথা ঠিক না।' দু-চার কথায় বস্ ব্যাপারটা অনুধাবন করে নিয়ে বললেন,

—'নট্ নেসেসারীলী, বাই মীন্স্ অব্ হোল্ডিং শেয়ারস, ওন্লী, ওয়ান মে নট্ বিকাম্ এ ডিরেক্টর অব্ দিস্ কোম্পানী। আবার হতেও পারে। তবে, হবেই একথা জোর করে বলা যায় না।'

ভট্ট বলল, 'প্রাইভেট্ লিমিটেড্ কোম্পানীতে তো তাই হয়—।'

—'কি হয় ?'

—'বাবার শেয়ার হোল্ড করে ছেলেই ডিরেক্টর হয় ! কোটি টাকার বেশী সেল হলেই বাজারে ফ্লোট করতে হয়। শেয়ারস তখন পাবলিক-লিমিটেড হয়ে যায়। আর ঘরোয়া কোম্পানী থাকে না !'

বস বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন, 'না ওটা স্মল স্কেল আর লার্জ স্কেল ইণ্ডাস্ট্রীর কথা বলছেন আপনি। কোটি টাকার সেল নয়। ইকুইপমেন্টস উইথ ল্যাণ্ড নিয়ে দশলক্ষ টাকার এ্যাসেট থাকলে সেটা লার্জস্কেলে পড়ে। তার নীচে থাকলে, স্মল স্কেল। আর শেয়ারস তো আমি নিজের লোকের মধ্যেও ফ্লোট করাতে পারি। অসুবিধেটা কোথায় ?'

হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ফেললাম, 'আচ্ছা ছোট কোম্পানীর ম্যানেজমেন্ট যদি মনে করেন সেল বেশী বেড়ে গেলে প্রবলেম অনেক বেশী। ছোটো-খাটো থাকলে তাকে কন্ট্রোল করা সোজা। —তাহলে কোম্পানীও ঘরোয়া থাকে— ।'

—'এটা যদি এ-কোম্পানীর কেউ ভেবে থাকেন, তাহলে সেটা সুইসাই-ডাল হবে।' বজ্রকঠিন স্বর শোনা গেল ! এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়লেন কেন ভদ্রলোক ?

—'না, না আমি এ-কোম্পানী নিয়ে বলিনি, জেনারেল ভাবে—' কথাটা কম্প্লিট করতে পারি না।

উনি বলছেন, 'না, যাই হোক, আমি যদি এখন ম্যানেজমেন্টের এ্যাসো-সিয়েট থাক তো, একা বিরোধিতা করবো ! এ স্যুইসাইডাল পলিসি বুঝছ না ! গ্রোথ আটকে দিলে, দুদিন সেলের মোমেন্টাম থাকবে। তারপর ডিক্লাইন, অবশ্যম্ভাবী। মানুষের শরীর দিয়ে দেখ না। শিশুবয়েস থেকে

গ্রোথ্ হচ্ছে। চল্লিশে এসে থেমে গেল, কিন্তু তখনও ফ্যাট্ জমছে, বুদ্ধির বিকাশ হচ্ছে। ষাটের পর আর গ্রোথ্ নেই। তখন ডেক্লিনেশন্ অবধারিত। অবশেষে ডেথ্।'

এতক্ষণ ধরে এই ব্যাপারটার ওপর বক্তৃতা দিলেন কেন? একটু থতমত খেয়ে গেলেন মনে হলো। না কি ওটা আমাদের মনের ভুল!

আসল যে কথার মীটিং, সেটা এরপর দু-একটা সাজেশনেই শেষ হলো। বিশেষ কিছু না। এখন থেকে মান্থলী মীটিংগুলোতে, বস্ এসে বসবেন, উনিই কন্ডাক্ট করবেন। এই বছরের গোড়া থেকে সুপারভাইজাররা বাই-রোটেশন্, এক এক মাসে, এক এক জন, কনডাক্ট করছিল। সেলসম্যানেজার এটা চাননি তখন। কিন্তু মেনে নিয়েছিলেন বাধ্য হয়ে। উনি শর্ট সার্কিট পছন্দ করেন! এটা বন্ধ না করতে পারলে, সো কল্ড্ 'প্রপার গার্জেন্' হওয়া অসম্ভব। যাকগে আমার কি! কর্তা ইচ্ছা কর্ম।

১৫

ভট্টই ঠিক বলে, 'কানে গুঁজেছি তুলো, আর পিঠে বেঁধেছি কুলো।' কথাটায় প্রথম প্রথম খুব রাগ হতো ভট্টর ওপর। মনে হতো ও একটা 'ব্যাক্-বোন্-লেস'। কিন্তু এখন যত দিন যাচ্ছে ততো ভুল ভাঙছে। ততো হেরে যাচ্ছি। এখানে শেখবার আদর্শ সম্মুখে নেই। কি করে একজন বড় হবে? খালি বড় বড় বুলি!

মীটিং-এর বাইরে এসে, রাস্তায় নেবে, সবাই মুখর হলো। ধারণাটা কি তাহলে ঠিক, 'ম্যানেজমেন্ট চায় না, সেল খুব বাড়ুক?'

অফিসে কি নাটক চলছে? সবাই যে যার ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছে? তৃষিৎকে বললে হয়তো এখনই একটা উপন্যাস লিখে দেবে।

১৬

তৃষিতের কথা মনে হতেই, খেয়াল হলো, ওর লেখাটা সিলেক্টেড হয়ে রয়েছে। সেটা কোন্ সংখ্যায় ছাপা হবে জানা হলো না। ওর সাথে স্বাধীন বাজার-এর অফিসে যাওয়া হয়নি। সেদিনটা সকাল দশটা থেকে চারটে অবধি ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে ছিলাম।

লাইব্রেরী যাবার পথে মহারাজাধীরাজের বাড়ী হয়ে গেছিলাম। যদিও কোন রেফারেন্স মনে করতে পারলেন না। জ্যাঠামশাই, শুধু বললেন

২২

'তোমারে আমি ডকুমেন্ট দিবাম। তোমার বাবা হইলে হয়তো দিতাম না। আব্দুলরে দিতাম না, কিন্তু তোমারে দিবাম্! দেখি, বোলপুরে কবে যাই। এখন শরীরটা ভাল্ না। তোমার জন্য-ই যাইবাম্ একবার।' বৃদ্ধকে ডিসটার্ব না করে যেদিন বের হয়ে পড়েছিলাম। বাবাকে আর আমাকে দেখার কোন তফাৎ নেই। তবুও কথাটা উনি প্রায়ই বলেন। আমি অতো প্যাঁচ বুঝি না। আমার ডকুমেন্ট পাওয়া দিয়ে কথা—তা, সেটা সোজাসুজিই আসুক আর হাত ঘুরেই আসুক, কিছু এসে যায় না।

তাই আজকে আবার ঢুকলাম পারস্য করতে। ঘরের দরজায় লুক্-থ্রু দিয়ে দেখে দরজা খুলে দাঁড়ালেন মহারানী ধীচেতনা স্বয়ং! দেখা হলেই প্রণাম করার নিয়ম। দরজা ছেড়ে দাঁড়ালেন। হাসলেন না পর্যন্ত! এরকমটা মাঝে মাঝে হয়।

সান্ধ্যভ্রমণ করা জ্যাঠামশাই-এর একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। আজকেই ব্যতিক্রম। বললেন দিন ছয়-সাত আগে রাস্তায় চোট্ পেয়েছিলেন ফুটপাথের পট্‌হোল্‌স-এ। কে এক সহৃদয় মহিলা ওঁকে বাড়ী অবধি পৌঁছে দিয়ে যান। সেই থেকে আর বের হচ্ছেন না। বাড়ীতে বসে বসেও হাঁপিয়ে উঠেছেন। হাইলেন্সের কাচের উগ্র ঝল্‌কানি ডিঙ্গিয়ে ছবিও এঁকেছেন অপূর্ব। জলরঙের সাহায্যে, দুটি পাহাড়ী ঝরণার ছবির কুলু-ধ্বনি, যেন কানে শুনতে পাচ্ছি। থ্রি-ডাইমেনশন্ এফেক্টের কল্যাণে অনেক ভেতরে চলে যায় দৃষ্টি। চুপ করিয়ে রাখে খানিক।

বলি, 'এটা কি আগের তোলা কোন ফোটোগ্রাফ থেকে আঁকলেন, না মন থেকে?'

—'নাঃ একেবারে মন থেইক্কা।'

বললাম, 'ছোটবেলায় আপনার সাথে একবার শিকার পার্টীতে গিস্‌লাম। জায়গাটার নাম যতদূর মনে পড়ছে আড়ংপাড়া ফরেস্ট রেঞ্জ।'

খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বৃদ্ধের মুখ। 'হ্যাঁ তুমি গিস্‌লা, তোমার মনে আসে? হইসে ছবিটা? এই জায়গাতেই ক্যাম্প হইসিল মিল্‌তাসে?'

খুব ধীরভাবে বললাম, 'এখনো চোখ বুঁজলে, যেমন ছবিটা ভেসে ওঠে, ঠিক তেমনি হয়েছে এটা।'

পরম সন্তোষে অনেক পুরোনো শিকার-কাহিনী বলে চললেন জ্যাঠা-মশাই। মহারাণী ঘরে ঢুকতেই হঠাৎ কথা থামিয়ে ধমকের সুরে বললেন, 'রাজুরে কিসু খাইতে দাও! ছেলেডা অফিস থেইক্কা খাইট্টা খুইট্টা আইসে। ঘরে যা থাক্‌বো, দিবা। তোমাগো এইডা কওন্ লাগে ক্যান্?'

জ্যাঠাইমা বিরক্ত স্বরে বললেন, 'হোচ্ছে, হোচ্ছে, দেয়া হচ্ছে বাবা, একটু

চুপ করো তো !' ও ঘরে চলে গেলেন। পাশের ঘর থেকে কার আরেকটা গলার স্বর পাওয়া যাচ্ছে।

জ্যাঠামশাই খেই ধরিয়ে দিতে বললাম, 'আপনাদের প্রাইভেট্ ফরেস্ট সবশুদ্ধু কতটা হবে, জ্যাঠামশায় ?'

—'তা তো কইতাম্ পারতাম্ না, মনো নাই।' মাথায় হাতটা বুলোতে থাকলেন।

—'অন্যান্য শরিকদের প্রাইভেট্ ফরেস্ট আছে, গেজেটে দেখলাম। আপনাদের কোন নাম নেই কেন ? ও'দের আর আপনাদের কি সমান সমান অংশ ?' সময় বুঝে ও'র স্মৃতিতে মৃদু মৃদু আঘাত করে চলি, যদি কোন রেফারেন্স মনে পড়ে।

—'না, নাঃ।' একটু পুরোনো দিনের কথা ভেবে হেসে নিয়ে বললেন, 'বাটোয়ারী মকদ্দমার সময়, আম্‌রার ওইখানে, প্রথম কোর্ট আইয়া বইল।' স্টেট্ ভাগ হইতাসে। কামড়া-কামড়ি ! আমরা কেউ কিছু ছার্‌তাম না। আমি ফরেস্ট লইয়া পড়লাম। এইডা, আমরার বাড়ীর পুরোটাই থাউক। মধ্যম তরফের কর্তারা গেলাইন ক্ষেইপ্যা। তাইন্‌রাও ওইডা ছারবাইন্ না।' হাসতে হাসতে দম নিলেন। চশমাটা খুলে চোখের জলটা মুছে বলে চললেন, 'এই চল্‌তাসে। হঠাৎ মধ্যম্ তরফ, ফরেস্টের ক্লেইম্ ছাইরা দিয়া ধরলাইন্ এগ্রিকাল্‌চারাল ল্যাণ্ড। পার্টিশন হইয়া গেল। মাঝখানে তেনারা পাইলাইন্ বেস্ট ল্যাণ্ডস অব দা পরগণা, আর আমরা গরুর মতন পাইলাম দশ হাজার একর ব্যারেন-ফরেস্ট।' আমি সচকিত !! একারেজ পেয়ে গেছি সঠিক ! তখন কে'পে কে'পে উদ্বল হয়ে উঠছেন বৃদ্ধ, ঠিক একটা শিশুর মতন 'তখন কি আর বুঝ্‌ছি রে। কত ধানে কত চাইল ?' বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নেড়ে নেড়ে বললেন।

১৭

ঠিক তক্ষুণি ঘরে ঢুকল মীরাদি, 'বাবা আপনি সেই থেকে ভীষণ বক্‌ছেন, চুপ করে থাকুন।' আমার দিকে না তাকিয়ে থম্‌কে বলল, 'তুই যা তো রাজ, যা এখন যা !'

কেমন দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে চাইছে যেন ! পেছনে অন্য কারোর ইঙ্গিত আছে মনে হলো ! মীরাদি এরকম করে না কখনো।

মীরাদিকে ইশারায় নিরস্ত হতে বলে আপন মনে বিড়বিড় করে বললেন, 'তোমরার কাজ তোমরা করগা, আমরার কাজ আমাদের করতে দাও।'

মীরাদি রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে, আমাকে বললেন, 'এদের কোন ইন্টারেস্ট নাই জাননের। তোমার লগে কথা কইয়া বড় আনন্দ পাই। আমার স্মৃতিচারণ ছাড়া আর কী আসে কত? এরা এইসব শুনতে চায় না। আমার যে কইতে বড় ভাল লাগে। বাইরের লোকরে তো এই গপ্প কওন যায় না। বুঝতো-ও না। তোমারে কইয়া খু-ব আনন্দ পাই। তুমি মাঝে মাঝে আইও। ও, হো, ভাল কথা—দূর—কামের কথা কিসস্যু মনই থাকে না। মস্তিষ্ক আর কাজ করত চায় না রে। আমি অনেক কাগজপত্তর পাইসি। কোইসিলাম না, সব সাজানি আসে! সব জড়াজড়ি কইরা রাখা আসে। আমি একটু সুস্থ হইয়া লই। ভাল কইরা দেইখ্যা তোমারে দিবাম্। সেইগুলি জয়েন্ট প্রপার্টির কাগজ, সেইগুলাই নিও। অন্য গুলাইন্ লইয়া আর কি হইব?'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আচ্ছা, আমি তাহলে আগামী সপ্তাহে একটা ছুটির দিনে আসবোখন?' আমার আনন্দে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত। ডকুমেন্টের দুশ্চিন্তা, গণ্ উইথ দ্য উইণ্ড! রাস্তায় চলে আসি। বৃদ্ধের শেষের কথাগুলো চোখে জল এনে দেয়। সত্যি ওঁর মনের সাথী এখন কেউ নেই। সবাই খালি চুপ করিয়ে রাখতে চায়, এই ইতিহাসের এক জীবন্ত পৃষ্ঠাকে। আঠারশ সালের শেষ যাম থেকে শুরু করে ঊনিশশো সালের শেষ যাম পর্যন্ত এক দীর্ঘ জীবনে ভাঙাগড়ার ইতিহাস।

১৮

বাইরে বের হবার মুখে, পাশের ঘর থেকে জ্যাঠাইমা বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, 'একটু কিছু খেয়ে যা বাবা নইলে উনি কিন্তু খুবই রাগ করবেন, আয়, একটু কিছু খেয়ে যা—' জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলেছিলাম, —'থাক, এক্ষুণি অফিস থেকে টিফিন করে বের হলাম, আরেকদিন খাওয়া যাবে।' বাইরে এসে এখন খিদেটা জোরদার হয়েছে। সন্ধ্যের মুখে খাওয়াটা একটা বাজে অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে।

১৯

চিঠি এলো বোম্বে থেকে। লিখেছে রাধা। আগামী শীতে বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। শঙ্খ নাকি এ কদিনেই ঘোরতর সংসারীর মত জিনিসপত্তর দরদাম করে কিনছে। ঘর সাজাচ্ছে, এখন থেকেই। বন্দনারা, বাবা,

মা সমেত ওখান থেকে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন। কলকাতায় ফিরে আমাদের বাড়ীতে নাকি আসবেন। মা, যে বন্দনাকে দেখতে চেয়েছেন, তার উত্তরেই ওরা ওই কথা বলে গেছেন। সবশেষে আমার কাস্টোডিয়ান পর্ব সমাধা হলো কিনা এবং আমি যেন কথার খেলাপ না করি। ওর মাকে কথা দিয়েছিলাম রাধার বিয়েতে অবশ্যই যাব।

ঠিকানায়, রহিমিয়ার রেহমান চৌধুরী এবং ভেতরে 'রাজা' সম্বোধনের চিঠি। রাজার পরে 'দা' শব্দটাও লাগায়নি ডেঁপো মেয়েটা!

হাসছি দেখে মা জিজ্ঞেস করলেন 'কে লিখেছে রে?'

—'বোম্বের রাধা।' চিঠিটা ধরিয়ে দিই মা-কে।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বের হয়ে পড়ি। 'জেরোগ্রাফি' ডিপার্টমেন্টে গিয়ে বসতে হবে। মিঃ দে আর মিঃ সেনগুপ্ত বলেছেন, আজকের মধ্যেই কম্‌প্লিট্ করে দেবেন।

২০

এ কদিনের প্রচেষ্টায় অনেকগুলো নোটিফিকেশন আবিষ্কার করেছি, ঢাকা গেজেট থেকে। পেজ্ মার্ক করে, পেজ্ নাম্বার, ভল্যুম্ নাম্বার টুকে, মিঃ পি কে দত্তর কাছে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। নীচতলায় ফর্ম ফিল্ আপ্ করার সময় মিঃ এ বি রায় ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'কি মশায় এতো-গুলো জেরোস্কোপ্ নিচ্ছেন, এতে মেলা খরচা হবে কিন্তু পোষাবে তো?'

হেসে বলেছিলাম, 'আশা তো রাখি।' ভদ্রলোকেরও জোর করে কল-কাতার ভাষায় কথা বলার প্রবণতা আছে।

সবচেয়ে বড় কাজ আছে বত্রিশ পাতার শীড্যুল্, বাবা, জ্যাঠামশাইদের জমিদারীর আণ্ডারে, যত তালুক সম্পত্তির বিবরণ। পরপর পৃষ্ঠাগুলো পড়ে, ঘাবড়ে গিসলাম। বাবাকে ট্যাক্সি করে এনে দেখিয়ে নিয়েছি। হ্যাঁ, এগুলোও কাজে লাগবে। আর আছে কম্‌পেন্‌সেশন রোল্ এ্যাসেস্ করতে দেয়া গেল, বলে, গভর্ণরের প্লীজিং বয়ান এবং তারপর বিভিন্ন জায়গার জমিদারদের নাম ঠিকানা, স্টেটের নাম, আর দুটো করে এল আর. নাম্বার। গভর্ণরের প্লীজ্‌ড্ হয়ে যাওয়া আরেকটি বয়ান, বত্রিশ পাতার গোড়ায়ও ছিল অবশ্য। তবে সেটা একোয়্যার করে খুবই প্লীজড্ তিনি! কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এ সম্পত্তি যাওয়ার নোটিফিকেশনের রেফারেন্সটা বাবার কাছে ছিল। বৃটিশ ইণ্ডিয়ার ব্যাপার। তখন একটাই ছিল, ক্যাল্‌কাটা গেজেট মেইন বিল্ডিং-এ আছে। রেফারেন্স্ পাঠিয়ে আনিয়ে নিয়েছে নিশ্চয়ই।

ব্যাগটা দারোয়ানের হাতে ছেড়ে দিয়ে টোকেন্ নাম্বারের ডুপ্লিকেটটা পকেটস্থ করে, এনকোয়ারীর সিকিউরিটি ইন্‌চার্জের দিকে একটা হাসি ছুঁড়ে দিয়ে, ফোটোগ্রাফি ডিপার্টমেণ্টে ঢুকলাম। বড় ঘরটায় কাউকে দেখলাম না! এ বি. রায়-ও আসেননি মনে হলো। তাঁর সহকর্মী ও ডিপার্টমেণ্টাল্ ইন্‌চার্জ মিঃ সেৎলানাকে কাঁচের পার্টিশন দিয়ে দেখা গেল। এ-কয়দিনে ইনিও আমার মুখটা চিনে ফেলেছেন। বললেন, 'ইয়োর ওয়র্ক ইজ্ ইন্ দ্য অফিং।'

হেসে বললাম, 'হাও লং?'

উনি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'দ্য মেশিন, ইজ্ নট্ ইন্ অর্ডার-ইট ইজ্ গিভিং ট্রাবল্।'

মনে মনে বললাম, আমার ব্যাপার তো, সোজাসুজি কোন কাজ হবে না। এতো জানা কথা! এখন জেরোক্স মেসিনের কি গতি হয় দেখি!

বড় ঘরে খুট্-খাট্ আওয়াজ হতে পেছনে তাকিয়ে দেখি, ক্যান্টিন্ ফেরৎ সেনগুপ্ত, দে এঁরা এসে একটা মাইক্রো ফিল্ম্ পরীক্ষা করছেন এন্‌লার্জার্-এ ফেলে। পাশে ঝুঁকে দেখলাম মাইক্রোস্কোপের একটা রীভার্স সংস্করণের ভেতর দিয়ে প্লেটের ওপর ছায়া পড়ছে বইয়ের পৃষ্ঠার ছবির। একটা গোল চাকতি ঘুরিয়ে, ফিলমটা খোলা হচ্ছে, এক রীল থেকে আরেক রীলে। থীসিসে কারো কাজে লাগবে মনে হলো। বৈষ্ণব ফিলজফীর ওপর একটা আর্টিক্‌ল্।

ছোট্ট মানুষটি, মিঃ সরকার, জেরোগ্রাফীর এয়ার-কণ্ডিশনড ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বললেন, 'নাঃ কোন কাজ হচ্ছে না। শীতকাল ছাড়া মেশিনটা কোন কাজেই আসে না।'

মিঃ দে আর সেনগুপ্ত যুগপৎ পেছনে তাকিয়ে বললেন, 'ব্লার্ড ইম্‌প্রেশন্ আসছে?'

'নাঃ, ডার্ক হয়ে এমন পুড়ছে, কিছু লেখা বোঝাই যাচ্ছে না।'

অগত্যা? ক'দিন ওয়েট করা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু ইনডেফিনিট পীরিয়াড তো আর বসে থাকা যায় না। কবে মেশিন সারাবে কিলবার্ণ, তার ঠিক কি?

কি করা যায়? মিঃ দে-ই সাজেশন দিলেন, 'খরচা কিছু বেশী হবে, মাইক্রোফিলম করিয়ে নিন না।'

—'মেশিন ঠিক আছে?'

ওঁরা হেসে বললেন, —'হ্যাঁ ঠিক আছে।'

—'চার্জ কত পড়বে?'

—'প্রতি প্রিণ্ট চার টাকা, আর মাইক্রোফিল্মগুলো প্রতিটি ঊনিশ পয়সা।'

ভেবে দেখলাম, জেরোক্স প্রতি পাতার দুটো করে কপি করতে চেয়েছিলাম। এক কপি সাবমিট করবো, অন্যটি নিজের কাছে রেখে দেব। তার চেয়ে একটা করে প্রিণ্ট যদি নিই, আর ফিল্মটা নিয়ে নিই, তাহলে ভবিষ্যতে দরকার হলে ওটা থেকে প্রিন্ট—বাইরের স্টুডিও থেকেও করে নেয়া যাবে। দামে সস্তা করার জন্য বললাম,

—'গেজেটের দুটো পাতার একটা করে স্ন্যাপ নিলে কি, তার এনলার্জমেন্টে পড়তে অসুবিধে হবে?'

ও'রা বললেন, না, না কিছু অসুবিধে হবে না।'

সেই কাজই শুরু হলো তক্ষুনি। অন্য কেউ হলে ও'রা হয়তো আরেকদিন আসতে বলতেন। কিন্তু ও'দের সাথে কয়দিনে বন্ধুত্ব হয়ে যাওয়ায়, আর ও'রা এত ভদ্র—।

বড় বড় টেব্ল্-এর একটির মাঝখানে, গেজেট্টা খুলে ফ্ল্যাট্ করে রাখা হলো। বিভিন্ন প্রথায় মাপ-জোক করে, ক্যামেরাটা স্লাইড্ করে ওপর-নীচ করে, পজিশনে এসে উবু হয়ে থাকল বইটার বুকের দিকে তাকিয়ে। চারকোণ থেকে মারকারী লাইটের চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া আলোয় ঝক্ঝক্ করে উঠলো খেলার মাঠ! এদিকের রীল্ থেকে ওদিকের রীলে যাবার সীসটেমটা চেক করে নিয়ে, মিঃ দে ডান হাত দিয়ে সুইচ টিপতে লাগলেন আর বাঁ হাত দিয়ে পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগলেন। প্রতিবার সুইচে, অটোমেটিক ফিল্মটা রোল হয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে। একটা চিড়্চিড় আওয়াজ উঠছে থেকে থেকে।

সমস্ত অপারেশনটা হতে কুড়ি মিনিট লাগল। রোলটা খুলে ডার্করুমে চলে গেলেন দু'জন। বেরিয়ে এসে বললেন, 'শুকোতে দু-তিন ঘণ্টা লাগবে। ঘুরে আসুন কোথা থেকে?'

—'প্রিন্ট-ও হয়ে গেছে?' উত্তর পাবার আগেই দেখলাম ক্লীপ দিয়ে কর্ডে ঝুলিয়ে দিচ্ছেন মিঃ সরকার। ভেজা ফোটোগুলোর দিকে তাকিয়ে, এখান থেকেও ঢাকা-গেজেট কথাটা পড়া যাচ্ছে। কাস্টোডিয়ানের কাছে এটার কি মূল্য জানি না, কিন্তু আমার চোখে ফোটোগুলি অসম্ভব দামী মনে হতে লাগল। এই 'গেজেট-ফোটোগুলো'-কে একটা এ্যাল্বাম বা ভিসুয়াল ফোল্ডারে সাজিয়ে দিলে বেশ নতুনত্ব হবে!

২২

সেনগুপ্তর, সাইজ করে ছাঁটা কালো দাঁড়ি-গোঁফের আড়ালে, কমনীয় কণ্ঠস্বর আর তীব্র চাহনী, শম্ভুবাবুকে মনে করিয়ে দেয়। শম্ভুবাবুর নাটকে ড্রেস সাপ্লাই করেন, সেনগুপ্ত-পরিবার। শম্ভুবাবুর পাবলিসিটি দিতে পারার সুযোগ পেয়ে উনি ধন্য হন। দোষের মধ্যে আমি বলেছিলাম, 'আবৃত্তির ক্ষেত্রে, প্রতিটি শব্দের প্রতি আলাদা দরদ, একমাত্র শম্ভুবাবু-ই দেন।' টিমের অভিনেতা, অভিনেতৃদের ওপর এই নাট্যকারের যে বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, সেটা সেনগুপ্তর ওপর-ও কেন পড়ল, বুঝলাম না। অথচ, ইনি অভিনয়-ই করেন না! এবং উৎপলবাবুর প্রতি কিঞ্চিত বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন।

২৩

প্রতিটি ঘণ্টা কাজে লাগাতে হচ্ছে। ভবানী-ভবন-এ ডি ভি সি-র সি এম ও কে ভিজিট করে, আলিপুর জজ কোর্টে গেলাম। বাড়ী ভাড়া জমা দিতে হবে। ছাউনীতে অনেকজন এ্যাডভোকেট্‌দের মধ্যে সমরবাবুকে দূর থেকে এক-নজরেই চেনা যায়। র-সিল্কের পাঞ্জাবী আর ধুতি পরে আর কেউ বোধহয় আসেন না। কেসের দিন অবশ্য সেজেই আসেন — কালো কোট-টাই আর সাদা প্যান্টে। সীনিয়র এ্যাড্‌ভোকেট, এখন সব কেস জুনীয়রদের ছেড়ে দিচ্ছেন।

দেখেই হেসে বললেন, 'কি হলো, কেসের কতদূর?'

উত্তর আমি দিলাম না, দিল ভাগ্য। বলল, 'ওরা এ্যাপীল-এ গেছে!' যদিও এটাই আশা করেছিলাম; তবুও মনটা দমে গেল।

সমরবাবুর হাতে পিটিশনের কপিটা ঝুঁকে দেখতে দেখতে মনে হলো, গত দু-দুটো বছরে রেণ্ট-কন্ট্রোলার কোর্টে কম সময় অপচয় হয় নি, এবং টাকাও! মিঃ মল্লিকের সময় তো বাড়ীউলীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেই পারলাম না। শেষে বদলী হয়ে এলেন, রেণ্ট-কন্ট্রোলার মিঃ এস এন চ্যাটার্জী। উকিলমহলে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। এমন সুন্দর ক্লোজিং, ভদ্রলোকের! আমার সীনিয়র উকিল ছিলেন এস. এন. মজুমদার। তিনি তো উচ্ছ্বসিত! তাঁর আর্গুমেন্টে এই জয় হয় আমার। 'ফাইন' হয় বাড়ীউলীর। আশ্চর্য, ওই কেসটার পরে পরেই মিঃ মজুমদার হঠাৎ স্ট্রোকে মারা যান! খবরটা দেন জুনীয়র মিঃ সান্যাল, যিনি মাস্টারমশাই নামেও পরিচিত। মিঃ মজুমদারকে আমার চিরকাল মনে থাকবে।

সমরবাবু, তাঁর এক বয়ঃকনিষ্ঠ উকিল-কে ডেকে বললেন, 'এই যে অতীন, এই কেসটা করে দাও তো।' আমাকে ইন্‌ট্রোডিউস করলেন। অতীন মুখার্জি তাঁর ফর্সা আভিজাত্যপূর্ণ চেহারায় আমায় এক ঝলক্ দেখে নিয়ে দুই-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন।

—'রেন্ট-কন্ট্রোলারের কাছ থেকে জিতে এলেন কি করে ?'

আমার জেনুয়ীন কেস। তাই অবাক হয়ে বললাম, 'কেন ?'

—'না, রেন্ট্‌কন্ট্রোলারস বেঞ্চে তো জানি কেস শুরু হয়, এবং তারপর আবহমানকাল ধরে চলতে থাকে—।' ও'র কথার ধরণে আশপাশের সবাই হেসে ওঠেন। ভদ্রলোকের কথা বলার স্টাইলটা বেশ লাগল।

—'বাড়ীউলী করছে-টা কী ?'

—'জল বন্ধ রাখছে ! কনস্ট্যান্ট একতরফা গালাগালি করে মা আর মেয়েটা মিলে।'

—'একটা মেয়ে আছে ?'

—'হ্যাঁ।'

—'আন-ম্যারেড ?'

—'হ্যাঁ।'

—'বয়েস হয়েছে ?'

—হ্যাঁ !' অবাক হই। এ কেমন ডাক্তার। ঠিক ঠিক সীম্‌টম্‌স বলছেন ? অতীনবাবু উদাস সুরে বললেন 'তবে তো হবেই। যাক্‌গে ভাড়া ঠিকমতো জমা দিচ্ছেন তো ?' এদিক থেকে মুহুরী অমূল্যবাবু জানালেন, তিনি সেটা পাচ্ছেন দশ তারিখের মাথায়। পরের সপ্তাহে সদানন্দ রোডের কাছে ও'র চেম্বারে যেতে বলে অতীনবাবু ফিফথ এ্যাডিশনাল-এর দিকে ছুটলেন।

২৪

আমিও ভাড়ার টাকা জমা দিয়ে, আগের মাসের রসিদ্ নিয়ে, ফের ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পথ ধরলাম।

ঢ়ুকতেই দেখলাম এ. বি. রায় এসেছেন। আমায় দেখেই বললেন, —'এ যে অনেক টাকার কাজ করাচ্ছেন !'

হেসে বলাম, 'কি করবো ? আপনাদের মেশিন কাজ করছে না যে—।'

সেনগুপ্ত স্লিপ লিখে আমার ফাইলনাম্বার, টাকার অঙ্ক বসিয়ে, কাগজটা আমার হাতে দিলেন। —'ওবাড়ীতে জমা করে আসুন।' ছোটলাটের বাড়ী-

টার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকলে, আমার কেমন যেন চেনা, চেনা মনে হয় ! এভাবটা কেন হয়, কিছুতেই বের করতে পারি না। মনে হয় এই বাড়ীর সিঁড়ি বেয়ে ওঠাটা এই প্রথম নয়।

বড় দরজার দারোয়ান আমায় আটকাল না। হলে ঢুকলেই বাঁদিকের কাঁচের কাউণ্টারে অনেককটা দশটাকার নোট গুঁজে দিয়ে ফেরৎ পাঁচিশ পয়সা আর সেনগুপ্তের লেখা স্লিপটার অর্দ্ধাংশ নিয়ে, ফের ফোটোগ্রাফীতে। একটা সুন্দর প্যাকেটে ভরা আছে। সেনগুপ্ত আমার স্লিপটা দেখে চালান-খাতায় লিখে, সীকিউরীটির লোকটিকে পাস করিয়ে, আমায় বাইরে অবধি পৌঁছে দিয়ে গেলেন। এটাই হয়তো সীসটেম !

বেশ একটা কনফিডেন্স নিয়ে বাবার সম্মুখে দাঁড়ালাম। হাতে এক-গাদা ডক্যুমেন্টের প্যাকেট। এর ওপর দাঁড়িয়ে এ্যাফিডাভিট্‌টা করে ফেলা যায় ! বাবা বললেন, 'তবু-ও একবার শচীকান্তর সঙ্গে পরামর্শ করবি না ?'

—'সে তো যাবই, ওতো ডেকে-ইছে।'

এক্সটেনশন পীরিয়ড প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

২৫

ভোরে টেলিফোন-এ এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিলাম। শচীর হৈ চৈ করা উচ্ছ্বসিত বাক্যবাণে আকৃষ্ট হয়ে শচীজায়া সুলগ্না দেবী আবির্ভূতা হলেন। একরাস নীরব হাসিতে অভিষিক্ত করে বললেন, 'আপনার পাত্তা নেই কেন ?'

বললাম, 'ভগবান এমন এক চাকরী জুটিয়ে দিয়েছেন, তার কাজের সময়টাই উদ্ভট। সবাই যখন অফিসে থাকে, তখন আমরা বাড়ীতে। সবাই যখন অফিস-ফিরতি, আমরা তখন দ্বিতীয় দফায় কাজে বের হই ! ফলে সোশ্যাল জীবনটা কি রকম, তার আর স্বাদ পাই না।'

মিলিত হাসির মধ্যেই অনুযোগ শুনতে পাই, 'তৃষিৎ-ঠাকুরপোর সাথে থেকে থেকে, আপনিও কবি হয়ে উঠেছেন কিন্তু !'

শচী 'তৃষিতের' নামটা শুনেই জিজ্ঞেস করল, 'ও-টা কোথায় ? আসেই না তো ! ওর বাবা ক্লেইম সাবমিট করেছেন কিনা জানো ?'

সুলগ্না বৌদি সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'তৃষিৎ ঠাকুরপো আর লেখা পাঠান, না, না ? বেচারী ! কি ভাল যে লেখেন। গল্পগুলো খুব আন্‌কমন্‌ ইনসিডেন্টের ওপর লেখা, পড়েছেন ?'

—'দাঁড়ান। এক, এক করে উত্তর দিই।' হেসে সুলগ্না বৌদিকে নিরস্ত করি।

শচীর দিকে ফিরে বলি, 'তৃষিৎ, আছে বহাল তবিয়তে। বলেছিলাম, ওর বাবাকে একদিন, কাস্টোডিয়ানের কথা! দেখলাম, জানেন ব্যাপারটা।'

—'ক্লেইম করেন নি ?'

—'না।'

—'কেন ?'

— বলছেন, 'যে প্রপার্টী আমার তৈরী নয়, যার মেইন্‌টেনেন্স-এ পর্যন্ত আমার কোন কন্ট্রিবিউশন্‌ নেই, সেটার এগেন্সটে টাকা নেব না।'

—'এঃ হে, এটা ঠিক হল না। ও'র শরিকেরা তো নেবেই।' শচীর ভাবান্তর।

—'হ্যাঁ, সে কথা বলেছিলাম—বললেন, নিক না, আমার তো কিছু অভাব নেই এখানে!' একটু নীরব থেকে সুলগ্না বৌদির দিকে ফিরে বলি, 'তৃষিতের পাঠানো একটা একটা গল্প সিলেক্টেড হয়েছিল, স্বাধীন বাজারে।'

—'সত্যি!' আনন্দে চোখদুটো বেরিয়ে আসে দীঘল পল্লব ডিঙ্গিয়ে!

—'গল্পের প্লট্‌টা বেশ নতুন ধাঁচের·····' বাধা দিয়ে সুলগ্না বৌদি বললেন, 'আপনি পড়েছেন ? বলুন না গল্পটা!' আগ্রহ গড়িয়ে পড়ল কণ্ঠ থেকে।

—'আমি কি আর ওর মত ভাষা-টাসা দিয়ে বলতে পারবো···!' দ্বিধা নিয়ে বলি।

বাজখাঁই কণ্ঠ সহাস্যে জানাল, 'ইউ আর ইক্যুয়্যালী এ বাড্‌ ন্যারেটর, আই নো, বাট কাম আউট—লেট্‌স্‌ হ্যাভ দ্য স্মেল অফ তৃষিৎ।'

অগত্যা শুরু করতেই হয়। আমায় তৃষিৎ যখন পড়ায়, তখন-ই বুঝেছিলাম, লেখাটার কেমন একটা ম্যাগনেটিক্‌ এ্যাট্রাকশন রয়েছে। আরম্ভ করলে শেষ না করে উপায় থাকে না।

২৬

'লোয়ার সার্কুলার রোডের ফুটপাথ-স্কুলের ফার্স্ট-বয়, রতন। জীবিকা নির্বাহ করছে, ফুল বেচে। সংসারে রুগ্না মা, বিধবা বোন আর দু'টো ছোট ভাই। বাবা নিরুদ্দেশ অনেকদিন। রতন, আগে, দাঁড়িয়ে থাকা, চালক-বিহীন মোটরগাড়ীর পার্ট্‌স্‌ খুলে, মল্লিক বাজারে ঝাড়তো! বেশ চলছিল দিন। স্বাধীন ব্যবসা। বাগড়া দিল ফুটপাথ-স্কুলের, পরীর মতন সুন্দর

দিদিমনিটা ! কত করে বুঝিয়ে, তাকে ও পথ থেকে ফিরিয়ে এনে স্কুলে ভর্তি করেছে, এই শুদ্ধ চেহারার মধুমিতাদিদি ! শুধু রতনকে নয়, এমন আরও অনেকেই নতুন জীবনের স্বাদ পাবার লোভে ধরা দিয়েছে সোশ্যাল্ ওয়েল্‌ফেয়া'র এর মধুমিতা সিন্‌হার স্নেহ পরশ-বাহু বন্ধনে।

স্টেট্-ওয়েলফেয়ার থেকে টাকা আনতে গিয়ে আলাপ হয় স্মার্ট, সুন্দর, লম্বা চেহারার সাত্যকির সাথে। নতুন পি. আর. ও। আলাপ থেকে বন্ধুত্ব এবং অবশেষে প্রণয়। মুখ ফুটে কিছু না বললেও, দুজনেই বোঝে দুজনের মনের খবর। মনে একটা দারুণ দ্বিধা মধুমিতাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারে না সাত্যকিকে।

চিঠির আদান প্রদান হয় রতনের মাধ্যমে। চার আনা পারিশ্রমিক। কিশোর রতন ভাবে, দিদিমনি স্কুলের টাকার তাগাদা দেয়। ফুলের বাজার খুব আক্রা, তাই সে এখন নতুন এক গোপন পথে আমদানী করছে ফুল, রাশি রাশি ফুল। সাহেবদের কবরখানার দারোয়ানকে একটা দুটো টাকা ধরিয়ে দিয়ে লাইন করেছে।

কবরের ওপর অনেকেই রজনীগন্ধার ষ্টিক আর সাদাফুলের তোড়া রেখে, মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যায়। ভিজিটররা কবরখানা থেকে বেরিয়ে যেতেই, সবকটা ফুল ঝুড়িতে তুলে ও পাশের দরজা দিয়ে হাওয়া। দলে দুজন সহকারী নিয়েছে রতন। তিনজনের পার্টনারশীপের ব্যবসা। ফুলগুলোতে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে সতেজ করে রাখে। অন্ধকার হয়ে আসতেই চৌরঙ্গীতে ফিরি করতে লেগে যায়, তিনজন। প্রশস্ত জায়গা হচ্ছে জিওলজিক্যাল সর্ভের সামনে থেকে পার্ক স্ট্রীট্ পর্যন্ত। ট্র্যাফিক লাইটে যখন গাড়ীর লাইন, তখন জানালায় জানালায় অফিস-ফেরৎ বিরক্ত, ক্লান্ত মুখগুলোর কাছে উঁকি মেরে মেরে আশ্চর্য রকম বারগেন প্রাইসে বেচে দেয় ফুলের তোড়া আর মালা। গাড়ীতে মহিলা থাকলে তো কথাই নেই ! ফলে প্রফিট্‌টা হয় দারুণ। মায়ের ওষুধটা-পথ্যটা কেনা, সহজ হয় একটু !

মনের ক্ষতটা ভুলতে চেষ্টা করেও পারে না, মধুমিতা। সাত্যকিকে কি ও বলবে অকপটে, বলবে তুমি 'প্রথম' নও ? জীবনে আরেকটি পুরুষ এসেছিল আগে, একবার ! যাকে ঘিরে ঘর বাঁধার স্বপ্ন সে আগেও একবার দেখেছিল ! বলবে, আমায় ভালবাসতে যে শিখিয়েছিল, সে নেই ? কিন্তু রেখে গেছে, অজস্র, অসংখ্য 'চিহ্ন' ? ভেবে ভেবে মাথা ঠিক রাখতে পারে না সে।

সাত্যকিকে পাবার পর থেকে ধীরে ধীরে চিহ্নগুলো বিলুপ্ত করে

চলেছে মধুমিতা। শেষ চিহ্নটা আজও ব্যবহার করে সে। সেটা একটা প্ল্যাস্টিকের বো-ক্লীপ। কটা চুলে, এটা দারুণ ম্যাচ করে। এ ছাড়া, ফ্লাওয়ার ভাস. রাইটিং প্যাড, পেন, সিল্কের রুমাল, এমনি কত কি-ই সে দিয়েছিল। একে একে সব দান করে দিয়েছে মধুমিতা। বন্ধুরা পেয়ে খুশী। আর ও, চোখের আড়াল করে খুশী হতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু মন ? মন-টা তো আর সরানো যায় না ?

একটা বুধবার সন্ধ্যা ঠিক হলো মধুমিতার ফ্ল্যাটে আসবে সাত্যকি। সেদিনই জীবনের ফাইনাল্ ডিসিশন্ হবে এইরকম ইঙ্গিতও থাকল।

কাজ থেকে ফিরেই প্রসাধন সেরে ফেলে, ঘরটা একটু গুছিয়ে রেখে, বেরিয়ে পড়ে, মধুমিতা। মার্কেট থেকে একটা বেশ দামী ফুলের তোড়া কিনে ফেলে। একটা ট্যাক্সি নেয়। সোজা সার্কুলার রোডের সিমেট্রীতে। ঘুরতে ঘুরতে অনেক দিনের চেনা জায়গাটায় বসে। ফেলে আসা জীবনের সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্তগুলো স্মরণে আনতে চেষ্টা করে। তারপর মাথার চুল থেকে প্ল্যাস্টিকের বো-ক্লীপ্‌টা খুলে, ফুলের তোড়ার ডাঁটায় বেশ শক্ত করে পরিয়ে দেয়। কবরে, পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বলে 'আমায় ভুলে যেও' একটু কাঁদে। বলে, তোমার দেয়া শেষ উপহারটা তোমায় ই দিয়ে গেলাম।' আর বসে না। উঠে দাঁড়িয়ে একদম পিছনে না তাকিয়ে একরকম দৌড়ে বেরিয়ে আসে। অপেক্ষারত ট্যাক্সিতে উঠেই বাড়ী ফেরার নির্দেশ দেয় বুকের ভেতরটা অসম্ভব হাল্কা লাগছে। নিশ্চিন্ত হয়ে এবার সাত্যকির প্রশস্ত বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে। যেখানে অন্য কোন একটা অশরীরী মানুষ এসে অযথা বাধা সৃষ্টি করবে না।

ট্যাক্সিতে নয়। আরেকজনও গাড়ী চালিয়ে আসছে। তারও জীবনের একটা মোড় ঘুরে যাবে আজ সন্ধ্যায়। সম্মুখে লাল আলো। ট্র্যাফিক-সীগন্যাল পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে।

ছুটোছুটি করে ফুল বিক্রী করছে কতকগুলি বাচ্চা। তার গাড়ীর কাছে এসেও একজন ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করল। এসব কেনে না সাত্যকি। হঠাৎ কি মনে হতে, আর ফুলের তোড়াটার সুন্দর একটা অভিব্যক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে বারগেন করার সুযোগটা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে, কিনে ফেলল ওটা দশটাকা দিয়ে। 'টু টেল্ ইট উইথ্ ফ্লাওয়ারস।' মনটা খুশীতে ভরে গেল। ম্লান আলোয় চিনতে অসুবিধে হলো না, মাঝে দুটো পাশাপাশি ব্ল্যাক-প্রিন্সকে ঘিরে—অসংখ্য শ্বেতশুভ্র রজনীগন্ধার ঝাঁক।

খুশী আরেকজনও হল। ডাক্তার বলেছিল, এই ওষুধটা যে করেই হোক যোগাড় করতে। আজ রাতের মধ্যেই তার মাকে না দিতে পারলে হয়তো

ব'াচানোই যাবে না। দোকানে খোঁজ নিয়ে জেনেছে দাম দশটাকা। পকেটে দেড়টা টাকা ছিল। তাও সিমেট্রীর দারোয়ানকে দিতে হলো। দশটাকা— দশটাকা ভাবতে ভাবতে, গাড়ীর বাবু দাম জিজ্ঞেস করতে, সে দশটাকাই বলে ফেলেছে। অন্যদিন হলে হয়তো সাড়ে তিন টাকা বলে, নেবে গিয়ে আড়াই টাকায় ছেড়ে দিত। ভাগ্যটা আজ প্রসন্ন। মাকে ব'াচানো যাবেই। গাড়ীর বাবুটিকে অন্ধকারে না চিনলেও কোথায় দেখেছে, সেটা রতন অনেক ভেবেও বের করতে পারল না।

কলিং বেল্ বাজতে, দরজা খুলে এসে দাঁড়াল, মধুমিতা নিজে। পরিচারিকাকে আগেই বিদায় করেছে। সুন্দর মেক্-আপে আরো ঝলমল করছে মধুমিতার অবয়ব। ছু'তে ভয় হয়। সাত্যকি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে হাতের তোড়াটা তুলে দিল মধুমিতার হাতে। সাত্যকির চোখের দিকে একভাবে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে, হাত বাড়িয়ে নিল ফুলটা। একটু আঙুলের ছোঁয়া লাগল। চমকে উঠল মধুমিতা। সাত্যকি ভাবলো ও শিউরে উঠেছে, প্রথম পরশে! কিন্তু মধুমিতার ঝট্ করে মনে হলো, ফ্লাওয়ার ভাস্‌টাতো নেই! গতমাসেই ওটা বিদায় করেছে। কাঁচের একটা গ্লাস নিয়ে ফ্রীজের ওপর রেখে, তার মধ্যে তোড়াটা বসিয়ে দিল। সুন্দর! ক'াধে সত্যকির দৃঢ় হাতটা এসে নামল। আর তক্ষুণি চোখে পড়ল—রজনীগন্ধার একত্রিত ড'াটায় আটকানো তার বহু ব্যবহৃত প্ল্যাস্টিকের বো-ক্লীপ্‌টা !!! আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল মধুমিতা। হতবাক্ সাত্যকী নীচু হয়ে ওর মুখটা দু'হাতে ধরে চোখে চোখ রেখে বলল,

'কি হয়েছে মিতা ?'

—'আমায় ক্ষমা কর—প্লীজ্—একটু-একা থাকতে দাও আমায়।'

—'কেন ? তুমি কি .....?'

—'প্লীজ, সাত্যকি।'

নির্বাক সাত্যকি ভেবে পায় না কি করা উচিত তার। ধীর পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। মাল্টিস্টোরীডের সাততলা থেকে নীচের লোকজনকে কত ছোট দেখা যায়। চেনাই যায় না।

অনেকক্ষণ একা দাঁড়িয়ে থেকেও যখন কেউ এলো না, সাত্যকি, পর্দা সরিয়ে ঘরের মাঝখানে উঁকি দিল। কেউ নেই! একটু অপেক্ষা করে পাশের ঘরে নক্ করল! কেউ নেই! বাথ্‌রুমের দরজা খোলা! কোথায় গেল মধুমিতা! কেন গেল ? কি করা উচিত এখন! সোফায় বসতে গিয়ে চোখে পড়ল, চিঠিটা। সেন্টার টেবিলে চাপা দেয়া। শুধু ক'টি শব্দ। এমন কঠিন কিছু নয়। 'আমায় ক্ষমা কর, আমি পারলাম

না। তুমি যা জেনেছ সেটাই সত্যি। তাকে আমি ভুলতে পারি না।'

এরপর পাগলের মত হেঁটে যাচ্ছে মধুমিতা। রাস্তার গাড়ীঘোড়ার তোয়াক্কা করছে না। কি যেন শুনছে আর এগিয়ে চলেছে।

অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে একটা কণ্ঠ। সেটা প্রথম প্রেমিকের। 'ফিরে এসো……ফিরে এসো……তুমি আমার……তুমি শুধু আমার…… আমার……আমার……'

বলাই বাহুল্য প্রথম প্রেমিক লেখক স্বয়ং। কফিনে শুয়ে শুয়ে শেষ কথাগুলো বলছে সে। আর মধুমিতা হেঁটে হেঁটে এগিয়ে চলেছে, সিমেট্রীর দিকে।'

২৭

এইটুকু বলে থামলাম। 'ব্র্যাভো…' লাফিয়ে উঠল শচী 'দারুণ লিখেছে তৃষিৎ।'

—'কিন্তু ট্রিবিউটটা আমি আপাততঃ রাজু ঠাকুরপোকেই দিচ্ছি। উনি এতো সুন্দর বললেন। কি খাবেন বলুন?' সুলগ্না বৌদি আনন্দে ভরে তুললেন চোখদুটো।

বললাম, 'এক কাপ চা আনুন তো। সেই থেকে বকছি—'

সুলগ্না বৌদি পাশের ঘরে যেতেই শচীকে নিয়ে পড়লাম। 'আমার হাতে আর ক'দিন সময় আছে। এই ডকুমেন্ট্ যোগাড় করতে পেরেছি দেখ।'

ডকুমেন্টগুলো পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ও। 'আরে, এতো মেলা কাগজ পেয়ে গেছ তুমি।' বত্রিশ পাতার অতগুলো ফোটোগ্রাফ্ পাশে সরিয়ে ফেলে বলল, 'এগুলো কোন কাজে আসবে না!' অতগুলো টাকা বাজে খরচা না করলেই হতো!

বললাম, 'একটু ওয়েট্ ক্যারী করবে না কি?'

—'দ্যুৎ। এসবে লাভ নেই—ফরেস্টের শীড্যাল্ কোই?' শচী অবাক হয়ে তাকায় আমার দিকে।

বলি, 'কোথাও পেলাম না—।'

—'কেন; মহারাজার কাছে গেজেট-এ নিশ্চয়ই আছে?'

—'না, নেই। আর যে সব ডকুমেন্ট আছে সে সব মেঘবর্ণ চৌধুরীকে দিয়ে দিয়েছেন। আমায় গিয়ে কালেক্ট করতে হবে।'

—'ও, ওর ছেলে-ই কি ও'র কেসটা রিপ্রেজেন্ট করছেন?'

—'এখন তো তাই দেখছি। প্রথমে তো ও'র কথায় মনে হয়েছিল ও'রা ক্লেইম-ই করেন নি এ্যাট্ অল্।'

শচী একটু ভেবে বলল, 'উনি নিজে রিপ্রেজেন্ট করলে কেস্‌টা অনেক ভাল দাঁড়াত। রাজা, মহারাজারা একটা কথা বলছেন, এর অনেক দাম, এখনো!'

বললাম, 'ও'কে, আমিও এই সাজেশনই দিয়েছিলাম, উনি বললেন, ব্রিটিশরাই আমারে কোন কোর্টে দাঁইড় করায় নাই। —এদেব সামনে যাইতাম না।'

—'ঠিক। এ'দের আত্মসম্মানে লাগবেই।' শচী খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

ধূমায়িত চায়েব ট্রে নিয়ে ঢুকলেন সুলগ্না বৌদি। ট্রে নাবাতে দেখলাম একটা সসারে দুটি বড় বড় পীস্ রুইমাছ ভাজা। তৃষিতের সাথে যেদিনই এসেছি ওই মাছ ভাজা সহযোগে চা পেয়েছি। এটা আমার খুব-ই প্রিয় খাদ্য, বলে ফেলেছিলাম একদিন।

—'কোন্ সংখ্যায় বের হবে গল্পটা?' সুলগ্না বৌদির আগ্রহভবা সুর।

—'কোন সংখ্যাতেই আর বের হলো না শেষ পর্য্যন্ত -।'

—'ও মা! কেন?'

'সাগব গাঙ্গুলী-ই না, কে যেন ওখানকার সিলেক্টর! ডেকেছিল তৃষিৎকে। গল্পটার বিভিন্ন জায়গার ডায়ালগ্‌স্, ডেসক্রীপ্‌শন্‌স্ পাল্টে দেবার জন্য ইন্‌সিস্ট করতে থাকেন ভদ্রলোক। প্রথমটার তৃষিৎ আপত্তি করে নি। যখন দেখল, তার সব গল্পটাই আমূল নতুন একটা গল্প হয়ে গেল! —তখন রেগে গিয়ে বলেছে এটা ছাপাবে না।'

—'বল কি!' এবার শচীকেই প্রশ্নটা করে।

—'আব বল কেন। সাগর গাঙ্গুলী ওকে কবিতা লিখতে সাজেশন্ দিয়েছে! বলেছে ওর হাতটা নাকি কবিতা লেখারই উপযুক্ত, ছোট গল্প নয়!'

—'কেন এমন করল?' সুলগ্না বৌদি জানতে চান।

—'তৃষিৎ বলে এটা নাকি লেখকদের একটা জেলাসী। কেউ কাউকে সুযোগ দেবে না। নতুনকে তো নয়-ই।'

হঠাৎ শচী, মাতৃভাষায় 'আসেন, আসেন,' বলে কাকে ঘরে ঢোকাল। শচী যতখানি কন্ঠস্বর চড়াল, আগন্তুক ততখানি নিম্ন ও প্রাণহীন স্বরে, নাকি সুরে বলল, 'নমস্কার, ক্যামন্ আসেন্— ?'

পরিচয় হলো। নাম ধীরেন্দ্রচন্দ্র ব'াসু। পেশা--আপাততঃ পূব-বাংলা থেকে বিভিন্ন মালিকদের আর-ও-আর, কম্‌পেন্‌সেশন্ রোল, ও চুরি করে ছেঁড়া গেজেটের পৃষ্ঠা আমদানি। এবং বিনিময়ে প্রত্যেকের কাছ থেকেই পুরো যাতায়াত ভাড়া এবং একটাকা স্ট্যাম্প কাগজের আর-ও-আর-এর মূল্য পঁচিশ টাকা হিসাবে গ্রহণ। কম্‌পেন্‌সেশন্ রোল দেড় হাজার টাকা! শুনে অবস্থা খারাপ।

এই ডিস্‌পেপ্‌শিয়ায় ভোগা, সরু-লম্বা বাতাসে আন্দোলিত দেহের অধিকারী-ই আমার বহুল-বর্ণিত বাংলাদেশের ধীরেন, তাতে সন্দেহ নেই!

নতুন ক্লায়েণ্ট পেয়ে লোকটির মুখ দিয়ে সত্যি-সত্যিই লাল গড়াচ্ছে! গলার উঁচুমত পিণ্ডটা দুবার ওঠা-নামা করে, থুথুটা গিলে ফেলল।

শচীকান্তর কথামত স্ট্র্যাণ্ড রোডে মাতুলের অফিসেই, আমার ঠিকানা-ও রাখা হলো। ডকুমেন্টগুলো দেখিয়ে, শচী মাতৃভাষায় জানাল, -'দেখ্‌-তাসেন্ তো, কাগজ সবই আসে, খালি একটা কমপেনসেশন্ রোল, আর এদের স্টেটের ফরেস্টের শীড্যুল্‌গুলা আইন্যা দ্যান্।' ধীরেন নোট-বইয়ে টুকে নিচ্ছে। স্টেটের নাম, তৌজি নম্বর, বাবা দাদার নাম একে একে বলে গেলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি রকম টাকা দিতে হবে শচী ?'

শচী আমার কথাটাই রীলে করল ধীরেনকে। করুণ সুরে ধীরেন কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'সেইডা আর আফ্‌নাগোরে কি কমু? দিয়েন্ যা হয়।'

কথার শেষের টানটা শেষ হতে শচী বলল, 'না, না ঠিক কইরা কন্। সোজাসুজি কথা থাকা ভাল।'

—'কীঃ আর কমু। সব শুইদ্ধা তিনহাজার দিলেই হইব—।'

—'কন্ কী-ী-ী!' আমি না শচী-ই আঁতকে ওঠে। 'ধুর, কী কইতাসেন ? ঠিক কইরা কন। ফরেস্টের তো গেজেট নোটিফিকেশন আনবেন ?'

—'হঃ, হেইডা তো খুঁইজত্যা হইব—।' উনি পাতা ছিঁড়বেন তার কস্ট্!

—'তবুও তার জন্য কত আর দেয়া যায় কন।' শচী আমার হয়ে

২৪

পড়ছে।

—'বিবেচনা কইরা আফনেই কন—আমি আর কি কই?' প্রাণহীন সুরের আল্টিমেটাম!

—'একটা কাজ করেন তাহলে।' শচী প্যাঁচে ফেলছে, 'কম্পেন্সেশন এর বোল আমার দরকার নাই, আপনি ইনফরমেশন স্লিপ্ আনবেন আমাকে যেমন দিয়েছেন। আর গেজেটের পাতা ক'টা।'

হাপুস্ নয়নে কেঁদে ফেলে, দুমড়ানো লোকটা বলল, 'রুল আনলেই তো ভাল হইত, অতবড় এস্টেটের ব্যাপারখান— !'

শচী ফার্ম এ্যাটিচুড্ নিয়ে বলল, 'না: ; দরকার নাই, ইনফরমেশন স্লিপের একশ টাকা, আর ওই গেজেটের জন্য পঞ্চাশ টাকা পাইবেন।'

লোকটা এইবার এক গ্লাস জল চাইল। জল খেয়ে, গম্ভীর হয়ে প্লেটের মিষ্টিগুলো খেতে লাগল গপ্‌গপ্ করে। আমি যতক্ষণ ছিলাম আর আমার দিকে ফিরেই তাকাল না, একবারও। সোমেশ্বর স্টেটের কাগজটা অমন ফসকে যাবে, এটা হয়তো আশাই করেন নি মিঃ বাসু। তৃষিৎকে নিয়ে শীগ্‌গির ই আবার আসছি বলে, উঠে পড়লাম।

২৯

'এই যে সাহেব, একটা চিঠি আইসে।' তাকিয়ে দেখি অমলবাবু। কেলাভিলার লক্ষ্মী চাটুয্যের ভাড়াটে অমল ভাদুড়ী, বয়সে বড় হলেও আমাদের গোলপার্কের আড্ডার বন্ধু। আড্ডায় উনি একাই মদ স্পর্শ করেন না। আর সবাই ই মদ ছুঁয়ে থাকেন। আমার মত, বিশ্ববিদ্যালয় না আমি যে দু একটা টিউশনী ধরণের সার্ভিস দিয়ে থাকি, তার অন্যতম ছাত্র ইনি পূর্ববঙ্গের কোথায় জমিদারী ছিল দেখিনি। এখন অবস্থা, কোলাভিলার একতলায় গেলে বোঝা যাবে। গ্যারেজের ধোপাখানায় পার্টিশন। তার একটি ফোকরে স্বামী-স্ত্রীর বাস। এক সময়ে পুরোটাই দখলে ছিল। অমায়িক লক্ষ্মীবাবু ভাড়া ছাড়াই ওঁকে অর্দ্ধেকটায় থাকতে দিয়েছেন। অবশ্য ধোপার কাছ থেকে যা সেলামী নিয়েছেন তাতে দু-কামরার ফ্ল্যাট বানানো যায়। চাটুয্যে হলেও, শাদী করেছেন, ও-বাংলার নামী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। মনটা নরম বোধহয় সেই কারণেই। অমলবাবুরা বারেন্দ্র। তৃষিৎদের জমিদারীর কাছেই এঁদের সম্পত্তি ছিল। বোধহয়, অমলবাবুরা, তৃষিৎদের আণ্ডারে তালুক।

উনি তিনভাইয়ের ক্লেইম করেছিলেন, সাকুল্যে আটানব্বুই হাজার

টাকার। এ্যাফিডাভিট্ করার সময়, সেটা নিয়মমাফিক সাজিয়ে, নিয়ে এলাম, চার লাখে! ও'র তো খু-ব আপত্তি! ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। জেলে যাবার ভয়ে তটস্থ।

-- 'বাইন্দা ফেলব না তো?'

বলেছিলাম, 'আপনার তো কোন ডক্যুমেন্ট ই নেই। আছে তিন ভাইয়ের নামে তিনটে চিঠি। ঘাবড়াবার কি আছে। বাড়ী আর একশ' দশ বিঘা জমি। আপনি আপনার দাম ধরেছেন ওরা কেটে নামাক না। কম দাম ধরলে আর বাড়াবার উপায় থাকে না। একটু বেশী করে ধরলে ওদের কাটতে সুবিধেই হবে, সেটাও তো আপনার দেখা উচিত।'

হেসে ফেলে উনি বলেছিলেন, 'তুমি যদি উইট্‌নেস হও তবেই—।' ঝোকের মাথায়, তাই রাজি হয়েছিলাম।

এখন কাস্টোডিয়ানের চিঠি এসেছে! জানতে চায়, প্রথমে তিনভাইয়ের সই ছিল, এখন নেই কেন?

দ্বিতীয় ভাই, বিমল, বাগড়া দিচ্ছেন। পাছে, দাদা টাকাটা মেরে দ্যান্। খবরটা এনেছে ছোটভাই কমল। এসব কথায়, 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-- স্বয়ং আমি,— একদম ভয় খাই না।

বললাম ঠিক আছে পরিষ্কার করে লিখে দিন, ভাইরা আপনার সাথে ক্লেইম করেন নি। আপনি যা এ্যাফিড্যাভিট্ করেছেন, সেটার সবটাই আপনার একার।'

— আরে কও কি?' নার্ভাস লোকটি আরও সাদা হলেন।

— আমি যা বলছি তাই করুন।' গম্ভীর হয়ে কথাটা বলি। 'হ্যাঁ শরিকী যখন শুরু করেছে, আপনি-ই বা ওদের দেখবেন কেন?'

অমলবাবু অত্যন্ত কিন্তু কিন্তু হয়ে বললেন, 'আমার জানাশোনা একজন সাবজজ আসে, তারে জিজ্ঞাস্ কইরা লই, কি কও?'

একটু রেগেই বলি, 'সে আপনি যার সঙ্গে খুশী, তার সঙ্গে পরামর্শ করুনগে। আমার কথামত চিঠি না লিখলে, আমি উইটনেস-উইথ্‌ড্র করবো কিন্তু!'

—'আরে, আরে রাগ করো ক্যান? তুমি ড্রাফ্‌টা কইরা দাও—।' আগের দু-তিনটি চিঠির মত, এটাও আমিই ড্রাফ্‌ট করি।

যাতে অমলবাবুর দিক থেকে কোন শরিকী মনোভাব প্রকাশ না পায়, সেদিকটা লক্ষ্য রেখে আরও একটা কথা জুড়ে দিলাম, '...আমার ভাইয়েরা প্রত্যেকে একই রকম সম্পত্তির মালিক। তারা যদি তোমার কাছে ক্লেইম করে, তো তাদেরটাও দয়া করে কন্সিডার কোরো।'

—'এইটা আর লিখ্‌লা ক্যান্‌…আমার কুন্‌ ঠ্যাকা ?'

—'ছিঃ ! আপনি শরিকী করবেন কেন ? এর দরকার আছে। কাল সন্ধ্যেয় টাইপ করে আনবেন। আমায় দেখিয়ে পোস্ট করবেন কিন্তু।' যেহেতু কেসটা আমার গাইডেন্সে হচ্ছে। এর প্রতিটি স্টেপ্‌ কন্ট্রোলে রাখছি।

আড্ডা থেকে বেশ রাতে বাড়ী ফিরলাম। বাবা, মা-র খাওয়া হয়ে গেছে। খেয়ে নিয়ে একটু গল্প করে, একটু ঘটনাগুলোর সারাংশ চাখ্‌তে দিয়ে—এক ঘুম !

৫০

দীননাথবাবুর সাথে প্রতি সপ্তাহে একবার সীটিং-এ বসতে হয়। কাজ থাকুক আর না থাকুক, উনি এটা চান। এ সপ্তাহে যেদিনই গেছি সেদিনই শুনেছি মিটিং এ গেছেন। বোর্ড অফ্‌ ডিরেক্টরের জরুরী মিটিং-গুলো সাধারণতঃ হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশানাল্‌-এর কোন ব্যাঙ্কোয়েট্‌-এ হয়ে থাকে।

এন্‌ পদ্‌দীপ্‌ বা শত্‌পথী, কেউই মিটিং সম্পর্কে কোন আলোকপাত করতে পারল না।

বসে বসে গুলতানী হচ্ছে, সেল্‌স্‌-রুমে বসে। রীপ্রেজেন্টেটিভ্‌-রা চলে গেলে ঘণ্টাখানেক আড্ডা চলে আমাদের চারমূর্তির। বেয়ারার হাতে দূরে থেকে একটা সরু লম্বা কাগজের ফালি দেখেই বুঝলাম দীননাথবাবুর নোট এসেছে।

—'অল সুপারভাইজার্‌স্‌ শ্যাড্‌ মীট্‌ মী দিস্‌ ইভ্‌নীং—ডি জি.'

ডিরেক্টর দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় একটু আর্মির ডিসিপ্লিন্‌ পছন্দ করেন। আর পছন্দ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচটা নোট পাঠাতে।

'ইভ্‌নিং' ততক্ষণে হয়েই গিস্‌লো। যাবার আগে সেল্‌স্‌-ম্যানেজারকে জানিয়ে গেলাম 'ও বাড়ী যাচ্ছি।'

উনি একটু মুচ্‌কি হেসে বললেন, 'নোট্‌ ?'

ঘরের আবহাওয়াটা মোটেই লঘু নয়। প্রথম সারিতে হাঁড়িমুখ করে বসে, মিঃ ঘোষ, মিঃ নস্কর। পাশে একমাত্র মহিলা ডিরেক্টর, মিসেস্‌ গৌরী রয়। পেছনের সারির এক কোণে, একমনে সিগারেট-এর খালি প্যাকেট ছিঁড়ছেন ডক্টর প্রেমনাথ পালধী। এঁর পাশেই বসে পড়লাম লাইন ধরে। উনি যখন কিছু চিন্তা করেন, তখন একমনে কাগজ ছেঁড়েন।

কোম্পানীর প্রথম সারির ডিরেক্টর, মেডিক্যাল রীপ্রেজেনটেটিভদের চীফ্ ট্রেনার্ এবং অফিসের এ্যানুয়াল্ যাত্রা কম্পিটিশনে কেষ্ট ঠাকুর সাজেন। গানের গলা দারুণ!

দীননাথবাবুর ভরাট গম্ভীর গলা শোনা গেল। উনি মূল বক্তব্যে পেঁছুনোর আগে একটু ভূমিকা করে নিয়ে থাকেন।

—'কমার্শিয়াল্ হাউজ্ হলেও, আমাদের একটা সোশ্যাল ডিউটি রয়েছে। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের নাম ঘরে ঘরে পেঁছে দিতে চাই জনসেবার মাধ্যমে। জনসেবা এর আগেও আমরা করেছি। কিন্তু এবারের আইডিয়া আরও সুন্দর ; আরও সুদূর-প্রসারী। সমাজের প্রতিটি কোণ আমরা ছুঁয়ে ফেলবো! ডাক্তাররা তো আছেন-ই, এবার সান্ত্বনা ফার্মাসিউটিক্যাল্সের নাম, সমাজের প্রতিটি স্তরে পেঁছে দেব। তোমরা হয়তো জান, আজ প্রায় ছয়দিন ধরে আমরা, ডিরেক্টররা, মীটিং করে একটা দারুণ আইডিয়ায় পেঁছেছি। অবশ্য, ক্রেডিট্ গোজ্ মোস্ট্লি টু, মিসেস্ গৌরী রয়। ওঁর চিন্তাধারাটা আমাদের সম্মুখে তুলে ধরতে, আমরা একটা আলোক-বিন্দু দেখতে পেলাম। সেটাকেই অনেক চেষ্টায় কাট-ছাঁট করে একটা সুন্দর প্রাঞ্জল অবস্থায় নিতে পেরেছি।' একটু ঢোক্ গিলে টেবিল থেকে একটা লম্বা কাগজে নীল পেন্সিল দিয়ে একটা ড্রয়িং উঁচু করে দেখালেন। 'এটাই আমাদের ব্যানার। হলদে সিল্কের কাপড়ের ওপর নীল রং-এর হরফে লেখা থাকবে। দূর থেকে কার্-পাপ্ল্-উইল্ বী-এব্ল্-টু-সী। সমস্ত কলকাতার মোড়ে মোড়ে সাইট্ সিলেক্শন্ করতে হবে। এমন হাইটে থাকবে যেন প্রাইভেট গাড়ীর লোকের চোখে পড়ে। আমরা অবশ্য প্রথমে এই শ্রেণীর লোকেদের চোখেই এটা ফেলতে চাইছি। পরে, আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যাবে। তোমাদের ওপর ভার দিচ্ছি ওই সাইট্-সিলেকশনের। আমি একটা লিস্ট্ করেছি ইম্পর্টেন্ট্ প্লেসগুলোর।' টেবিলের দিকে তাকিয়ে পড়ে যেতে লাগলেন।

—'যেমন, শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়, সবকটা হাসপাতাল, এস্প্লানেড, বিবিডি বাগ, পার্কস্ট্রীট, এল্গিন্, হাজরা, রাসবিহারী মোড়, রবীন্দ্র সরোবর-এর সম্মুখে, রবীন্দ্র সদনের সম্মুখে, দেশপ্রিয় পার্ক, গড়িয়াহাট রোড জংশন, গোলপার্ক, ঢাকুরীয়া ব্রীজ, হাওড়া ব্রীজ এপ্রোচ।'

ডাঃ প্রেমনাথ পালধী, কাগজ ছেঁড়া থামিয়ে বললেন, 'নর্থে কোন লোক থাকে না? সাউথে এতগুলো কেন?'

সবাই হেসে উঠলেন।

মিঃ গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, 'সাউথেই মানিড্-পিপ্ল-এর বাস্। নর্থ

এককালে ছিল।'

বস্তুতঃ মিঃ ঘোষ আর প্রেমনাথবাবু ছাড়া আর সবাই সাউথের বাসিন্দা।

দীননাথবাবু বললেন, 'তোমরা কালকে বেরিয়ে পড়। যে বাড়ীর মাথায় লাগাবে, তার মালিকের নাম-ঠিকানা লিখে নেবে। এই লিস্টটা নিয়ে নাও। কাল রীপোর্ট করবে।'

এম্ পর্‌দীপ্ বলল 'একদিনে কী হবে স্যার্ ?'

ডাঃ প্রেমনাথ ফস্ করে বলে উঠলেন, 'আরে, ইট ইজ এ হাফ-ডে-জ ওয়ার্ক ম্যান্ !' ডেইলী এ্যালাউন্সের টাকাটা ফোকটে না যায় !

আর কেউ কিছু বললাম না। এ'রা গাড়ী নিয়ে ঘোরেন। বাসে-ট্রামে মিনিবাসে কলকাতাটা যেতে কত সময় লাগে এ'দের ধারণাই নেই।

৩১

হাফ-ডে নয়। ট্যু এও হাফ-ডেতে কাজটা কমপ্লিট হলো। সময়টা মন্দ কাটে নি। চারজনে মিলে এক-একটা স্পটে দাঁড়িয়ে চারদিকে এমন-ভাবে তাকিয়ে দেখেছি, অনেকেই মনে করেছে সি এম. ডি. এ-র লোক ! বাড়ী ধ্বসিয়ে দিয়ে, রাস্তা বের করবে। এক-আধজন বৃদ্ধ বাড়ীওয়ালার আতঙ্কিত দৃষ্টি-ও চোখে পড়েছে।

ঠিকানা নিতে এক-একটা বাড়ীর চারতলায় উঠতে হয়েছে। সোশ্যাল্ ওয়েলফেয়ারের বলেই এবং ব্যাপারটা পার্মানেন্ট কোন হোর্ডিং নয়, মাত্র পনেরদিনের ব্যানার—ভেবেই, কেউ আপত্তি করেন নি। মৌখিক কথার পরেও একটা অফিশিয়াল চিঠি অবশ্যই আসবে।

বাইরে লাঞ্চ সেরেছি। রোজকার কাজের মত নয় বলেই, মন্দ লাগেনি।

নাম-ঠিকানার লিস্টটা ডি জি কে ধরিয়ে দিতেই উনি খু-ব সীরিয়াসলী পড়ে বুঝতে লাগলেন। কোন বাড়ীর ডাইনে আর কোন রাস্তার বাঁয়ে।

বললেন, 'ঠিক আছে। এই লিস্ট নিয়ে, ডাঃ পালধী আর মিঃ ঘোষ বের হবেন কাল থেকে। ইউ ক্যান গো।'

ব্যানারে কি লেখা আছে জিজ্ঞেস করতে উনি লাফিয়ে উঠলেন, 'তোমরা দেখনি ? হিয়ার ইট্ ইজ্, হিয়ার ইট্ ইজ্…।' বলতে বলতে একটা হলদে ফাইল খুলতে শুরু করলেন।

আগের কাগজটার জায়গায়, আর্টিষ্টের আঁকা অনেক রকমের ড্রয়িং দেখলাম। তার থেকে দুটো তুলে নিয়ে, এগিয়ে ধরলেন টেবিলের ওপর।

একটা ইংরাজী অন্যটি বাংলায়।

প্রথমটির বয়ান 'আনম্যারেড মাদার! ডোন্ট্ বী ওরীড্!
ডোনেট্ ইয়োর ইল্লেজিটিমেট, চাইল্ড্
ট্যু
সান্ত্বনা-সিস্টারস্ বাস্কেট্!!

তলায় ছোট করে লেখা: (বাই কর্টসী: সান্ত্বনা ফার্মাসীউটিক্যাল্স্।)

দীননাথবাবুর কথা কানে যাচ্ছে 'দীজ্ উইল্ হ্যাভ্ এ গুড্ ইম্প্যাক্ট অন সোসাইটী।'

দ্বিতীয়টির বয়ান অনেকটা একই: 'আপনি কি অবিবাহিত?
এবং মা হতে চলেছেন?
চিন্তিত হবেন না,
'সান্ত্বনা-সিস্টার্'
আপনার অবাঞ্ছিত সন্তানের একটি
ঘর ঠিক করে রেখেছেন।

তলায়: (সান্ত্বনার সৌজন্যে)

—'বুঝতে পারছ চৌধুরী! এরকম বলিষ্ঠ প্রচার করে আর কেউ এগিয়ে আসতে পারেনি!' দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলে চলেছেন, 'একজন সিস্টার-এর সাথে কন্ট্যাক্ট করেছি!' উনি কথা দিয়েছেন, আমাদের সোর্সে পাওয়া বাচ্চাগুলোর এক্সপোর্ট, করে, যে ফরেন-মানি পাবেন তার একটা অংশ দিয়ে, উনি আমাদের র মেটেরীয়াল্ ইম্পোর্ট্ করতে সাহায্য করবেন।'

দীননাথবাবুর ফোরসী করার ক্ষমতায় আমি আরও শ্রদ্ধায় নুইয়ে পড়ি!

বাইরে বের হয়ে কেউ কোন কথাই বললাম না, এ সম্বন্ধে। যে যার মত বাড়ী চলে গেলাম।

পরের দিনই চিঠিগুলো টাইপ্ হয়ে, বিভিন্ন সাইটের বাড়ীওয়ালাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। হলদে সিল্কের কাপড়গুলো অফিসে ডেলিভারী হতেই, সাজসাজ রব পড়ে গেল। সবাইকার চোখে টেন্শন্--কি হয়, কি হয়—মুখে কুলুপ্।

৩২

প্রথম মুখ খুলল মেডিক্যাল্ রীপ্রেজেন্টেটিভ্রা। স্বাভাবিক ভাবেই, তারাই প্রথম আক্রান্ত হলো ফিল্ডে। ডাক্তারের কাছে; ও অন্য কোম্পানীর সহকর্মীদের কাছে। তারা অফিসে এসে তো মারে আর কি!

—'আপনারা ভেবেছেনটা কি ? যা করবেন তাই মেনে নেব ?' 'এটা একটা এ্যাড্‌ভার্টাইজমেন্ট পলীসী ?' সবচাইতে সোচ্চার, সি.পি.এম. বিশ্বাসী প্রলয় বোস,—বৈষ্ণবঘাটার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গার করে গেল।

শুধু যাদবপুরের দিলীপ চ্যাটার্জী করুণ সুরে বলল, 'কতগুলো টাকা খরচা করল বল্‌ ! এটা আমাদের দিয়ে দিলে কত সেল্‌ পেত কোম্পানী ?' বেচারী ; স্ত্রী-র গয়না বেচে, বাড়ী তুল্‌ছে ! টাকাটা পেলে সত্যি-ই ওর উপকার হতো।

৩১

বেংগল টিউবারকিউলোসীস্‌ এ্যাসোসিয়েশনের অনুকূল দাশ-এর সঙ্গে পথে দেখা হতেই উনি হাত জোড় করে প্রায় আভূমি নত হয়ে একটা নমস্কার করলেন।

—'কী হলো ?'

—'আপনারা র‍্যাকর্ড করসেন্‌!' গম্ভীর হয়ে আরেকবার নমস্কার ঠুকলেন। ঢাকার লোকেরা একটু রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে থাকেন।

—'রেকর্ড্‌ !'

'হঃ। আপনারা আস্তাকুঁড়ের প্রেসিডেন্ট হইসেন্‌ !' লাইনটা ধরে ফেলে হেসে ফেললাম, 'ভাল কাজ তো ?'

—'হঃ। হেই কথা আর কইতে—মশয় একটা কথা কই !'

—'বলুন।' ভদ্রলোকের কাটা ঠোঁটকে আমরা একটু ভয় করেই চলে থাকি !' বললেন, 'ব্রেইন্‌টা কার ?'

—'কার আবার ? বোর্ড্‌ অব্‌ ডিরেক্টরস্‌-এর ?'

—'উঁহু', মাইয়া ছেইলার গন্ধ পাই--।'

মনে হলো, মিসেস্‌ রয়-ই এই আইডিয়াটা দিয়েছেন। বললাম, 'কেন বলুন তো ?'

—'আগে ঠিক কিনা কন ?'

—'হ্যাঁ। একজন মহিলা ডিরেক্টর-ই আইডিয়াটা—'

—আরে, হইতেই হইবো—কইলাম না ! আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে চলেছেন, দাশমশাই, 'এইখানে সেইখানে যাই তো, নানান্‌ জায়গায় মুখ ছুয়াই ! একটু ইদিক্‌-উদিক্‌ হইলেই, বুঝতাম প্যারি। গন্ধ লুকাইব ক্যামতে ?'

কথা আর বাড়তে না দিয়ে ওঁকে কাটাই। যেতে যেতে পেছন ফিরে

বললেন, 'খুইংজা দ্যাখেন গিয়া, হ্যা কুন্ গুলমালের মধ্যে পরসে কিনা।' অনুকূলবাবু ভিড়ে মিশে যান।

চিন্তিত হয়ে পড়ি। চেত্‌লার নীহারেন্দু ঘোষ এই কথাটাই হিণ্টস্ দিয়েছিল।

—'ডিরেক্টররা যে সোসাইটীতে মেশেন, যে যে ক্লাবে যান, সেখানে স্বল্প পরিচিত 'সান্ত্বনা'-র নাম কেউ শোনেই নি।' 'এ'রা নিজেদের পরিচিত করতে চাইছেন।' বলেছিল, 'মিসেস গৌরী রায়ের কন্যাটি ঝপ্ করে কেমন বড় হয়ে গেল দেখলেন?' নীহার কি বলতে চায় বুঝিনি। তাকিয়েছিলাম, ও বলল, 'ওই ক্লাবগুলোতে মায়ের সঙ্গে ও রেগুলার যায়। বুঝলেন না? ওখানে উঠতি মেয়েরা সহজেই কারুর নজরে পড়ে যাবেই। হাত পড়ে কারুর, নইলে বাবা ওই চেহারা হয়!' রোমাণ্টিক চোখের ভঙ্গী করে নীহার নিজের কাজে মন দিয়েছিল। কারণ অফিসারের ক্যাডারে বসে, এসব কথায় পার্টিসিপেট আমি করিনি। গম্ভীর হয়ে গিসলাম।

পনের দিন নয়, তিনদিনের দিন ই চিঠি আসতে লাগল। 'খুলে না-ও!' 'ব'াচাও!' গোলপার্ক থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত যত বাড়ীওয়ালারা, চিঠিতে লিখতে লাগল, 'পাড়ার ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ছে, ব'াচান!' 'আপনাদের ডাস্টবিনের ব্যানার নাবান'...ইত্যাদি।

ডাইরেক্টর্স মীটিং বসল ফের। না, এবার অফিস ঘরেই। পনের মিনিটেই রীজোলিউশন পাস হলো।

—'এ্যাডভার্টাইজমেন্ট কিন্তু দারুণ হয়েছে—' ভট্ট ভুঁড়ির ওপর প্যাণ্ট আঁটতে আঁটতে বলল। 'ডি জি. চেয়েছিল ঘরে ঘরে সান্ত্বনার নাম পৌঁছে দিতে, সেটা পে'াছেছে।' আমরা চুপ করে শুনছি।

'আনন্দবাজার' আজকের কোর্ট নিউজে ফলাও করে লিখেছে পাবলিক প্রসিকিউটরের বিবরণী। একটি ভেষজ সংস্থার অবিমৃষ্যকারীতার, অশ্লীলতার ইতিহাস। এইবার আমাদের কোম্পানীর নাম একডাকে সবাই চিনে ফেলবে।

৩৪

মেঘবর্ণ, ব্যস্ত মানুষ। আজ মস্কো, কাল চীনে যাচ্ছেন। ফিরে এসেই দিল্লী! ইন্দিরার সাথে ডিনার খান। তাঁর মত লোকের নাগাল পাওয়া ভার। ডক্যুমেণ্টের আশায় দিনের পর দিন টেলিফোনে যোগাযোগ করতে গিয়ে, বিফল হয়েছি।

২৫

যুবরাণী তমসা-বৌদির সাথে ফোনে কথা হয়। তিনি আমাকে চেনেন কম। তাই, কারণটা জিজ্ঞেস করলেও ইচ্ছে করেই বলি না।

মেঘ না চাইতেই জল। ভাল করে বলতে গেলে, চাল না চাইতেই তেল (সরষের)! অফিস থেকে রাত আটটা নাগাদ বাড়ী ফিরছি। দূরে থেকেই লম্বা ধুতি পাঞ্জাবী পরা দেহটা, চেনা লাগছে। কাছে এসে দেখলাম মোড়ের পানের দোকানে বাবার নাম বলছেন, স্বয়ং—দাদা! আমি ডাকতেই চমকে ফিরে বললেন 'এই তো পেয়ে গেছি।'

পানের দোকানের কাছে গুলতানীরত বয়স্ক লোকের একজন বললেন, 'ইনি আমাদের নেক্সট ডোর নেইবার। এর বাবাকে আমরা চৌধুরী সাহেব বলি তো, তাই বুঝতে পারিনি।' দাদা, আমার বাবার পুরো নাম বলায় অনেকক্ষণ ঘুরতে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বাড়ীর ঠিকানাটা ভুলেছেন।

দাদা আমাদের এই বাড়ীতে প্রথম পদার্পণ করলেন। সবাই অবাক!

উনি একটু ভণিতা করে নিয়ে পরে বললেন, 'আমার কাছে সব ডকুমেণ্ট আছে। বাবা বিশেষ করে বলেছেন, তোমাকে দিতে। তুমি একদিন নেক্সট উইকে এসো।'

—'কবে যাব?' আমার শিয়রে সংক্রান্তি।

কপি করতে দিয়েছি—'

-'কোথায় দিলেন কপি করতে?'

একটু ইতস্তত: করে বললেন, 'ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে আমার পরিচিত আছে। ওখান থেকেই আমার ডিপার্টমেন্টের কাজ হিসেবে ওগুলো করাচ্ছি। কত আর পাওয়া যাবে! ভাগে হাজার পঁচিশেক টাকা আসবে আর কি।'

পরিচিতি ছাড়াও যে ওটা সম্ভব, তা নিয়ে কোন কথা বললাম না। বোঝানের চেষ্টা বৃথা. যে পঁচিশ হাজারটা ইচ্ছে করলে লাখেও তোলা যায়। বুঝতে পারছি না ইনি কেন এলেন! উদ্দেশ্য ছাড়া ইনি কোন কাজ করেন না।

লক্ষ্মীছেলের মত মিষ্টিগুলো খেয়ে নিয়ে, চায়ের কাপটা হাতে তুলে, শেষ পর্যন্ত আসল কথায় এলেন, 'তোমাদের ক্লেইমটা দেখাও আমি টুকে নিই। বাবা বললেন, তোমারটা নাকি ঠিক হয়েছে—তুমি নাকি দারুণ খাটছো, পাও পাও, তোমরা টাকা পাও। এক রকম ক্লেইম্ সাবমিট করলে, দু'জন দু'জনেরটা কোরবোরেট করবে—সেটাই দরকার।'

বললাম 'এ্যাফিড্যাভিট্ তো এখনও করিনি! ওটা সাজিয়ে আপনাকে একটা কপি দিয়ে দেব'খন!'

ও'র মুখ দেখেই বুঝলাম কথাটা উনি একদম বিশ্বাস করলেন না। আর আমাদের অবস্থাটা যে ও'দের তুলনায় কত খারাপ সেটা মুখেই বললেন। আমাদের পাওয়াটাই যেন আসল ব্যাপার। ও'র দরকার নেই।

বললেন, 'প্রথমে তো একটা ক্লেইম ফাইল করেছিলে?'

বললাম, 'আমি না, ওটা বাবা করেছিলেন। তাতে অনেক ভুল ছিল। ওরকম হবে না সাজানোটা।'

দাদা বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'সেটার কপিটাই দাও না।'

—'বাবা তো সেটার কোন কপি-ই রাখেন নি! বাবা পাশে বসে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ, কপি নাই, তবে মনে আসে।'

চট করে বললাম, 'না, ওটা দিয়ে কোন লাভ নেই।'

বুঝলাম একথাটাও উনি বিশ্বাস করলেন না।

—'তোমাদের কিছু ডক্যুমেণ্ট নিশ্চয়-ই নিয়ে এসেছ পাকিস্তান থেকে?' বাবার দিকে তাকিয়ে কথাটা শেষ করলেন।

উত্তরটা আমি-ই দিলাম, 'বাবার নামে তিনটে চিঠি আছে। পুরো এস্টেটের কত খাস্‌-ল্যাণ্ড ছিল জানি না, তবে ছিল যে সেটা প্রমাণ করা যাবে।'

—'একারেজ নেই ওতে?'

—'না। জ্যাঠামশাইকে দেখিয়েছিলাম। উনি চিঠি ক'টার কপি লাগবে বলেছেন।'

—'দি-ও। আমি উঠি তাহলে! বাবা বলছিলেন তোমার খুব ইন্টারেস্ট আছে দেশের জন্য। বলছিলেন ও'র বইটা নাকি তুমি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছ? পাও, তোমাদের টাকা পাওটা দরকার।' আবার চোখে আঙুল দিয়ে মহারাজকুমার জানিয়ে দিলেন আমরা কত গরীব! উনি উঠলেন। পরের সোমবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ টালিভোলী কোর্টে যেতে বললেন। প'াচতলায়।

৩৫

একটা সপ্তাহ হুট করে কেটে গেল। কটা দিন দারুণ একটা উত্তেজনা প্রবাহের মধ্যে কেটেছে। জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, সমস্ত কাগজ সাজানো আছে। তাহলে ফরেস্টের শীডিউলটা হয়তো পাওয়া যাবে. ধীরেনকে বারণ করে দিতে হবে। শুধু ইনফরমেশন স্লিপ পেলেই চলবে। এর মাঝে মামার অফিসে ধীরেনের সাথে আরেকবার সাক্ষাৎকার হয়েছে।

স্ট্র্যাণ্ড রোডের অফিস-ঘরে ঢুকতেই শুনলাম, মাতুলের তর্জন-গর্জনের সাথে, ইঁদুরের চিঁচিঁ পাল্লা দিয়ে যাচ্ছে। চেনা চেনা স্বরটির অধিকারীটি কে দেখতে গিয়ে মুখ বাড়াই। 'আয়।' মামা ডাকলেন।

'তোর সঙ্গে তো আলাপ হয়েছে শুনলাম।'

মিঃ যাসু আমার দিকে তাকিয়ে খুশির হাসি হেসে বললেন,—'আফনে নাকি ওষুধের কোম্পানীর রিপ্রেশেন্টিভ ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে স্বীকৃতি জানালাম।

যাসু বললেন, 'আমারে টনিক দ্যান না, কিসু।' শচী-যে টাকার অঙ্কটা কমিয়ে দিয়েছে, সেটা ইনি অন্যভাবে পুষিয়ে নিতে চান!

বললাম 'কবে যাচ্ছেন ?'

--কালল্কা - ।'

আজ তো ব্যাগে নেই। কাল অফিস যাবার পথে রেখে যাব'খন।'

--'ঠিক আসে, আপনার কাগজের জন্য চিন্তা নাই! ব্যবস্থা একটা হইবই।' অপরিষ্কার দাঁত দেখিয়ে হাসতে থাকেন। খুশীর হাসি!

মামার দিকে তাকিয়ে বললেন, বিশ্বাস মশয়, অখন যাই ?'

মামা হাসিতে উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়ই, হ্যাঁ, হ্যাঁ যান। অনেকদূর যেতে হবে।' তবুও ওঠে না লোকটা!

'আইজ্ঞ কিসু দিবেন।'

মামা মুখ-বিকৃত হাসি হেসে বললেন, আবার সেই কথা! আপনার বিল মত টাকা আমি কিছুতেই দেব না। সবাইকেই-ঢাকা রংপুর যাতায়াত চার্জ করবেন, এভাবে কাজ হয় না। সবাইকার কাছ থেকে টাকাটা ভাগ করে তুলে নিন। আপনার যা খরচা হয়েছে তা নিশ্চয়ই নেবেন।'

'তা লে আর আমার খাইট্যা লাভ কি কন' নীরস কণ্ঠ।

'কেন? ওদিকে যে আর ও আর'-প্রতি কুড়ি টাকা করে নিচ্ছেন। আপনার খরচা তো সবকুলো একটাকার বেশী না।' লম্বা স্লিপটা পাথর চাপা দিয়ে রেখে বললেন, 'হিসাবটা আমি আর একবার চেক্ করবো, রেখে যান। কাল তো আসছেন-ই,—আপনাকে ঠকাবো না। আপনিও কিছু পান, কাজটাও হয়—।'

--'কিসু খাইতে দ্যান, খিদা পাইয়া গিসে-।' মামা বেয়ারা-মারফৎ সন্দেশ আনিয়ে দিলেন। মুখ গম্ভীর।

সন্দেশ খেয়ে, চা খেয়ে, কাশ্মীরী শাল এর রীমাইণ্ডার দিয়ে, উনি উঠে পড়লেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাইল দ্যাখা হইব। কথডা বেশী কইবা রাইখা যাইয়েন।' বেরিয়ে যেতেই, মামা বোমার মত

ফাটলেন' 'অসহ্য, অসহ্য, একটা লোক, এমন 'পিসলা' লোক আমি জীবনে দেখিনি!'

—'কি হলো?'

—'সেই সাড়ে আট আনির পিয়ারী! ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরের কোন ক্লার্ক'রে কাশ্মীরী শাল দিব কইসিল্। পিয়ারী; কইলকাতায় চইল্লা আইসে, এখন সে নাকি ধীরেনরে ধরসে। বিশ্বাসমশাইয়ের কাজ কইরা দিসি একবার, আমার শাল কই।' অফিসে, বাড়ীর ভাষায় কথাটা বললেন উত্তেজনার মাথায়।

—'তা আপনি এসব দণ্ড মাথ' পেতে নিচ্ছেন কেন?'

—'নিতাসি কি আর সাধে? এমন বিসরী অবস্থার মধ্যে পরসি তার তুলনা নাই। ওইদিকে বড়দারে রোজ চিঠি লিখতাসি আসার জন্যে। ধীরেন চইলা যাইব। একসঙ্গে পুরা কেসটা পাইলে ওরাও খুশী হয়, আমিও বুঝতে পারি। দাদার পাত্তাই নাই! আমি আর পারি না।' দুঃখিত মামার অবস্থাটা উপলব্ধি করি। বড়দা মানে ও'র একজন শরিক। হাফ-ব্যাচেলর। থাকেন উলুবেড়িয়ায়। বোধ হয় গেছোবাবার পাশের বাড়ী!

হঠাৎ বললেন, 'তোর ব্যাপারগুলি শচী ঠিক করে দিয়েছে তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'পয়সাকড়ির ব্যাপারটা ক্লীয়ার করে রেখেছিস তো?'

—'হ্যাঁ, শচী-ই বলে দিয়েছে।' ফুঁকফুঁক করে নিবন্ত সীগারেটটা দুবার টান দিলেন। খুব অন্যমনস্ক।

—'এ কয়দিন কি কাণ্ড করল যদি দেখতি?'

!

'যেদিনই আসে, এইটা চাই, ওইটা চাই। যাবার সময় অফিসের দুটো বালতি আসে, তারই একটা দিতে হইব। দিয়া দিসি। তবু কাজটা উদ্ধার হোক!'

অবাক হয়ে ভাবি, লোকটাকে এত আস্কারা কেন দিচ্ছেন মামা?

—'শুনলি না, কাশ্মীরী শাল?'

—'ওটা তো কালেক্টরের, না কার যেন—বললেন?'

সেটা তো পরশুই নিয়ে গেছে। এটা ওর নিজের। 'আমারে একটা না দিলে হইব না। শীত পইরা গিসে।' ওর কথাটা কোট করলেন।

—!। মামা দিয়েই যাচ্ছেন! মনে পড়ল, উনি একদিন বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে গিয়া আমরা ভাল পামু না; 'ওই ডিপার্টমেন্টের

লোক !' শচীও মামাকে বলেছে, 'টাকা কিছু বেশী নিচ্ছে ঠিক-ই। তবুও দিয়ে যান বিশ্বাসকাকা ! মনে করুন, ক্ষমতার বাইরের একটা ইনশিওরড—পলিসী করেছেন, তার হেভি প্রিমিয়াম দিচ্ছেন। পরে যখন টাকাটা পাবেন তখন দেখবেন সব সয়ে গেছে।'

—'শচী-ই কাণ্ড করল। দিল্লী, বোম্বে ছুটাছুটি কইরা ঠিক্ ম্যানেজ কইরা ফেলছে।'

—'ওর হিয়ারীং-ডেট পড়েছে ?' জিজ্ঞেস করি।

—'সে কি তুই জানিস না ! হিয়ারীং ! ও তো দুইটা ইন্স্টলমেন্টের টাকা পাইয়া গেসে। কি তোর সঙ্গে খাতির ?'

হেসে বললাম, 'এটা খুব ডেলিকেট কোশ্চেন। কাউকে জিজ্ঞেস করা যায় না। আর অত টাকা পেয়েছি এটা বলাটাও ঠিক না।'

—'তুই দেখি শচীর মন্ত্র শিষ্য হইসস্। ঠিকই আমাদেরই ভুল। চ্যাঁচামেচি কইরা ঢাক পিটানির ব্যাপার না। নিজের 'চেক'-টা পাইয়া টু-ক কইরা সইরা পড়া। কি তাই তো ? অ্যাম আই কারেক্ট ?'

হেসে বললাম, 'সেন্ট পারসেন্ট !'

—কি খাবি ক ? ও তুই তো আবার কিসু খাবি না, কি ব্রত আসে ?'

বললাম, 'এখন খাব কি ? রাত অনেক হয়েছে, ঝাঁপ বন্ধ করুন ! এরপর বি বি. ডি বাগে আর বাস পাওয়া যাবে না।'

—'হ্যাঁ চল্।' 'চল্' বলেও প্রায় আধঘণ্টা অন্যমনস্কভাবে টেবিলের ওপর কি সব চেক্ করলেন। টাকা পয়সা গুন্‌লেন, লিখলেন, কাটলেন। অদৃশ্য কার উদ্দেশে ঠোঁট বাঁকালেন এবং চতুর্থবার নিবন্ত সিগারেটটা জ্বালিয়ে ফু'ক্‌ফু'ক্ করলেন।

৩৬

বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে, টিভোলী কোর্টের ভেতর ট্যাক্সিটা ঢুকিয়ে, নাবলাম। অফিস থেকে, তাড়াহুড়ো করে বের হয়েছি। ব্যস্ত লোকের সঙ্গে তাল রখতে সময় জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছি। আন্দাজে এগিয়ে যেতে যেতে একেবারে লিফটের সম্মুখে পেঁাছে যাই। লিফটম্যান ধারেকাছে চোখে পড়ল না। লিফটে উঠে পাঁচ নম্বর সুইচে হাত রাখতে গিয়ে মনে হলো পাঁচতলায়। অর্থাৎ চার নম্বর সুইচ। বাংলা ইংরাজির এই তফাৎটায় আমার প্রায়-ই ভুল হয়।

অটোম্যাটিক-লিফটে একা দাঁড়িয়ে অন্য কোন একটা দিনের কথা

অস্পষ্ট মনে পড়ছে ! কিন্তু, ঘটনাটা কি, অনেক চেষ্টা করেও, মনে আনতে পারলাম না ! ভাবতে ভাবতেই দরজাটা খুলে গেল। লিফটের বাক্স থেকে বের হয়ে ডান দিকে কাছেই যে দরজাটা চোখে পড়ল, তাতে অস্পষ্ট লেখা দেখলাম এম চৌধুরী ভি টি.। ভি টি মানে কি ? ভাই-কাউন্ট আর ভিকটোরিয়া টার্মিনাস ছাড়া আর কিছু মনে পড়ল না। ভেতর থেকে একটা মিউজিকের আওয়াজ আসছে। প্রথমে আধো-খোলা দরজায় নক করলাম। একটু পরেই কলিং বেলটার পুশ্-বাটন চোখে পড়ল। ঘরের দরজাটা খুলতেই পপ্-সংস-এর স্টিরিও ঝাঁপিয়ে পড়ল কানের পর্দায়। ভ্রমর-কালো চোখ তুলে তাকিয়ে আছেন ; তমসা বৌদি। চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। পরনে ঘরোয়া শাড়ী, অগোছালো। আমায় দেখেছেন বারকয়েক। দাদা আছেন নাকি জিজ্ঞেস করতে উল্টে উনি আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। গানের আওয়াজে একটু চেঁচিয়েই কথা বলতে হচ্ছে। বললাম, 'আমার নাম রহিমিয়ার—।'

উনি চমকে দরজাটা ভালো করে খুলে পাশে সরে দাঁড়ালেন। বললেন 'তোমার-ই তো আসার কথা ছিল না ?'

হেসে বললাম, 'হ্যাঁ।'

—'তোমাকে তো সবাই 'রাজা' বলে ডাকে— !'

জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বললাম, 'জ্যাঠামশাই-এর টাইটেল ডিফাংট করে প্রিভি পাস বন্ধ করলেও, গভর্মেন্ট আমার নামটা নিয়ে নেন নি।'

বৌদি হেসে বললেন, 'মীরার কাছে শুনেছি, তুমি খুব কথা বল।' কথাটায় উনি প্রশংসা না শাসন করলেন বুঝলাম না। একটি শ্যামলা মেয়ে এসে ষ্টিরিও র শব্দটা একদম কমিয়ে দিল। দাদার বড় মেয়ে হবে। আমি খুব ছোটবেলায় দেখেছি। বৌদি বলার আগেই দাদা-ই ঘরে ঢুকে বললেন, 'নমস্কার কর কাকলি, ইনি তোমার সবচেয়ে ছোটকাকা।'

ও নীচু হতেই আমি হাতটা ধরে নিয়ে বললাম, 'তুমি শুনছিলে ?' ও মাথা ঝাঁকিয়ে একটু হাসল। মিষ্টি মেয়ে।

—'তুমি পপ্ সংস্ ভাল—বাস ?'

ও মাথাটা তুলে বলল, 'না, রবীন্দ্রসংগীত ভালবাসি, পপ্সংস-ও ভাল লাগে।' একটু আধো আধো উচ্চারণ।

বললাম, 'থামালে কেন, বাজাও !' ও নব্টা ঘুরিয়ে দিতে গিয়ে বলল, 'একটা নতুন রেকর্ড চাপাচ্ছি। বাংলা— !'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কার ? রবীন্দ্রসংগীত ?'

ও হেসে বলল, 'না পপ্‌সংস।'

খাপ থেকে খুলে, ই. পি. টা চাপিয়ে দিয়ে ঢাকনাটা ঢেকে দিল কাকলি। স্টিরিও-র একটা স্পীকার একটু দূরে। সেখান থেকে ভেসে আসছে জাজ-এর স্ট্রোক। আর তারপরই হঠাৎ ইলেকট্রিক শক লাগার মত চমকে শুনলাম, অতি-পরিচিত গম্ভীর আর একটু খসখসে সেই কণ্ঠ !! স্টিরিওর অন্য স্পীকারটা, ঘাড়ের পাশ থেকে ফিসফিস করে উঠল, জীবন্ত কণ্ঠে।

'...ভালবেসে, কেন কান্না আমায় দিয়ে গেলে, ভালবেসে।' প্রতিটি শব্দ অণুতে, অণুতে, শক দিচ্ছে আমায়।

৩৭

জুহু যাবার পথে সে বলেছিল, 'শুনবে মশাই, শুনবে। বাপি সুর দিয়েছে দারুণ ! জন্মদিনে আমি যতক্ষণ উপস্থিত ছিলাম, গানটা গায়নি, বুণা। দাদারে, ওর এক্ঝলক চেহারায় আমি চোখে জল দেখেছিলাম ? এটাই কি সেই গানটা ? গানটা থামতে বৌদি বললেন, 'চা টা খেয়ে নাও।' সচকিত হয়ে দেখি টেবিলে একরাশ খাবার রাখা আছে !

ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'একি করেছেন ? আমি তো অফিস থেকে খেয়েই এলাম এইমাত্তর !'

দাদা ওদিক থেকে বললেন, 'না, একটু খাও।'

বললাম, 'তাহলে খেতে খেতেই কথা বলা যাক। আপনি ডকুমেন্ট-গুলো বের করুন।'

—'হ্যাঁ আনছি—।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হলের এক-দিকের দেয়াল জুড়ে মস্ত বিস্তৃত বুক শেল্ফ। তাতে অগুন্তি বইয়ে ঠাসা। উল্টো দিকে, স্টিরিও, গ্রুণ্ডিক টেপ রেকর্ডার আর একটা ফিলিপস হল্যাণ্ড রেডিও। হলের মাঝখানে দু-সেট সোফা—কাউচের আর একটি ডিভানের উপস্থিতি।

গান বাজছে না। আমি চা খাচ্ছি। বৌদি এ-ঘরে নেই। ভাইঝি, অপেক্ষা করছে। ঘরের পরিস্থিতিটা আর গান বাজানোর উপযুক্ত থাকবে কি না, বুঝতে পারছে না। চোখাচোখি হতে, ও তীব্রভাবে কেমন একটা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'গানটা কার জানো, কাকা ?' তাকিয়েই আছে ! কতখানি ম্যাচিওরড মেয়ে। এবার হায়ারসেকেণ্ডারী দিয়েছে রেজাল্ট বের হয়নি যদিও, তবু সবাই আশা করে, প্রথম দশ-

জনের মধ্যে থাকবে। অবশ্যই আর্টস-এ। গান শুনে হয়তো কোন মনের ভাব আমার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল, সেটা ওর নজর এড়ায় নি!

ও উত্তরের অপেক্ষা করছে। বললাম, হ্যাঁ রুণা কুমার।'

—'তোমার পপ-সংস ভাল লাগে?' এবার আমার প্রশ্নটাই ঘুরিয়ে দিল।

—'না।' এক কথায় উত্তর দিলাম! ওর মনে এখন একটাই প্রশ্ন। ভাল লাগে না অথচ শিল্পীর নাম জানি কি করে!

কাকলি বলল, 'রুণাদি-রা কলকাতায় এলে আমাদের বাড়ী আসে।'

সর্বনাশ! সাবধানে কথা বলতে হবে।

—'ও!' আমি আর কথা বাড়াই না। ছোট্ট ভাইঝিটার কাছে, আমার কথাটা আশা করি রুণা চাপা রাখবে! রুণার সাথে এর মধ্যে দেখা হয়েছে কিনা, জিজ্ঞেস করার ইচ্ছেটা হচ্ছিল।

একটা মোটা ফাইল্ নিয়ে ঢুকলেন, দাদা।

—'চল, আমরা বারান্দায় বসি।'

৩৮

বারান্দায় তখনো অস্তরবির আলো। দক্ষিণ-মুখী বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। আর পাওয়া যায় অফুরন্ত ঝোড়ো হাওয়া। কটা বেতের চেয়ার রয়েছে, কাপড়ের কুশন দেয়া। দাদা ফাইল্ খুলছেন আমি দূরের দৃশ্য দেখছি প্রাণ ভরে। উঁচু থেকে দেখতে অতি পরিচিত বাড়ীঘরগুলোর ধাঁচ কেমন যেন বদলে যায়! মানুষগুলোও কেমন পাল্টে যায়।

গোটা তিনেক গেজেটের পাতা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলে বললেন, —'এইটা নাও।' খুব ক্যাজুয়াল্ সুরে বললেন, 'এইটে দিয়ে বলতে পারবে আমাদের কিছু ছিল।'

হাতে নেবার আগেই চিনলাম কাগজটা। একরাদিন গেজেট্ ঘেঁটে ঘেঁটে কোন পাতায় কি আছে, সব মুখস্থ হয়ে গেছে আমার। বললাম, 'ওটা তো সেই তালুক সম্পত্তির শীডুল্ল! তিনটে শীট্ কেন, বাকী পাতা কই?' চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কনৃজিকিউটিভ্ বত্রিশটা পাতা আছে তো এতে।'

দাদা একটু ইতস্ততঃ করে, একটু ঢোঁক গিলে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বত্রিশটাই বোধহয়। সবশুদ্ধ বোধহয় তাই আছে। বাকীটা জেরোক্স্ হয়নি এখনো।'

২৬

অবাক হলাম ! তাহলে প্রথম তিনটে পৃষ্ঠা এনে আমাকে দিচ্ছেন কেন ! ! বললাম, 'ওর সবকটা পাতা আমার কাছে মাইক্রোফিল্ম্ করা আছে।'

'সবটা মাইক্রোফিল্ম্ করা আছে ?' আশ্চর্য কথাটা বললেন, দাদা নয়, তমসা বৌদি ! উনি কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়ে কথা শুনছেন টের পাইনি ! 'কোথায় পেলে !' আরেকটু জুড়ে দেন উনি।

—'কেন ? ন্যাশনাল্ লাইব্রেরীতে ?'

'ওখান থেকেই কি তোমায় মাইক্রোফিল্ম্ দিল ?'

-'হ্যাঁ ! বাইরে তো গেজেট্গুলো আনা যেত না। তাছাড়া আমি তো আর মেম্বর নই। ওখানে, বাইরের থেকে অনেক শস্তায়, কাজটা পাওয়া যায়।'

দাদা-বৌদির চোখাচোখি আমার দৃষ্টি এড়াল না। বললাম, 'এ বত্রিশ পাতার প্রিন্ট্টা কোন কাজে আসবে না।'

—'কেন ?' দাদার প্রশ্ন।

—'এটা তো এ্যাকোয়ার্ড লিস্ট। এর জন্য কোন কম্পেন্সেশন্ ধার্য হয়ে থাকলে সেট রোদ্-এশে করবে। কিন্তু এর জন্য কাস্টোডিয়ান্ কোন টাকা দেবে না। যেটা এ্যাকোয়ার্ড্ হয় নি, তার ডকুমেন্ট দরকার।'

দাদা ফাইল খুলে আরেকটা এক-শীটের গেজেটের জেরোক্স কপি দিলেন। পড়ে দেখলাম হাট বাজারের কাছারী বাড়ীগুলোর একারেজ, খতিয়ান নাম্বার এবং জে এল. নাম্বার শুদ্ধু একটা অপূর্ব সুন্দর শীডুয়্যল্। এটা খাস্ল্যাণ্ড্ সেটা মেন্শন্ করা আছে। কিন্তু গভর্ণর প্রীজড্ টু এ্যাকোয়্যার ..' কথটায় কেমন খট্কা লাগল। খাস্ল্যাণ্ড্ এ্যাকোয়ার্ড্ হবে কেন। শচীকে একটু জিজ্ঞেস করতে হবে। এই শীট্-টা নিয়ে নিলাম।

দাদা বলছেন. 'তুমি তাহলে এ্যাফিডাভিট্ করে নিয়ে একটা টাইপ্ড্ কপি আমায় দিয়ে যেও।'

—'হ্যাঁ, সেই সঙ্গে বাবার চিঠির ফোটো-কপিগুলোও দিয়ে যাব।'

—'হার্ড্লী তিরিশ হাজার টাকা করে পাবে. ধরে রাখো। এর বেশী হবে না। আর এসব ক্লেইম্ করার কোন মানে হয় ? আজ প্রায় সাতশ' বছর রস টেনে টেনে ছিব্ড়ে বের করা হয়েছে এর থেকে। আর কত ?'

এই অদ্ভুত কথাটায় অবাক না হয়ে গিয়ে উপায় নেই ! সাতশ' বছর ধরে রক্ষণাবেক্ষণ করে একটা রাজ্য, একটা জমিদারী কোথায় আরও বড় হবে, প্রোডাক্টিভ্ হবে, তা না রস টেনে টেনে, ছিব্ড়ে !

বললাম, 'তা কেন, ওই সম্পত্তি থেকে তো কিছুই নিচ্ছেন না দাদা ওটা আর কোনদিন-ই পাবেন না……'

—'না, না, চাইনে, চাইনে!' মুখবিকৃতি করে বললেন, যেন কত ঘেন্নার জিনিস!

—'……নন্-রেসীডেন্টদের টাকা, এখানে ভাগ করে দেয়া হচ্ছে। যেমন, পাকিস্তানীরা আমাদের ফেলে আসা টাকা পাচ্ছে।'

—'ওই তো, বাড়ীঘরের জন্য কয়টা টাকা দেবে আর কি।'

—'সেটাও তো কম নয় দাদা। গ্রামের অতবড় রাজবাড়ী, ডিস্ট্রিক্ট টাউনের বাড়ী আর ঢাকা শহরের অতটা জমি! এতেই অনেক টাকা হবে। এগ্রিকাল্চারাল্ আর ফরেস্টের জন্য-ই নাকি খুব বেশী টাকা দিচ্ছে। আপনি ভাবতে পারছেন না।' হাসতে হাসতে বললাম, 'প্লিজ্ থিঙ্ক্ ইন্ টার্ম্স্ অব্ লাখ্স্ এণ্ড নট্ ইন্ থাউজ্যাণ্ডস্।'

দণ্ডায়মানা বৌদির দিকে তাকিয়ে দাদা হাসতে হাসতে বললেন, —'রাজা বলছে, আমরা নাকি একলাখ করে পাব!'

বাধা দিয়ে বলাম, 'একলাখ কেন বলছেন, আমি শচীকান্তর সঙ্গে অনেক কথা বলেছি, শক্তিপুরের শচীকান্ত সান্যালকে চেনেন তো? ওতো অনেক খেটেছে, এণ্ড্ ওয়েন্ট ডীপ্ ইন্‌টু দা ম্যাটার্। সাড়ে চার লাখ টাকা পেয়েছে শুনলাম। প্রাইভেট্ ফরেস্ট্ নিয়ে লড়ছে। ওটাতে, ও অনেক পাবে আশা করছে।'

শুনে কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন দাদা। চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দূরের বাড়ীগুলো আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

নীচের ডানদিকের কোণে বিশ্রী নোংরা ডোবাটা চোখে পড়ল। মোষগুলো কাদা থেকে উঠে আসছে। হিন্দুস্থানী গোয়ালারা ঝগড়া করছে নিজেদের মধ্যে। এতো সুন্দর ম্যান্শন্‌টা, কেমন ম্যাড়্ম্যাড়ে লাগছে এখন।

—'ভেতরে গিয়ে বসি চল।' ফাইলপত্তর শুদ্ধু ড্রয়িং রুমে, এলাম ফের। বললাম, 'আর কোন ডকুমেন্ট্ নেই?'

দাদা কেমন নীরস কণ্ঠে বললেন, 'না, আর সবই তো পার্সোনাল্ প্রপার্টি, বাবার নামে আছে।' জ্যাঠামনি বলেছিলেন সব সাজানো আছে, অথচ—!—ফরেস্টের শীড্যাল্ নেই!

ফাইল্‌টা উল্টোতে উল্টোতে বললেন, 'একটা চিঠি আছে, কোন শীড্যাল্ নেই তাতে।' আবার ছেড়ে দিলেন ফাইল্‌টা।

বললাম, 'বাড়ীতে কোন ছবি খুঁজে পেলাম না রাজবাড়ীটার। মুন্-

লাইটে তোলা বাবার একটা ভারী সুন্দর ছবি ছিল। দশ মিনিট না কত এক্সপোজার দিয়ে তোলা, সামনে দিয়ে নাকি একটা হাতিও হেঁটে গিস্‌লো, কোন ক্ষতি হয় নি ছবিটার। ওটা পেলে ভাল হতো। জ্যাঠামশাই বলেছিলেন খুঁজে রাখবেন। ওঁর কাছে অন্য নেগেটিভ্‌ আছে।'

—'তোমার কাছে কি রাফ্‌ কোন লেখা আছে, কেমন করে সাজাবে?'

বললাম, 'হ্যাঁ, শচীকান্ত সেটার যা দাম লিখেছে আমরা সবাই তাই ধরছি। আমার মুখস্থ ই আছে। হোম্‌স্টেড্‌ ল্যাণ্ড্‌, গ্রামের-টা হবে আট হাজার টাকা বিঘা, সাব্‌-ডিভিশনাল—' দাদা নোট্‌ বই বের করে, চট্‌চট্‌ সব লিখে নিতে লাগলেন। আমি বলে চলেছি।—'টাউনের জমি দেড় লাখ টাকা—পার্‌ বিঘা, আর ঢাকারটা তিন লাখ টাকা বিঘা ধরবেন।'

—'এগ্রিকাল্‌চারাল্‌ ল্যাণ্ড্‌ বললে না?'

—'হ্যাঁ, থ্রি ক্রপ্‌স্‌, পার্‌ এগ্রিকাল্‌চারাল্‌ সীজ্‌ন্‌। তিন হাজার টাকা বিঘা। ফরেস্ট্‌ আর জল-মহল-কিন্তু পার একর, হিসেবে দাম হবে। ফরেস্ট্‌, ছয় হাজার টাকা একর, আর জলমহল পাঁচ হাজার ধরুন।'

—'বড়ীগুলোর কি দাম ধরবে?' দাদা টুকে যাচ্ছেন। সমান অংশীদার দু'জন, যাতে একইভাবে এ্যাফিড্যাভিট্‌ সাব্‌মিট করি। দু'জনেরটা কোর্‌-বোরেট্‌ করা দরকার। দাদাই একদিন বলেছিলেন কথাটা।

—'ওরা স্কোয়ার ফিট্‌ চাইছে। নিজের বাড়ী কি কেউ আর মেপে রেখেছে। এ-তো আর কলকাতার বাড়ী নয়, দেড় কাঠার কর্ণার প্লটে তিন-তলা বাড়ী। আমার মনে হয় স্কোয়্যার ফিট্‌ এ্যাভয়েড্‌ করে দিয়ে, সোজা-সুজি দামটা বললেই হয়। বাড়ীর ছবি ই তো দেখাচ্ছি।'

—'বেশ! কত দাম ধরবে?' অত কথায় দাদা নেই। সোজাসুজি যা হয় তাতেই হবে।

বললাম, 'আপনি যা লিখবেন, আমি তাই লিখব। কত বলেন আপনি?'

দাদা নোট বইয়ে লিখে বললেন, 'একলাখ ধরলাম!'

বললাম, 'পাগল হয়েছেন, অতবড় স্ট্রাক্‌চারটার ওই দাম হয়?'

—'তাহলে কত?'

—'আমাদের বাড়ীটার একটা বোগাস কপি করেছিল না, উমাপুরের জমি-দাররা, ডিস্ট্রিক্ট টাউনে?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ। অত সুন্দর হয়নি, ওই স্টাইলটা নিয়েছে।'

—'তবে ওটার দাম ওরা কত ধরেছে জানেন, দশলাখ টাকা।'

দাদা হতাশভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, অত টাকা, টাকা কয়ো না

রাজা। আমি জানি, ডি পি.-র সাথে আলাপ আছে আমার। ওরা খুব বেশী একটা টাকা দেবে না। যা খুশী একটা লিখে লাভ নেই তো।' খুব গম্ভীর কথা বলার ঢং।

আমিও বললাম, 'আমি যা দাম ধরবো। সেটাই তো আর দেবে না। ওরা কেটে একটা দাম ধরে, তার চার ভাগের এক ভাগ দেবে।' 'ডি. পি' এমন কথা বলতে গেলেন কেন বুঝলাম না।

—'হ্যাঁ, তাই তো।'

—'তাই বলছিলাম, কম দাম ধরলে তো আর বাড়াবার উপায় নেই ওদের, যদি—'

দাদা আর কথা বললেন না।

বললাম, 'সোর্ডগুলোর দাম ধরতে ভুলবেন না। ওটা জ্যাঠামশাইয়ের, মহারাজা হিসেবে একার প্রাপ্য। সীজার লিস্ট নিশ্চয়ই আছে? কত দামী দামী স্টোন বসিয়ে হাতলগুলো তৈরী!'

চট্ করে দাদা দরবারী সোর্ড—কথাটা নোট করে নিলেন। ভঙ্গীটা 'তুমি এবার ওঠো।'

—'তুমি সোর্ডগুলো দেখেছ?' বৌদির তির্যক প্রশ্ন।'

—'হ্যাঁ। আমার সামনেই তো ওগুলো লিস্ট করে ওদের হাতে তুলে দিলেন, বাবা। আর্মস এ্যামুনীশনসগুলোর সীজার অর্ডার হয়েছিল। জ্যাঠামশাই তখন কলকাতা থেকে সোর্ডগুলোও সারেণ্ডার করলেন চিঠি লিখে। রেগে গিসলেন খুব!'

কেন জানি মনে হলো বৌদি কথাটা বিশ্বাস করলেন না। বোধহয় তাঁর শ্বশুরকুলের ওপর খুব একটা উঁচু ধারণা নেই! সোর্ড-টোড থাকার মত রাজা নাকি? দা কুড়াল, বা নেহাৎ বর্শা হলে বোধহয় উনি নিশ্চিন্ত হতেন!

৩৯

তখনই ঘরে অনেককজন ভিজিটরস্ এলেন। পুরুষ এবং নারী। তাদের নিয়ে আরেক রাউণ্ড্ চায়ের অর্ডার হলো। আমার সম্মুখ থেকে এঁটো প্লেট্-কাপগুলো নিয়ে যাওয়ার সময় চাকরটাকে বৌদি চাপা গলায় কলতলায় আলাদা করে ধুতে বললেন গুঁড়ো সাবান দিয়ে! ধর্মীয় সংস্কার আজ-ও! অথচ বিদেশে আট বছর কাটিয়ে এসেছেন! কেরেস্তান্ হলে আপত্তি নেই, সাদা চামড়া যে! দোষ একভাষা-ভাষি মুসলমান ভাইদের, তাদের ছোঁয়ায় জাত যায়! ছোটবেলার শিক্ষাই মজ্জাগত হয়। মনে

আছে, দেশের জিলা স্কুলে ক্লাস্ থ্রি-তে ভর্তি হয়েছিলাম। মৌলবী স্যার ক্লাসে এসে, আমায় কোঁচা সমেত ধুতি পরা 'বাবু' চেহারা দেখে, 'তোবা, তোবা' বলতে বলতে সর্বসমক্ষে আমাকে 'ধুতুম্' করে, ধুতিটা খুলে চার ভাঁজ করে গিঁট দিয়ে পরিয়ে দিলেন। লুঙ্গি পরতে ওই আমার প্রথম শেখা, ওই শেষ। বাড়ীতে বলতে বাবা আমাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন। যতদিন পাকিস্তানে থেকেছি, ততদিন প্রাইভেট্ মাস্টার মশাই-এর কাছে পড়েছি।

কিছু অন্ধ, টেকো পণ্ডিত, আর কতক টুপী পরা মৌলবী আমাদেরকে দূরে দূরে সরিয়ে রেখেছে। উস্কানী ছিল, আগে বৃটিশের, পরে পশ্চিম-পাকিস্তানীর। ডিভাইড্ দেম্, -এ্যাণ্ড রুল! ফাস্ট্ টু ডাইভার্ট্ দ্য মাস্।

গেস্টদের, লিফ্‌ট্ অবধি পৌঁছে দিতে দাদা, বৌদি আর কাকলি ঘর থেকে বাইরে গেল। ঘরে আমি একা! আমারও ওটা দরকার। হাতের কাছে ফাইল্‌টা খোলা পড়ে আছে। ম্যাগ্‌নেট্! কি মনে হতে, চট্ করে কাগজগুলো উল্টে যেতে লাগলাম সেটা কোথায়, কোথায়! ঝট করেই বেরিয়ে এলো চিঠিটা। স্যার জন্ এ্যাণ্ডারশনের সই করা চিঠিটা, লিখেছে মহারাজাধিরাজকে। সামান্য কটি কথা। আমাকে যেন সোনার খনি এনে দিল। মূল বক্তব্য হচ্ছে, তোমার সঙ্গে কথা মত; তোমার সমস্ত জঙ্গল, রীজার্ভড্ ফরেস্ট হিসেবে চিহ্নিত হলো। যথাসময়ে গেজেটে নোটিফিকেশন বের হবে।' এই কাগজটা দাদা আমায় দিচ্ছেন না কেন? শুধু এটা পেলেই তো ফরেস্ট্ দাঁড়' করানো যায়। আর যা লাগে তা হচ্ছে মহারাজার কেসের আর আমার কেসের কোর্‌বোরেশন। ইংরাজী 'ইয়োর' কথাটার অর্থ তোমার-ও হয়, তোমাদের-ও হয়। দাদা কিম্বা জ্যাঠামশাই কি পুরো দশহাজার একর ফরেস্ট আত্মসাৎ করতে চাইছেন! এটা একা মহারাজার প্রপার্টী এইভাবে দেখাতে চাইছেন! ওঁদের অন্য কো-শেয়ারারদের কাছে যদি ওরিজিন্যাল্ ডকুমেন্ট্ থাকে? তাঁরাও নিশ্চয়ই ক্লেইম্ করবেন? ভাবতে ভাবতে পাতা উল্টে যাচ্ছি। অনেক কটা চিঠি আর গেজেটের নোটিফিকেশন দেখলাম, অরিজিন্যাল্ ফরমে রয়েছে। তাড়াহুড়ো করে সব দেখাও গেলো না। ওঁরা ফিরে আসার আগেই ফাইল্‌টা যথাস্থানে রেখে দিয়ে, খুব চিন্তিতভাবে, পাখার কটা ব্লেড গুনতে চেষ্টা চালাতে লাগলাম।

—'বল রাজা, আর কি খবর?' ক্লীয়ার ইণ্ডিকেশন্। এবার কেটে পড়। বললাম, 'আমি উঠি, বাড়ী যাব।'

ওঁরা আর লিফ্‌ট্ অবধি এলেন না। এলো কাকলি, একা।

লিফ্‌টে উঠে, ওর দিকে ফিরে বললাম, 'পাশের খবরটা দিও।' ও, ওবি-ডিয়েন্ট্‌ স্টুডেন্ট-এর মত ঘাড় নাড়ল।

ওর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা চোখ-জোড়ার সম্মুখেই দরজাটা আস্তে আস্তে দুপাশ থেকে এসে, এক হয়ে মিশে গেল। এরপর অবতরণ। আমি তখন-ও চিন্তিত খুব। লিফ্‌ট্‌ থামতে খেয়াল হলো, সারাক্ষণ 'জি' মার্কা বোতাম-টা টিপেই ধরেছিলাম!

৪০

বের হয়ে এসে প্রথমেই ফোনে এ্যাপয়েন্ট্‌মেণ্ট করলাম শচীকান্তর সঙ্গে। ওকে আবার সকাল আটটার মধ্যে ধরতে হয়।

সকালেই হাজির হলাম ব্রেক্‌ফাস্ট্‌ টেবিলে।

—'হ্যালো. হ্যালো……' শচীর সুপ্তোত্থিত ভারী কন্ঠস্বর। সুলগ্না বৌদি ছেলেকে খাওয়াচ্ছেন। রীন্টু স্কুলে যাবার পোষাকে রেডী। যত না খাচ্ছে, তার চেয়ে বেশী চাম্‌চে দিয়ে ঘাঁটছে মাখা খাবারটা। ফলে মাকে—আরো ম্যানার্‌স্‌ শেখাতে হচ্ছে, ধম্‌কে ধম্‌কে!

—'ব্ল্যাক্‌ কফি? না চা?'

—'হ্যাঁ দিন, যেটা রেডী আছে।' কফি-ই ঢেলে দিলেন পট থেকে।

—'দেখি কি কাগজ এনেছ?' শচী তাড়া লাগায়। কাছারী বাড়ীর শীড্যুলের পাতাটা ওর সামনে মেলে ধরি।

দেখেই শচীকান্ত হায় হায় করে উঠল, 'কি বদমাইশি করেছে দ্যাখ' এগুলোর চাঁদিনা সত্ত্ব তোমার! খাস্‌ প্রপার্টী! এ কখনই এ্যাকোয়ার হয় না, এ, হে-হে।' সত্যিই ও খুব দুঃখিত হলো।

খুব কচি কন্ঠে বললাম, 'এটাকে কোনভাবে দাঁড় করানো যায় না!'

মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'উঁহু। তা কি ওরা শুনবে? বলবে কম্পেন্‌কেশন রোলে এটা আছে।' একটু থেমে বলল 'ধীরেন চলে গেছে কিনা জানো?'

মাথা নেড়ে বলি, 'সঠিক জানিনা। ওতো কদিন হলো যাচ্ছি যাচ্ছি করছে।'

—'খোঁজ নাও তো। চলে গিয়ে থাকলে ওকে চিঠিতে লেখ, কম্পেন-সেশন রোলটাই আনুক। ওটা আনলে যদি দেখো এই চাঁদিনা জোত, কাছারী বাড়ীগুলো ওতে শো করা নেই, তাহলে এগুলো চার্জ করে দেবে।' মনে মনে ভাবলাম যদি এনে দেখি এগুলো রোলে আছে, তাহলে তিনহাজার

টাকা গচ্চা !

বললাম 'অন্য কোন উপায় নেই ?'

ঠোঁট উল্টে বলল, না। আরে বে-আইনী এ্যাকোয়ার করলে সঙ্গে সঙ্গে ইনজাংকশন দিতে হয়। সেটা কি দেয়া হয়েছিল ?' শচী উত্তেজিত হয়ে পড়ে একটু।

—'যদি বলি, স্টেটের ম্যানেজার এসব করতো, তার কাজেই কোর্ট-এর কেস-কপি ছিল, আমরা পাইনি—'

বাধা দিয়ে শচী বলে, দূর, তা কখনো ওরা শোনে ? এতটুকু সন্দেহ থাকলে, সেই আইটেম কেটে দেবে ঘ্যাচ করে। জ্যাঠামশাইকে ধর। এই কাগজটা যখন আছে, তাহলে হয়তো ইনজাংকশন দেয়া হয়ে থাকলে তার সারটিফায়েড কপি-ও আছে।'

৪১

ওখান থেকে তক্ষুনি ছুটলাম জ্যাঠামশাই-এর বাড়ীতে। আমার আর সময় নেই হাতে। দু এক দিনের মধ্যে এ্যাকিডাভিটটা করে ফেলতে হবেই। আর এক্সটেনশন নেব না।

ঘরে ঢুকে দেখলাম ও বাড়ীর আর এক জ্যাঠামশাই এসে বসে আছেন। আমায় দেখে একটু হেসে বললেন, 'কী রে, আমবার বাড়ী যাস না ক্যানে ?' ইনি, ও বাড়ীর মেজো কুমার। নাম কিশোর চৌধুরী। পঞ্চাশোত্তীর্ণা জ্যাঠাইমাকে ; এ'র সামনে একটু তরুণী-তরুণী আহ্লাদে ভাব করতে আগেও দেখেছি। ইনি খুব-ই স্নেহ করেন ও'কে !

—'যাব একদিন।' বলে চুপ করে বসে থাকি।

কন্ঠস্বরে অপরূপ লালিত্য ফুটিয়ে জ্যাঠাইমা তাঁর ঠাকুরপোকে বললেন, 'তোমরা কেন ক্লেইম করছো না কিশোর ?' ঘরে অযথা এদিক-সেদিক ঘুরঘুর করছেন।

কিশোর জ্যাঠা বললেন, 'ডকুমেন্ট নাই কিছু। দেখি, তোমরারে কি দেয় ! পরে করবাম।' এ'র কোন অর্থের অভাব নেই। ও'র বাবা প্রচুর সোনা দানা রেখে গিসলেন।

জয়েণ্ট স্টেট একসময় ও'র বাবাই ম্যানেজ করতেন। ভাল ই চালাতেন শুনেছি। এবং পরযুগে কোর্ট অব ওয়ার্ডসে যাবার আগে কিশোর চৌধুরী নিজেও সাফল্যের সঙ্গে শেষ ছ'বছর, মহারাজার হয়ে স্টেট ম্যানেজ করেছেন ; এটা সবাই বলে। তবু কেন যে সোমেশ্বর স্টেট কোর্ট অব

ওয়ার্ডস-এর হাতে গেল বুঝতে পারিনি !

কিশোর চৌধুরীর কলকাতায় দুটো বাড়ী আছে। ব্যাচেলার। —'তুই একটা রবিবার দেইখ্যা আমার ওইখানে আসিস ; বুঝলে ? ···এই রবিবারেই আয়না, আইবি ? 'আমি থাকবাম অনে !'

বললাম, 'আচ্ছা যাব।'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'রাজ তো অনেক কাগজপত্র যোগাড় করে ফেলেছে !' আশ্চর্য নিজেদের কাগজপত্র-র কথা বেমালুম চেপে গেলেন ভদ্রমহিলা !

—'অর তো থাকবই কাগজ। অর বাবা তো শেষপর্যন্ত কুড়াইয়া-বাড়াইয়া সব লইয়া আইসে।' কথাটা কি অর্থে বললেন কে জানে !

— না, বাবার তো মাত্র তিনটে চিঠি আছে। বাকী সব ন্যাশানাল্ লাইব্রেরীর গেজেট্ ঘেঁটে ঘেঁটে, আর কিছু······'

বড় জ্যাঠামশাই এতক্ষণ সব শুনছিলেন, হঠাৎ খু-ব চীৎকার করে বলতে লাগলেন, 'রাজ খুব খাট্‌তাসে. ও জীবনে অনেক কষ্ট করছে। ও অনেক টাকা পাউক। এইটা আমি অন্তর থেইক্কা চাই।' আমার কেন জানি মনে হলো, উনি আমার কথাটা চ্যাঁচামেচি করে চাপা দিয়ে দিলেন।

—'তা'হইলে তুই আমার কেস্‌টা সাজাইয়া দিবে ?' পরিহাসছলে বললেন, 'আমি তাইলে ক্লেইম্‌ডা করতাম পারি।' একটু থেমে বললেন, 'আমার তো সময় নাই. এই সব ডকুমেণ্ট বিস্‌রানির্ !'

বললাম, 'আচ্ছা করে দেব।'

—'তর্ ডকুমেণ্ট্ দিয়াই আমারটা হইব তো ?'

—'হ্যাঁ। ওগুলোর ফোটো কপি করে দেব'খন। আপনার কাছে কোন ডকুমেণ্ট-ই নেই ?'

ঠোঁট উল্টে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'নাঃ।'

কুমার কিশোর চৌধুরী চলে যেতে আমি দাদার দেওয়া ডকুমেণ্টটা দেখিয়ে বললাম, 'শুধু এটা দিয়েছেন দাদা।'

জ্যাঠামশাই আগ্রহভরে সেটা হাতে নিয়ে, হাইলেন্সের ভেতর দিয়ে, অতি কষ্টে পড়ে, পড়ে বললেন, 'দেখস ? কাউরে দিয়া এমত্ কাম্ হয় ? নিজে দাঁড়াইয়া থাইক্কা এইটা গেজেটে তুলাইসি। এতে আমরার বাড়ীর কত অংশ, তৌজি নম্বর, সব সাজানি পাইবা।'

মনে মনে বললাম দাঁড়িয়ে থেকে এটা এ্যাকোয়্যার করিয়ে দিলেন !

—'এটা চাঁদিনা জোত্। এতো এ্যাকোয়ার, হয় না, জ্যাঠামশাই ! এর বিরুদ্ধে কি কোন কোর্ট ইনজাংক্‌শন্ দেয়া হয়েছিল ?'

—'মন করতাম পারতাসি না !' কি যে করি !

২৭

বললাম, 'আপনাদের ফরেস্টটা, রীজার্ভড্ ফরেস্ট, বাড়ীর অন্য তরফদের ফরেস্টগুলো দেখলাম, প্রাইভেট-ফরেস্ট ! এই তফাৎ-টা কেন, জ্যাঠামশাই ?'

—'সেইডা তো কইতাম পারতাম না। তবে স্যার এ্যাণ্ডারসন আমারে কইসিল, তোমার ফরেস্টটা আমাদের ম্যানেজমেণ্টে দাও, বেশ কিসু টাকা বসর্, বসর পাইবা। সেই কাগজটা তোমারে দিসে মেঘু ?'

খানিক চুপ করে থেকে বললাম, 'না। —আপনি সেদিন বলছিলেন, বাটোয়ারী মকদ্দমায় পুরো দশ হাজার একর ফরেস্ট আপনাদের থেকে গেল, আর মধ্যম তরফ বেস্ট এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড পেল। অথচ গেজেটে মধ্যম তরফের কাকা জ্যাঠামশাইদের নামে খুব কম করেও সাত হাজার একর প্রাইভেট ফরেস্ট আছে দেখলাম। এটা কোত্থেকে এলো, জ্যাঠামশাই ?'

সদ্য মুণ্ডিত মস্তকে হাত বোলাতে বোলাতে, ধমকে দিয়ে বললেন,

— 'এই যুগের ছেলেরা খালি এটা হয় নাই ক্যান, ওইটা করলাইন্ না ক্যান, কয়। তারা তো আর প্রবলেমটা মাথায় নেয় নাই ! তখন এইডা দেখা হয় নাই, নিশ্চয়ই কোন কারণ আসিল্ ' বুঝলাম জমিদারীটা এঁরা ভালোই চালাতেন। মধ্যম তরফ—এর কর্তাদের বরাবরই ওয়েল অফ দেখেছি। জমিদারীর ব্যাপারেও অনেক ইন্টেলিজেন্ট।

— আর কোন কাগজ নেই আপনার কাছে ?' করুণ সুরে বলি।

—'নাঃ। সবই তো মেঘুরে দিয়া দিসি। সে যা ভাল বুঝছে তাই দিসে তোমারে। আমি এই সবের মধ্যে নাই।' আর বসে থাকার মানে হয় না।

বললাম, 'কিশোর জ্যাঠাকে আমি যা ডকুমেন্ট যোগাড় করেছি সব দিয়ে দেব '

জ্যাঠামশাই ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইউ আর এ্যাডাল্ট এনাফ টু্য টেক ইয়োর ওন ডীসীশন। তোমার যদি মনে হয় দ্যাওন উচিত, দিবা। এখন, কাউরে কাগজ দিয়া যদি নিজে ঠইক্কা আস, তা'হইলে তোমারে বোকা কইবাম। বুইজ্জা কাজ করবা।'

বাণীটা মাথায় নিয়ে উঠে পড়লাম। দোর-গোড়ায় জ্যাঠাইমা আমায় ডেকে, হাতদু টি ধরে পরম বৈষ্ণবের মত বললেন, 'দেখিস বাবা, কিশোর যেন কিছু পায়। ওর কাজটা করে দিস, বাবা।' যেন কোন হৃদয়-বিদারক সীনের রিহার্সাল দিচ্ছেন, জ্যাঠাইমা।

৪২

বিফল মনোরথ হয়ে বেরিয়ে আসি। এখন ধীরেন-ই ভরসা। ক্যাল-কাটা-গেজেটগুলো একবার খুঁজতে হবে। যদি আমাদের রীজার্ভড ফরেষ্টের নোটিফিকেশন্‌টা পাই। তাড়াতাড়িতে দাদার ওখানে এ্যাণ্ডারসনের চিঠির তারিখটা দেখে নিতে পারিনি। ঊনিশশো সাতাশ থেকে কতগুলো ভলুম্‌ ঘাঁটতে হবে ঈশ্বর জানেন! ঢাকা গেজেট্‌ ঘেঁটে ঘেঁটেই বিধ্বস্ত হয়ে গেছি। গেজেটের কথায় বিভীষিকা মনে হয়। মাতুল তো আমায় ঠাট্টা করে 'গেজেট বিশারদ' নাম-ই দিয়ে দিয়েছেন। নিজেরটা দেখতে গিয়ে ওঁর আর ওঁর পরিচিতদের কয়েকজনের রেফারেন্স দিয়েছিলাম, পেজ্‌ নাম্বার শুদ্ধু। গেজেটের ছাতা পড়া পাতায়-পাতায় রত্নখনি থাকলেও কেমন একটা দম আটকানো ভ্যাপসা গন্ধ আছে! গন্ধটায় একটা অতীত অতীত ভাব পাওয়া যায় ম্যামির বাসগৃহের মত! কাউকে কথাটা বললেই হাসে। কিন্তু আমার মনের ভাবটা একমাত্র ধরতে পারে, তৃষিৎ। ও কবি কিনা, তাই।

৪৩

খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিজেই কথাটা তুললেন, দীননাথবাবু। আমার তো মনে হলো কথাগুলো আমাদেরকে শোনাবার উদ্দেশ্যটাই প্রধান। চা ছাঁকতে কেন যে এতক্ষণ ধোপার হিসাব মেলাচ্ছিলেন, তা জি ও কে অর্থাৎ গড ওনলি নোজ! আমরা চারমূর্তি যথারীতি মুখে ঠুলি পরে, পরম আগ্রহের সঙ্গে, তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী কর্ণ-কুহরে নিচ্ছিলাম।

—'লার্জ স্কেলে উঠে লাগ ব্যাক্‌ করে তো কোন লাভ নেই? তার চেয়ে আমরা যদি স্মল স্কেলেই থেকে যাই, তাহলে ফেসিলিটিসগুলো পেতে থাকবো। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, স্টেট গভরমেণ্ট সব সময়েই স্মল-স্কেল ইণ্ডাস্ট্রীজকে প্রায়োরীটি দেয়। শুধু তাই নয়, ব্যাঙ্ক থেকে-ও লোন্‌ পেতে দারুণ অসুবিধে। লার্জ স্কেলে চলে গেলে এর একটাও সুবিধে পাব না। তাই বলছিলাম, আমরা যদি স্মল স্কেলের স্টট্রেঙ্গেস্ট ইউনিট হয়ে থাকি তবে সেটাই কি কাম্য নয়?'

হঠাৎ বলে ফেললাম, 'কিন্তু কোম্পানীর গ্রোথ আটকাবেন কি করে?'

উনি চমকে বললেন, 'নো, নো, উই আর নট গোয়িং টু এ্যারেস্ট্‌ দা নরমাল গ্রোথ। ওন্‌লী চ্যানেলাইজিং দেম, ইন ডিফারেণ্ট হেডিংস। বুঝতে পারলে না? আমরা পাশে পাশে সান্ত্বনা র-কেমিক্যাল, সান্ত্বনা কনজিউমারস প্রডাক্টস, সান্ত্বনা সোশ্যাল ওয়ার্কস, এইসব স্যাটেলাইট

কোম্পানীগুলো করেছি। এরা সান্ত্বনা ফার্মাসীউটিক্যালস এর কিছু প্রডাক্ট লোন-লাইসেন্সে করে দেবে। এতেই এই স্যাটেলাইটদের নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় থাকবে। তারপর ওই সীস্টার কনসার্নগুলো নিজেরা এক-একটা স্মল স্কেল ইউনিট হিসেবে ব্যাংক লোন নেবে, গভরমেন্ট অর্ডার পাবে, একসময় নিজেদের প্রডাক্টস মার্কেট করবে?' আনন্দে চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে দীননাথবাবুর। ভদ্রলোক খুব ই ইমোশনাল। উনি সবই বললেন, কিন্তু, যার ছত্রছায়ায় ওই স্যাটেলাইটগুলো বাঁচবে, নিজেদের সম্মুখে তুলে ধরবে, তার এমপ্লয়ীদের কি উপকার হবে ওতে, সেটা জানা গেল না।

· কফি আর পেসট্রিজ খেয়ে, যে যার মত বাড়ী গেলাম। উইদাউট এনি পোস্টমর্টেম অব দা স্পীচ! বোধহয় কেউ নিজেকে মার্ক করাতে চায় না। শুধু শতপথী জিজ্ঞেস করেছিল 'কনজিউমারস প্রডাক্টসে কি তৈরী হচ্ছে?'

দেবরাজ ভট্ট উত্তর দিয়েছিল, 'সল্টেড চাল ভাজা।'

বিজয় শতপথী হেসে বলল, 'আর সোশ্যাল ওয়ার্কসে?'

নীরস-কণ্ঠে ভট্টর উত্তর হলো, 'স্যানিটারী গামছা, নাম দিয়েছে, 'শান্তাজেল'!'

৪৪

পি. এম. জি অফিসের পিসতুতো দাদাকে বলাই ছিল। আরেকজন হরিয়ানা দুগ্ধ-প্রকল্পের রীটায়ার্ড এনজিনীয়ার আমাদের দেশের লোক। সজ্জন। এঁদের দুজনকে নিয়ে, কথামত বাবা, সকাল এগারোটার মধ্যেই, ব্যাঙ্কশাল কোর্টে পৌঁছেছেন। এ্যাডভোকেট মিঃ দে-র টাইপিস্ট, তখনো টাইপ করেই চলেছে।

মিঃ দে প্রথমেই এ্যাফিডাভিট প্রতি, সব খরচ নিয়ে পঞ্চান্ন টাকা করে চেয়েছিলেন। আমি আমার পরিচিত দালাল-এর দিকে তাকিয়ে নিয়ে একটু হেসে বলেছিলাম, 'এতো টাকা চাইছেন কেন? তিনটে এ্যাফিডাভিট তাহলে একশ পঁয়ষট্টি!!'

—'এর কমে হয় না।' নির্বিকার উত্তর।

—'বেশ; স্ট্যাম্প কাগজ তিনটাকা করে! বাকীটা ভাগ ভাগ করুন তো—!'

উনি ফস্ করে একটা বহু লিখিত কাগজে লিখলেন, স্ট্যাম্প কাগজ তিন। প্রসেসিং-চার, টাইপ—পাঁচ, আর আমার ফীস?'

বলে দিলাম, 'আপনার ফীস তো দু'টাকা। শুধু তো সই করবেন—'

মহা রেগে কালো চমড়ায় বেগুনী রঙ ধরিয়ে ফেললেন তিনি। এতো সস্তায় হয়না টয়না বলে, চেয়ার ছেড়ে বাইরে সিঁড়ির মাথায় গোঁসা করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। দালালকে বললাম, 'কার কাছে আনলেন এ! আমি যা বলছি সেটাই কিন্তু রেট। আমি আজ তিনবছর ধরে কোর্টে কোর্টে ঘুরছি মশাই।' বাড়ীউলীর দয়ায় কোর্ট-চরিত্র আমার মুখস্থ।

রাজী উনি হবেন-ই জানতাম। একটু বসে থাকতেই দালালটি ফিরে এসে বললেন, 'ও'কে তিনটাকা দিয়ে দিন। আর টাইপের খরচ আলাদা, যা লাগে দেবেন!' ওঁ স্বস্তিঃ!

সাড়ে বারোটায়ও যখন টাইপ কমপ্লিট হলো না, তখন দালাল ভদ্রলোক ছুটে এসে বলল, 'এর পর তো আর রীসিভ করানো যাবে না। এখনি ম্যাজিস্ট্রেট বসবে যে?'

—'তাহলে?'

—'আজকে টাইপ হয়ে থাক, কাল বরং করিয়ে দেব। আপনার এতো পাতা শীড্যুল—!' টাইপীস্টের ঘাড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম মাত্র চার পাতা উঠেছে। পড়ে দেখে মনে হলো, তের-চোদ্দপাতায় গিয়ে শেষ হবে। লোকটা এক নম্বরের ইয়ে! ইচ্ছে করলেই সীঙ্গল স্পেসে টাইপ করতে পারতো! এমন ফাঁক ফাঁক করে করছে, যাতে অনেকবার চাপানো যায়। যতবার চাপাবে ততো টাকা! মিঃ দে টিপে দেয়নি তো।

—'কিন্তু কালকেই তো উইটনেস দু'জন আসতে পারবেন না? শুধু বাবাকে নিয়ে আসতে পারি?'

দালালটি পোকা-খাওয়া দাঁতটি দেখিয়ে বলল, 'কাউকে আসতে হবে না! তিনটে এ্যাফিডাভিটের আর তিনটাকা ধরে দেবেন, আমাদের লোক দাঁড়িয়ে থাকবে। আপনি দেড়টা নাগাদ এসে নিয়ে যাবেন।'

শুনে আমি থ!

—'কিন্তু বাবাকে, আর দু'জন উইটনেসকে তো সইটা করাতেই হবে?'

—'আরে রেখে দিন! বাড়ী নিয়ে পরে সই করে নেবেন।'

—'বলেন কি, সেটা ঠিক হবে? ম্যাজিস্ট্রেট সই ছাড়া এ্যাফিডাভিট গ্রাহ্য করবে কেন?'

—'আরে আপনিও যেমন, চাড়েন তো! অতো দ্যাখার টাইম নেই কারো। আমাদের সব ব্যবস্থা আছে।'

বাবাকে বলতে, বাবা বললেন, 'দূর, সেইটা কি ঠিক হইব? কোন গোলমালে না পড়ি।'

দালালটি শুনতে পেয়ে বরাভয়-মুদ্রা করল! অগত্যা যে যার মত ফিরে গেলাম।

৪৫

তৃষিতের ঘরে বসে বসেই আরতির ঘন্টা শুনছি। কাঁশর ঘন্টা আর শাঁখের মিলিত ঐকতান, মানব লোক থেকে, নিজের অজান্তেই কখন দেবলোকে পৌঁছে দেয়। পুজো-বাড়ি ভাবটার কেমন শৈশবের স্মৃতিমাখা।

—'তোদের কি বিগ্রহ, রে?' পোষাক-পরিধানে রত তৃষিতকে জিজ্ঞেস করি।

পাঞ্জাবীটা মাথা দিয়ে গলিয়ে মুণ্ডুটা একটুখানি বের করে বলে, 'শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি, দেখিস নি?'

কিছু উত্তর দিলাম না। ও, তখন বোতাম এঁটে পকেটের রুমালে, ঘাড়ে গলার কাছে ওল্ড স্পাইসের সুগন্ধী বোতলটা উজাড় করছে।

আয়নার সামনে, চুলের ওপর একটা ফাইনাল শাসন জানিয়ে ড্রয়ার টেনে ছোট ওয়ালেট-টা পকেটে পুরে নিয়ে বলল, 'চ, ঠাকুর ঘরে।'

একটু ইতস্তত: করে বললাম, 'না-রে থাক।' তৃষিৎ যেমনই হোক, ওর বাবা, মা কিম্বা বাড়ীর আর কেউ এতে বিরক্ত হতে পারেন। ধর্মের সংস্কার তো সকলের সমান হয় না!

তৃষিৎ অবাক হয়ে বলল, 'কেন? কৃষ্ণমূর্তি দেখে যা, ভারী সুন্দর মুখ।'

বললাম, 'না, চল বেরিয়ে পড়ি, আরেকদিন দেখব। দেরী হয়ে গেল ওরা অপেক্ষা করে আছে।'

অন্যদিকে তাকিয়ে থেকেও বুঝলাম, তৃষিৎ আমায় লক্ষ্য করছে। ও চট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তৃষিতের বাবা ঢুকলেন। পরনে সিল্কের ধুতি, কণ্ঠে উপবীত কপালে তিলক। ব্যস্ত-ভাবে আমায় ডাকলেন, 'এসো, এসো কখন এলে?'

অতবড় পার্সোনালীটির সামনে আর কথা বলার উপায় থাকে না। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই। বেশ বড় পূজার ঘর। নিঃস্তব্ধ। আমি দোর-গোড়ায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই থেমেছে পুরোহিতের ঘণ্টা? থেমেছে কাঁসর, সেই সাথে থেমে গেছে শেষ ফুৎকারে বেজে ওঠা শঙ্খ। ধুনোর আবেশে সুগন্ধ বাতাসে 'নিদ্রা' দেয়া হয়েছে বিগ্রহকে। ধূপের ধোঁয়ায়, দুটো জিনিসই প্রতিভাত। একজোড়া ভুবন-ভোলানো আঁখি। দ্বিতীয়টি, বাঁশি। এমন জীবন্ত চাউনী, আমি কোন পাথরের মূর্তিতে দেখিনি কখনো। ধোঁয়া কেটে

যেতে দেখলাম, সম্পূর্ণ অবয়ব। অঙ্গে-অঙ্গে বেজে ওঠে বাঁশি! আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তাঁর হাতের বাঁশিটা বাজছে! বসন্ত রাগে!

ঘর ভর্তি গুঞ্জনে তন্ময় ভাবটা কেটে গেল আমার। যাঁরা মাথা নীচু করে এতক্ষণ জানাচ্ছিলেন তাঁদের অন্তরের ভক্তি। তাঁরাই বাস্তবে এসে যে-যাঁর সাংসারিক কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

—'তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এস, কাছে এসে দেখ।' তৃষিতের বাবা কি ভুলে গেছেন আমি বিধর্মী? এতো অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটা! ঘরটা এখন প্রায় ফাঁকা। তৃষিতের মা, রত্নপ্রদীপটি নিয়ে এসে আমার সম্মুখে ধরলেন। অভ্যস্ত হাতে প্রদীপ শিখা স্পর্শ করে, বুকে আর কপালে ঠেকালাম। উনি একটু হেসে, ভেতরে ঢুকতে বললেন। তৃষিতের বাবা সবাইকার হাতে চরণামৃত ঢেলে দিচ্ছিলেন। ফিরে আসার সময় আমার কাঁধে হাত রেখে, আমার দ্বিধায় ঘেরা দেহটা ঠেলে নিয়ে একদম বিগ্রহের সম্মুখে বসিয়ে দিলেন। নিজেও পাশের আসনে বসলেন। বললেন 'তোমার ভাল নাম তো রহিমীয়ার তাই না?' আমি আড়ষ্টভাবে ঘাড় নাড়লাম।

—'তাহলে তোমার মনে এতো দ্বিধা কেন রহিমীয়ার, তুমি তো ঈশ্বরের পরম সুহৃদ।'

একটু হাসলাম। বললাম না, আপনার মত সবই এমন নয়, কাকাবাবু! বললাম, 'না, দ্বিধা নিজের জন্য নয়, দ্বিধা আপনাদের জন্য'। বললাম, 'রাধা নেই— ?'

উনি সহাস্যে বললেন, 'আছে, আছে, চেয়ে দেখ, ভাল করে দেখ, রহিমীয়ার—দেখতে পাচ্ছ ?'

হ্যাঁ আমি দেখতে পেয়েছি! আশ্চর্য ভাস্কর্য এ! মূর্তির বামদিক শ্বেতপাথরে নির্মিত। বাঁ-হাত স্ত্রীলোকের। শ্রীরাধার! দক্ষিণদিকের সমস্তটুকু শ্যাম-দূর্বাদল শ্রীকৃষ্ণের।

—'রাধা, কৃষ্ণ-ভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণে-ই বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। যে-ই কৃষ্ণ, সে-ই রাধা; যে-রাধা, সে-ই কৃষ্ণ।' কাকাবাবু তখন বলে চলেছেন, 'নিজের লীলা-খেলার সঙ্গী নিজেই সৃষ্টি করেন ঈশ্বর, নিজেই বিভক্ত হন। ঈশ্বর একক। তাঁর দ্বি-রূপ চিন্তা, পার্থিব।' আমি শুনছি। আর দেখছি। বাঁশির শব্দটা যেন আবার শুনছি! অনেক দূর থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ সুর! মনে হচ্ছে চারদিকের এই পার্থিব হট্টগোলটা থেমে গেলেই আরও স্পষ্ট শুনতে পাব সুরটা! আমার কি মনের ভুল! পরিস্থিতিটা কি আমকে ভুল শোনাচ্ছে! হয়তো সত্যি-সত্যিই আশেপাশের

বাড়ীতে কেউ বাঁশি বাজায়। তাওতো হতে পারে!

—'রাজা চল্ যাবি তো?' তৃষিতের কণ্ঠে, চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াই। শচীদের বাড়ী যাচ্ছি. বাবা, তোমার কিছু বলার আছে?'

কাকাবাবু বললেন, 'না। আমার আর কি বলার থাকবে! ওর মাকে আমার নমস্কার জানাবে। শচীর বাবা বড় ভক্ত ছিলেন। দাদা পায়ে স্থান পেলেন, আমি পেলাম না-।' ঘরে কাকীমা ঢুকলেন চোখে-মুখে একটা তৃপ্তির প্রশান্তি।

— আসি কাকাবাবু —?' বলে ঠাকুর-ঘর থেকে বের হতে যাব, উনি, বললেন,

—'তুমি তো কিছু বললে না? কেমন বিগ্রহ-মূর্তি আমাদের?'

হেসে বললাম, 'আমাদের বাড়ীর বিগ্রহ তো লক্ষ্মী নারায়ণ শিলা, তার কোন কল্পনার রূপ নেই। এমন কৃষ্ণ মূর্তি, এমন যুগল মূর্তি আমি জীবনে কোনদিন দেখিনি! অপরূপ সুন্দর! যেন কথা বলছে।'

—'কথা বলছে!' হেসে উঠলেন কাকাবাবু। ইতস্ততঃ করে বের হতে যাব, উনি বললেন, 'আর কি, বলতে গিয়ে থেমে গেলে কেন. বল?'

লজ্জিত ভাবে বললাম, 'না, অন্য কথা। পাশের বাড়ীতে কেউ কি বাঁশি বাজায়—?'

—'বাঁশি! কই জানি না তো। কে বললে?' তৃষিৎ-ও কেমন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

হেসে বললাম, 'ও. তাহলে আমার মনের ভুল।'

—'মনের ভুল। মানে? কবে শুনলে?' গম্ভীর প্রশ্ন কাকাবাবুর।

—'আপনি যখন আমায় ঠাকুর ঘরে ডেকে আনলেন। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা বাঁশির আওয়াজ শুনতে পেলাম। বসন্ত রাগে আলাপ করছিল কেউ।'

—'বসন্ত রাগ!' চীৎকার করে উঠলেন কাকাবাবু! বিস্ফারীত নেত্রে প্রকম্পিত দেহটা টেনে এনে আমাকে পরম স্নেহে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমি—তুমি, শুনলে সে ধ্বনি?' তারপর অতবড় পারসোনালিটি-সম্পন্ন মানুষটা, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। কপালে করাঘাত করতে করতে বললেন, তুমি শুনলে রাজা? আমি—হতভাগা আমি, আজ পর্যন্ত এতো মনপ্রাণ ঢেলেও তো কই শুনতে পেলাম না—আমি গত জন্মে কত পাপ করেছি ঠাকুর—একটু তোমার বাঁশির প্রসাদ পেলাম না। কি হতভাগ্য' উনি মাটিতে বসে কাঁদছেন আর কপালে আঘাত করছেন! কাকিমার চোখে জলের ধারা! নির্বাক। দৃষ্টি কৃষ্ণমূর্তির দিকে নিবদ্ধ। তৃষিৎ

নিশ্চল! আমি— ?

তৃষিতের বাবার মত ভক্ত আমি আরেকজনকে দেখেছিলাম। তিনি আমার মাতামহ।

কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারছি না ধীরে বললাম, 'কাকাবাবু, এ হয়তো আমার মনের ভুল, কাকাবাবু!'

—'ভুল। অসম্ভব।' ছুটে এসে আমার দু'গালে চুমু খেতে খেতে বললেন, 'তুমি ঈশ্বরকে পেয়েছে রাজা। তুমি পরম ভাগ্যবান। তুমি তো শুনবেই সে বাঁশির ধ্বনি। তুমি-ই যে তাঁর বন্ধু-সুহৃদ্‌। তুমি যে রহিমীয়ার!'

একটু থেমে আমায় ছেড়ে দিয়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। কথা বলে চলেছেন যেন, কোন যুগ থেকে ভেসে আসছে সেই কথা। 'আমার প্র-পিতামহ এ-বিগ্রহ স্বপ্নে পান। আমার ঠাকুর্দা-ও এঁর সাথে কথা বলতেন রাজা! বাঁশির ধ্বনি তিনিও শুনতেন! বসন্ত রাগেই সে সুর বাজতো তাঁর কানে! তোমার শুনতে কোন ভুল হয় নি। কোন ভুল নেই তুমি সন্ন্যাসী বংশ সম্ভূত, আমি জানি। তুমি নিজে যে তাঁর সখা।' উনি কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। কাকিমা ওঁর কানের কাছে বিড়বিড় করে কৃষ্ণনাম করতে লাগলেন। ওঁর কোন বাহ্যিক চেতনা দেখলাম না। এই কি সমাধি-অবস্থা? এই মুহূর্তে উনি ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হয়ে গেলেন? সমাধিস্থ মানুষ আমি এই প্রথম চাক্ষুষ দেখলাম!

৪৬

তৃষিৎ আমার হাত ধরে বাইরে-রাস্তায় নিয়ে এসে বলল, 'বাবা এই নিয়ে তৃতীয়বার সমাধিস্থ হলেন। বাবার গুরু এসেছিলেন। সেই প্রথম! গত দোল পূর্ণিমার দিন-ও বাবা সমাধিস্থ হলেন। মা, কৃষ্ণনাম শোনান, তাতেই সমাধি ভেঙে যায়। কিছুক্ষণ কাউকে চিনতে পারেন না। মা হাত ধরে বিছানায় শুইয়ে দেন। পরদিন সব আবার ঠিক হয়ে যায়।'

৪৭

নিশ্চুপ বসে তৃষিতের কথা শুনতে-শুনতে ট্যাক্সিটা শচীকান্তর বাড়ীর ফটকে ঢুকল। তৃষিৎ বিল মিটালো! সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। 'বেংসী' দৌড়ে এলো। চেনা গন্ধ পেয়ে, ল্যাজ্‌ নাড়তে নাড়তে ফিরে

২৮

গেল ; মালেকানীকে খবর দিতে বোধহয় !

সহাস্য অ্যাপ্যায়নে আমাদের নাম এ্যানাউন্স্ করতে করতে ড্রয়িংরুমে নিয়ে এলেন সুলগ্না বৌদি।

শচীকান্ত পাজামা-পাঞ্জাবী পরে, সেন্টার রেস্টে পা তুলে দিয়ে একটা ইংরেজী নভেল্ পড়ছে। ঘরের কোণে ইকাবেনার সজ্জা পাল্টাচ্ছেন সু-বৌদি।

—'এই তোমাদের সন্ধ্যেবেলা এসে অড্ডা দেয়া ?' এক ধমক লাগায় শচী।

তৃষিৎ কাঁচুমাচু হয়ে বলে, 'এঃ, কি করবো, এমন আটকে গেলাম। আর রাস্তাও তো অনেক দেরী করল আসতে।'

—কি হে, তুমি কি করলে ? কাস্টোডিয়ান্ কতদূর ?' প্রশ্নটা আমার উদ্দেশে সন্দেহ নেই। তোমার হয়েছেটা কি ? খুব আনমাইণ্ডফুল্ দেখছি !'

সুলগ্না বৌদিও কথাটায় সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, কিছু একটা হয়েছে ! শরীর খারাপ নয় তো। না-কি অফিস করে ক্লান্ত ?'

এতক্ষণের অব্যক্ত মুহূর্তগুলো জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললাম, —'না। অফিস তো ঠিক, ছিল না। ম্যানেজমেন্ট্ মিটিং ছিল। বোরিং। সেটা ভাঙতে দৌড়লাম রাসবিহারী এ্যাভিন্যু—পোস্টাফিসে। আজ রাত আটটায় রেজেস্ট্রীটা হয়ে গেল।'

—'কাস্টোডিয়ান্ ?'

'হ্যাঁ। এ্যাফিড্যাভিট্গুলো পাঠিয়ে দিলাম। এখন কবে তোমার কল্ আসে দেখি।'

সোল্লাসে শচী বলল, 'যাক্ নিশ্চিন্দি। ও কল্-এর জন্য ভেবোনা। তুমি ফরেস্ট শীড্যুল্, যে করে হোক যোগাড় কর খুঁজছো তো ?'

—'হ্যাঁ। রীজার্ভড্ ফরেস্টের শীড্যুল্ আমার মেইন্ বিল্ডিং-এ। জানিনা তো কোন ভল্যুম্-এ। তাই টুয়েন্টিসেভেন্-এর জানুয়ারী থেকেই ধরেছি। এতোগুলো করে পার্ট—বড্ড স্ট্রেনুয়াস্ লাগে !'

—'আরে, না, না—' শচী বলে 'সব পার্ট্ দেখার দরকার নেই. শুধু পার্ট্ ওয়ান্ দেখে যাও। শীড্যুল্ ওতেই পাবে।'

বললাম, 'হ্যাঁ। দেখতে দেখতেই শিখে ফেললাম ; কোন্ ভল্যুম্-এ, কি থাকে। লিফটে বইগুলো উঠে আসতে দেরী হচ্ছিল। দু'ঘন্টায় দুটো ভল্যুম্ এলো। রীডিং-রুমের মিঃ সমাদ্দার আছেন না ? চেনো ?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই ধুতি-পাঞ্জাবী পরেন তো ? থুৎনীতে হোয়াইট্

স্পটস্‌ আছে তো ?'

আমি ঘাড় নেড়ে যাচ্ছিলাম। ও বলল, 'বেশ অমায়িক এবং রীয়েল্‌ জেন্টল্‌ম্যান্‌ !'

বললাম, 'হ্যাঁ। খুব কো-অপারেটিভ্‌। এতো ভাল না ! বললাম আমার এই নোটিফিকেশনটা খুঁজতে অনেক সময় লেগে যাবে। যদি অনুমতি করেন, আমি নিজেই র‍্যাক্‌ থেকে নাবিয়ে ফের রেখে দিয়ে আসবো ? উনি তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন। আমি তো এখন নিজেই নামাচ্ছি মই বেয়ে, বেয়ে, আবার তুলেও রেখে আসছি। ঘন্টায় তিন-চারটে বই দেখে ফেলছি !' আসলে ঢাকা-গেজেট্‌ দেখে দেখে চোখ সেট্‌ করে ফেলেছিলাম। কোন নোটিফিকেশনের পর কোনটা কিভাবে থাকে, সেটা অভ্যস্ত চোখে ঠিক ধরা পড়ে যাচ্ছে। পাতা ওল্টানোয় গতি এসে গেছে খুব।'

—'তুমি এ্যাক্ট্‌টা কোন উকিলকে ধরে পড়িয়ে নাও, আগে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, রীজার্ভড্‌ ফরেস্ট্‌ ভেস্টেড হয়ে যায়। আগে ওটা দেখিয়ে নিলে পারতে, হে।' শচী খুব সন্দেহের কথা জানায়।

—'দ্যাখাবো। নিজে পড়ে তো মনে হয় মালিকানা আছে।'

—'আছে ?' শচী বলে, 'কোথায় পেলে !'

বললাম, 'প্রথম ভল্যুম্‌-এই কোন পার্টে যেন ; সিক্সটিন্‌ অব, টুয়েন্টি সেভেন্‌-এর সবকটা ক্লজ-এরই এক্স্‌প্লানেশন্‌স্‌ আছে, দেখলাম !'

প্রসঙ্গান্তর ঘটল সুলগ্না বৌদির ধমকে, 'তোমার ওই এক দোষ বাপু, কাউকে পেলেই, কাস্টোডিয়ান্‌, কাস্টোডিয়ান্‌ আর কাস্টোডিয়ান, পাগল করে দিলে দেখছি ?'

তৃষিতের সেই গল্পটাই, এরপর কেন্দ্র হয় আলোচনার। আমি যে স্কেলিটন্‌টা সেদিন উপহার দিয়ে গিস্‌লাম, তার ওপর নিখুঁত শিল্পীর মত রক্তমাংস লাগিয়ে, মসৃণ ত্বক্‌-এর প্রলেপ দিয়ে, একটা সত্যি-ই ভাস্কর্য দেখাল তৃষিৎ ! ওর বলার ধরণটা, ওর লেখার ধরণ থেকেও সুন্দর।

—'কিন্তু, ছাপাল না কেন ?' শচীরই প্রশ্ন।

—'জানিনা, সাগর গঙ্গোর কথামত ; কথা পাল্টে দিলে হয়তো কাগজে নামটাই বের হতো, কিন্তু, কিছুতেই ওই ট্রীট্‌মেন্ট্‌ থাকতো না। আমার মনে হয়, গল্পের এফেক্ট্‌টাই নষ্ট হয়ে যেত।'

—'হ্যাঁ, সে তো যাবেই !' সুলগ্না বৌদি ওর হয়ে রাগটা ফোটান।

—'ভাগ্যিস্‌ তৃষিৎ-ঠাকুরপো ওদের কথা শোনেন নি। এরা নিজেরা লেখক হয়ে কি করে যে অন্যের গলা টিপে মারতে পারে, বুঝতেই পারি না !'

পরম ক্ষোভে কথা কটি বললেন সুলগ্না বৌদি।

শচীকান্ত এতক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'এভাবে হবে না। দাঁড়াও আমি বুদ্ধি বাৎলাচ্ছি!' আমরা উৎসুক নেত্রে ওর দিকে তাকিয়ে! ও বলল 'তোমার লেখাটা বা অন্য কোন পছন্দসই একটা কবিতা আমাকে দাও।'

একটু থেমে কি ভেবে বলল, 'আচ্ছা স্বাধীন-বাজারে সাধারণতঃ কারা বেশী গল্প কবিতা দেয়, নাম বলতো!'

—'সেটা আর উনি বলবেন কি, আমি-ই বলে দিচ্ছি—' এই বলে সুলগ্না বৌদি নিজেই একধারসে অষ্টোত্তরী শতনাম বলে যেতে থাকলেন। মডার্ণ কৃষ্ণেন্দু থেকে কবিতা রায়। কেউ বাদ গেল না তাঁর লিস্ট থেকে।

—'ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়, হো যায় গা।' শচী হাসতে হাসতে বলে, 'দু'মাসের মধ্যেই তৃষিতের লেখা স্বাধীন বাজারে বের হবেই।' এমন জোর দিয়ে বলল কেন?

তৃষিং কেমন কিন্তু কিন্তু করে বলল, কোন হিউমিলিয়েশন্ বা অন্য?'

ওর কথায় বাধা দিয়ে শচী বলল, 'দূর! তাহলে করতামই না। বরং বলতাম নিজের পয়সা খরচা করে ছাপাও। এ একেবারে অরিজিন্যাল্ টেক্‌নিক্।'

ওখানে খাবার কথা, তৃষিং আমায় আগে বলে নি।

সুলগ্না বৌদির হাতের সুস্বাদু রান্নাগুলো কোনটাই ফেলে উঠতে পারলাম না। মনে মনে যদিও মায়ের বকুনির কথা স্মরণে আসছিল। বাড়ীর ভাত নষ্ট করলে মা খুব রাগ করেন।

রাত সাড়ে দশটায় ওদের বাড়ী থেকে বের হলাম। শেষ পাঁচ মিনিটে; স্বাধীনবাজার ফেরৎ একটি স্বরচিত কবিতা, তৃষিংকে লিখে দিতে হয়। শচী কিছুতেই ওর কপিরাইট টেক্‌নিক্‌টা ডাইভাল্‌জ্ করল না।

৪৮

এ কদিনের পরিকল্পনা, চিন্তা ভাবনার যেন একটা কমা, সেমিকোলন্, ছিল না! এ্যাফিডাভিট্‌টা পাঠিয়ে বেশ একটা নিশ্চিন্দি লাগছে! যে কটা ডকুমেন্ট্ পেয়ে গেছি, তা দিয়েই আমার কেস্‌টা চমৎকার দাঁড়ায়। যদি ফরেস্টের শীড্যাল পাই তো, সোহাগায় রঙ্! ওদিকে ধীরেন বাঁসদা চিঠি লিখেছে কম্‌পেন্‌সেশন্ রোল্-এর ইন্‌ফরমেশন্ স্লিপ যোগাড় করে

ফেলেছে। পাঠাচ্ছে।

প্রতিদিন এখন, লেটার-বক্স্টা সব কন্সেন্ট্রেশন্ কেড়ে নিচ্ছে। পিওন্ হয়ে উঠেছে ভি. আই. পি। সত্যি কথা বলতে কি, পোস্টাল্ পিওনকে, এমন আত্মীয়, আর কখনো মনে হয় নি!

যদিও বাবা আমাকে পাওয়ার অব্ এ্যাটোর্নী দিয়েছিলেন এ কাজের গোড়ায়। এখন কিন্তু এতগুলো সাজানো ডকুমেন্ট্ দেখে, বেশ একটা আত্মপ্রত্যয় লাভ করে ফেলেছেন। নিজেই নিজের কেস্টা রীপ্রেজেন্ট্ করার, নার্ভ্ পেয়ে গেছেন।

ক্যাল্কাটা গেজেটের পাতা উল্টে যাচ্ছি; ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন। রীজার্ভ্ড্ ফরেস্টের নোটিফিকেশন্স্ চোখে পড়ল, বার-চারেক। প্রথমটি রাজা জগৎকিশোরের, দ্বিতীয়টি, রণভাওয়াল, তৃতীয়টি সিলেটের রাজার। এখন পর্যন্ত সর্বশেষ ফরেস্ট্টি চোখে পড়ল সেটি সুসঙ্গ-এর রাজাদের। কিন্তু যা খুঁজছি তার পাত্তা নেই।

৪৯

প্রতিটি ভল্যুম্ খুলি, আর মনে হয়, এর পরেরটায় নিশ্চয়ই সোমেশ্বর স্টেট্ পাবো। কুহকিনী আশা, এইভাবেই খাটিয়ে নেয় আমাকে। এই করে বিয়াল্লিশ সাল শেষ হলো। বিয়াল্লিশের মন্বন্তর এর কিছু সাক্ষ্য কি করে এই ভল্যুম্টাতে রয়ে গেছে। সযত্নে রক্ষিত ক্যাল্কাটা গেজেটের মধ্যে এটিরই কেন শুধু বিধ্বস্ত দশা? ঢাকা গেজেটে একটা বোটকা গন্ধ ছিল। শুকনো গো-মাংসের মতন। ক্যাল্কাটা গেজেটের সাদা ফাঙ্গাসে আঙুল পিছলে যায়। এ দিকটা যাঁর নজর দেবার কথা তিনি শ্বশুরবাড়ী গেছেন। ফিরতে নাকি দেরী আছে। গেজেটের র‍্যাক্ ছাড়িয়ে টয়লেটে হাত ধুতে যাই। একটুকরো সাবানের অভাবটা খুব-ই বোধ করি। নিজের আঙুলের গন্ধে নশিয়া হয়।

চীপ্ ক্যান্টিনে খেয়ে নিয়ে ফের বই-এর ব্যূহ ভেদ করে চলি। ঘাড় সোজা করে, মাঝে মাঝে শিরদাঁড়ার ব্যথাটা উপলব্ধি করে নিই। আর তখনই চোখে পড়ে, রেফারেন্স-বই থেকে কপি করে নেওয়া কিছু ছাত্র-ছাত্রীদের। এদের সবাই যে খুব এ্যাটেন্টিভ্ তা ঠিক নয়। কেউ কেউ বই-এর আনাচ-কানাচ দিয়ে উঁকি মেরে 'টু-কি, —ধা',—খেলছে। তেমন তেমন ছাত্রী, তেমন তেমন ছাত্রকে এক দৃষ্টিবাণে কাৎ করে ফেলছে! তাজ্জব্ কী বাৎ! কাউকে প্রথম দিনে, কাউকে দ্বিতীয় দিনেই গ্র্যাব্ করে ফেলে, রীডিং-রুম থেকে

ক্যান্টিনে, ক্যান্টিন থেকে ছায়া-ঘেরা মাঠে, এবং অতঃপর চিড়িয়াখানায় সিটিং হতে দেখা যায়। সুন্দরী পাঠিকা রাগ করবেন না। আপনাদের দিক থেকেই ঝুঁকিটা বেশী দিতে দেখলাম যে! আমার কথা বিশ্বাস না হয়, একদিন আসুন না। সতেরোর-এ বা এক নম্বরে? একটু কষ্ট করলে, তিন বা তেত্রিশে-ও গোপাল নগরের মোড়ে নেবে, বেলভেডীয়র-টুকু না হয় হাঁটলেনই! পুষিয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। চাই কী, তেমন তেমন কেউ জুটেও যেতে পারে! আর আপনাদের ত্রিনয়নের কটাক্ষে, এক-আধটি অবলা পুরুষকে কি আর— ?

৫০

দিন পনেরো সুপারভাইজারী ট্যুর দিয়ে এলাম গৌহাটী থেকে। অফিসে রীপোর্ট করেই শুনলাম, কদিন থেকেই কে একজন আমায় চাচ্ছেন। গুছিয়ে বসার আগেই ফোনটা আবার এলো।

—'চৌধুরী সাব্, আপ্‌কা কল্' নতুন বাঙালী টেলিফোন অপারেটর, মিস তাপ্তি গুপ্তা তার স্বভাবসিদ্ধ অবাঙালী উচ্চারণে ঘোষণা করল।

বললাম, 'হাউ আর ইউ নটি গার্ল' ?'

মিস্ গুপ্তা আর্টিফিশিয়াল্ হাসির শব্দ করে বলল, 'ফাইন্ থ্যাঙ্কু। শ্যাড্ আই রীং হিম্ ?'

—'ইফ ইউ প্লীজ সুইট হার্ট !' ওর আসার পর থেকেই সবাই ওর পেছনে লাগি। এম পরদীপ তো প্রথমদিনই ওকে সবার সম্মুখে প্রোপোজ করে বসেছিল! মেয়েটি খুব চট করে রেগে যায়। আর রাগলে ওকে আরও সুন্দর লাগে! ও বলেছিল 'আমি ট্রান্সফার চাইবো।'

ফোনের ওপার থেকে ভেসে এলো মাতুলের দন্তজড়িত কণ্ঠস্বর।

—'ছিলি কোথায় এতোদিন? ধীরেন এসে বসে আছে আজ সাতদিন তোর পাত্তা নেই—তোর সঙ্গে কি কথা আছে—ও আজ-ই ক্লোজ করে কাল সকালে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশ—তুই আসবি ?'

সবগুলো প্রশ্নের পরপর উত্তর দেয়া যায় না। স্কোপও অবশ্য পেলাম না। শুধু বললাম, 'ওকে আটকান।'

মাতুল বললেন, 'কি কস ? মাউথ পীসে মুখটা নিয়া ক।' রেগে গিয়ে দেশের ভাষা বের হয়।

বললাম, 'আটকান, আটকে রাখুন, যাচ্ছি।'

মাতুল বললেন, 'কি ? টাকা ?'

বললাম, 'না, না—'

মাতুল বললেন, 'কি কাকা, নানা, কইতাসস, বুঝিনা ?'

আর না পেরে বললাম, 'ওরে ডিগড়া দিয়া থন। যাইতাসি।'

অবশেষে মাতুল বললেন, 'ও !' ফোনটা কেটে দিলেন। ঘরের আর ক'টা টেবিলের বাসিন্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখি, তারা কানে আঙুল দিয়ে শিবনেত্র হয়ে রয়েছে। ফোনটা রাখতে শৎপথী বললেন, 'থেমেছে !'

আমাকে এতো চাঁচাতে হচ্ছিল। ওরা ঠাট্টা করবেই।

ওরা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে আমার টেবিল ঘিরে ঘন হয়ে বসল। অবাক তাতে হইনি, অবাক হলাম পরদীপের কাণ্ড দেখে। ও নিজের চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় বাহিরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বসল।

—'কি হলো ? সামথিং ফিশী ?' কথাটা বলেই ফেলি।

—'চিঠি পেয়েছ তো ?' ভট্টু সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করল।

—'চিঠি ! কিসের চিঠি ?' ভাবলাম কোন স্পেশাল্ ইন্‌ক্রিমেন্ট হয়েছে হয়তো। স্বাভাবিক সময়টা অগাস্ট্ !

—'আমরা সবাই যে চিঠিটা পেয়েছি।' ভট্টুর নিরুত্তাপ কণ্ঠ। আমি জলে !

—'হলোটা কি ? হে'য়ালী কেন বাবা ? খুলে দেখাও না ?'

বিজয় শত্‌পথী, এম পরদীপ্ এবং ভট্টু একই সাথে, একই রকম হাতে লেখা একই বক্তব্যের তিনটে চিঠি খুলে, আমার টেবিলে রেখে, তাদের বুকে তিনটে পাথর চাপা দিল।

একনজরেই কথা কটা পড়ে নিয়ে বললাম, 'টেন্‌শন্ ?'

ওরা তাকিয়েই আছে। বললাম, 'আমি মনে মনে, কেন জানি এটাই এক্সপেক্ট করছিলাম, কিছুদিন। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না, চিঠিগুলো মেডিক্যাল্ রেপ্-দের না লিখে, একধাপ ওপরে আমাদের উদ্দেশ্যে লিখল কেন ?'

বিজয় বলল, 'তুমি কবে পেয়েছ চিঠিটা ?'

—'এখনো তো পাইনি। তবে তোমরা যখন পেয়েছ, আমি বাদ যাব না নিশ্চয়ই ?'

ভট্টু চিন্তিত ভাবে বলল, 'ফাক্টরীতে আবার রঙীন ঝাণ্ডা ফিরে এসেছে।'

শুনেছিলাম, মাঝের বছর কয়েক কং-শাসনে যদিও ইউনিয়ন থেকেছে। কিন্তু তলে তলে 'এম্' ঠিকই কাজ করে চলেছিল। আজ ক্ষমতায় ফিরে এসেছে, হাওয়ার গুনে। স্টেট্ মিনিস্ট্রিতেও তাই।

বললাম, 'কাগজ দেখে তো মনে হয় না, ওই পথে ওরা যাবে। নীতি তো পাল্টেছেই, কালের আবহাওয়ার নতুন আইডিয়াও আছে হয়তো।' সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ি। হাতে ধরা, ভাঁজ করা চিঠি, তিনটে।

৫১

মাতুলের অফিসে পৌঁছতে একটু দেরী-ই হয়ে গেছে। অফিসের স্টাফ সব চলে গেছে। দারওয়ান বশিষ্ঠ সিং; চাবির বাণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে, চোখে বিরক্তি। আমায়, এ অসময় দেখে আরও চটে গিয়ে পাশের অফিসের টুলের ওপর গিয়ে বসে থাকল।

মাতুলের ঘর থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই দেখে ভাবলাম মিঃ র্যাসু হয়তো চলে গেছেন।

—'টনিক'ত দিল্যান্ না— .' কাতর কণ্ঠ শুনে আশান্বিত হলাম।

—'হ্'্যা, গতবার ছিল না। এখন আছে, নেবেন কিসে ?'

আমার কাগজ এনেছে কিনা, কে জানে ? পাশের জরাজীর্ণ চামড়ার পোর্টফোলিওটার দিকে ইঙ্গিৎ করলেন। স্যাম্পল্ কটা নাবাতে চট্ করে সেগুলো ব্যাগস্থ করে বললেন, 'আফ্নাগোর তিনশ' পঁচাওর বিঘার কুন ঠিকানা পাইলম না — । খুঁজ্ছি কম্ না। হ্যার্ লাইগ্গা কিসু কইল্ দ্যাওন্ লাগ্বো— ।' পাওনা-গণ্ডা সম্বন্ধে খুব শেয়ানা।

বললাম, 'ফরেস্ট ?'

—'এই তো, এইডা পাইসি, দ্যাখেন্ চলবো কিনা।'

এটা গেজেটের পাতা! পৃষ্ঠা না মিলিয়ে ছিঁড়ে আনা হয়েছে। বোধহয় ঘরে কেউ ঢুকে পড়েছিল, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে প্রথম পৃষ্ঠা আর দুটো বাদ থেকে গেছে। মৌজাগুলোর নাম দেখে চমকে উঠলাম। রীজা-ভ'ড্ ফরেস্টের শাঁডুল্! যা আমি এতোদিন খুঁজছি! যে আইনে নেয়া হয়েছে, তার বয়ানটা আগের পাতায় রয়ে গেছে। তারিখ দেখলাম সিক্স-টিওয়ান! এবং গেজেট্টা ক্যাল্কাটার নয়, ঢাকার! এতোদিন পণ্ডশ্রম হয়েছে শুধু, শুধু। এতো দেরীতে নোটিফিকেশন বের হয়েছিল কেন বুঝলাম না। এতো বৃটিশ আমলের ঘটনা।

এরপর যে দুটো কাগজ, আমার হাতে ধরিয়ে দিল, তার একটি ইন্কর্-মেশন্ স্লিপ, অন্যটি বিল্। হিসাব দেখে তো আমার চক্ষু আতাগাছ! ঢাকা যাওন্, হোটেল, অটো-রিক্সায় সেটলমেন্ট অফিসে দুইদিন যাতায়াত, গেজেটের পৃষ্ঠার মূল্য (বাহান্ন টাকা পঞ্চাশ পঃ) !! এর পরেও খাইখরচা,

কুলি গেজেট্ কাবী করার জন্য ?) ঢাকা হইতে ফিরা, এবং সবশেষে বাংলাদেশ থেকে কলকাতা যাতায়াত বাবদ দুশো আশি টাকা। সাকুল্যে— এগারোশো টাকা পাঁচ পয়সা!

এতক্ষণ নিশ্চুপ মতুল, সারাদিনেব সযত্নে জমিয়ে রাখা কাজ শেষ করে চলেছেন। খুশ গম্ভীর ধীরেন যাঁসুর সাথে মনোমালিন্য হয়ে থাকবে!

কোন কথা না বলে, মাতুলকে বিলটা এগিয়ে দিলাম। উনি ওটা এক-ঝলক দেখেই ঠোঁট বাঁকালেন। খুব চাপা স্বরে বললেন, 'এই গেজেটটা লাইব্রেরীতে তো আছে। এটা ওব কাছ থেকে নিবি কেন কাট।'

বললাম, 'আছে, দেখেছেন?'

উনি উত্তব না দিয়ে বললেন, 'সবাইকে ওই কলকাতা যাতায়াত চার্জ করে যাচ্ছে। তুই কথা আরম্ভ কর, আমি এগুলো শেষ কবে নিই। আমার তো কোন কাগজ-ই আনতে পাবে নাই—এইটা বাইর হইলে বাঁচি।'

—'আপনার সঙ্গে দেনা-পাওনা মিটে গেছে?'

—'হ্যাঁ আমি কেটেকুটে একটা দিয়েছি, কান্নাকাটি—ফুঃ।'

এরপর আমি মি: যাঁসুকে নিয়ে পড়লাম।

—'সবাইকেই বাংলাদেশ-কলকাতা দেখাচ্ছেন যে। এ টাকাটা আমি দেবো না।'

-'এঁ! এ্যা! হেই—হেইডা হইতে কেম্‌তে চলবো? তাইলে আমাব কাম্ কইরা কি লাভ! কান্নায় জর্জরিত দেহটা দুম্‌ড়ে দুমড়ে উঠছে।

বললাম 'আমি তো সেল্‌সে কাজ করি? আমার হাত দিয়ে আটটা টি এ বিল পাস হয়। কি করে টি-এ বিল ফোলাতে হয় আমার মত আপনিও জানেন না। গেজেটের পাতা কাটা দরকার নেই ওটার টাকা পাবেন না।' কথা বলছি, আর লাল পেন্সিল দিয়ে এক একটা আইটেম কেটে দিতে থাকলাম। ওর চোখ দেখে মনে হচ্ছিল, ওর পিঠে বোধহয় চাবুকের দাগ পড়ছে।

—'খুঁজনের দামটা দিবান্, তা ছাড়া……'

আমি বলে চলেছি 'তাছাড়া, আপনি ওটা তো উমাপুরের বিনুর জন্যই এনেছেন। তার নামটা দেখেই এমন ভাবেই ছিঁড়েছেন, যাতে ওর মৌজাগুলোই ঠিক থাকে। এর আগের আর পরের অন্ততঃ আরও তিনটে পাতা আনলে আমারটাও থকতো?' ঠিক কথাটা কি করে জানলাম বুঝতে না পেরে লোকটার গ্যাসট্রিক পেইন স্টার্ট করল বোধহয়! 'আপনি এনেছেন শুধু ইনফরমেশন স্লিপ। সেটার দাম তো শচীকান্ত স্যান্যাল মশাই-এর ওখানেই ঠিক হয়েছিল। তাই পাবেন।'

২৯

—'ত্যা কেমতে হয় ?' করুণ আকুতি।

—'শচীকান্তর সামনে সেদিনই কথাটা বলতে পারতেন।'

—'এগ্রিকালছারাল ল্যান-ডা ও, ত, খুঁজতে হইসে ? হেইডা তো কম কষ্টের না ? তারও তো একটা পারিশ্রমিক ধরব্যান ?'

—'আপনার হিসাবে তো ওটার উল্লেখ-ই নেই। আর-ও-আর আনলে ঠিক-ই নিতাম। সবার জন্য পাতা ওল্টাচ্ছেন, আমারটা চোখে পড়েনি—এর আবার পারিশ্রমিক হয় নাকি ?'

—'আফ্‌নার কাম কইড়া দেখি, আমার সবি লছ !' লোকটা একেবারে চুপসে যায়। মায়া হয়। কিন্তু কি করবো ! একটা ইনফ্‌রমেশন স্লিপের জন্য ওর খরচা হয়েছে তিন টাকা নিচ্ছে তিনশোর বেশী। আর কত দেব !'

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় উনি গমনেচ্ছু ভাব দেখালেন। তার আগে মাতুলকে বললেন, —'চলি বিশ্বাস মশয়। যাউকগা যা দিবেন—অখন শ্যাস খাওয়াটা খাওয়াইয়া দ্যান।'

মাতুল পারলে ওকে খুন করেন আর কি। নিঃশব্দে সীট ছেড়ে উঠে এসে, আমায় ইশারায় ডেকে নিয়ে বললেন, 'কিছু মনে করিস না, 'শ্যাষ খাওয়াটা' তুই একটু এনে দিবি ! উনি আবার সব দোকানের খাবার ছোঁন না। হাওড়া ব্রীজের এ্যাপ্রোচের কাছে ভীমচন্দ্র নাগ-এর দোকানটা দেখেছিস তো ?' দশ টাকার একটা নোট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'বড় দেখে সন্দেশ ই নিয়ে আয়। মনটা আবার প্রফুল্ল করে দিই—শ্যাষ খাওয়া—ফুঃ।'

ওই চেহারার দুটোর বেশী খেতে পারবে না জানতাম। এক গ্লাস জল খেয়ে বাকীটা প্যাকেট শুধু ব্যাগে পুরে আমার দিকে কৃপা-দৃষ্টি ফেলে বললেন 'টাইরডা তো মুটে দিসেন,—কয়দিন আর যাইবো ?' ব্যাগ থেকে অবশিষ্ট আর দুটো টনিকের বোতল বের করে দিলাম।

বের হবার আগে প্রবোধ দিয়ে গেল, 'আফনার এগ্রিকালছার ল্যান দেখুমঅনে— ভয় কইরেন না।'

ফট্ করে বলে বসলাম, 'শচী তো আপনাকে বলেইছিল, আমার ডকুমেণ্ট সব আছে ? আর কিছু দরকার নেই ?'

লোকটা অতঃপর স্ট্রাণ্ড রোডের ধোঁয়া অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

৫২

বিরক্ত বশিষ্ঠ সিং-কে তালা লাগাতে দিয়ে, আমরাও বেরিয়ে পড়লাম।

জি. পি. ও.-র মুখ থেকে একটা রানিং মিনিবাসে চড়ে বসে, বাড়ীর পথ ধরলাম।

—'লোকটা কিন্তু আপনাকে একটু বেশী কায়দা করে, মামু ?'

মাতুল বললেন, 'কি করি, ওরে ছাড়া তো উপায়ও কিসু দেখি না। তুই আর কাগজ আনতে বারণ করলি ক্যান ? তিনশ পঁচাত্তরের শীড্যাল কি তোর আসে ?'

—'না। আছে একশ' দশ-এর—প্রথম যেটা দিয়েছিল।'

—'তোর বাবা যে কইল সিক্সটি-ওয়ান-এ তিনশ পঁচাত্তর বিঘার শীড্যাল সাবমিট করা হইসিল ?'

—'হ্যাঁ, বাবার বন্ধু ছিলেন সেটলমেণ্ট অফিসার মিঃ হুদা। তিনিই বলেছিলেন, আপনাদের নিউ এ্যালোটমেন্ট স্যাঙশন হয়েছে, চয়েস সীস্টের শীড্যাল দিন। ম্যানেজার যোগেন ভট্টাচার্যকে সব বুঝিয়ে দিয়ে; তাকে দেশে রওনা করিয়ে দিয়ে বাবা কলকাতায় চলে আসেন। যোগেন সেটা সাবমিট করে নি।'

—'করে নি ? কি করে জানলি ?'

এসপ্ল্যানেডে দাঁড়িয়ে প্যাসেঞ্জার টানছে ক্লীনার।

—'করার উপায় ছিল না তার। লিবারেশন মুভমেন্টের পর, দেশ থেকে ক'জন হিন্দু ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছিলেন, বাবার সঙ্গে। কথায় কথায়, উপেন দাস নামে এক স্বর্ণকার বলল, আপনারা জমি বিক্রীর টাকা তো ভালোই পেয়েছিলেন। বাবা তো শুনে অবাক। লোকটা বলল, আপনাদের যোগেন তো আমার থ্রু-তে অনেক টাকা মহারাজের নামে হুণ্ডি করে পাঠিয়েছে। আপনারা পান নি ? এখন বাবার চিঠি আর জ্যাঠামশাইদের কথায় বোঝা যায় খসলাও খুব কম ছিল না সেগুলো বেচে দিলে আর চয়েস লিস্ট আসবে কোত্থেকে ?' মামু মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন।

বললেন, 'মহারাজকে দিয়ে ব্যাপারটা কনফার্ম করিয়েছিলেন ?' কিং ক্যান ডু নো রং ! মাতুল উপেন কর্মকারের কথায় সন্দিহান।

বললাম, 'ডাইরেক্টলী এ কথা কি বলা যায় মামু ? অন্যভাবে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনশ পঁচাত্তর বিঘার কোন শীড্যাল ওঁর কাছে আছে নাকি ?'

—'হ্যাঁ, উনি শুনে কি বললেন ?' মাতুল আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছেন। মিনিটা ছাড়লো। অনেক ভিড় হয়ে গেছে। কাজেই গলার স্বর বেশ নাবিয়ে কথা বলতে হচ্ছে।

—'জ্যাঠামশাই নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন, যোগেন কর্তা আর ঠাকুর সাহেব

দুইজনে মিল্যা সমানে সব খাসল্যাও বেচছে। তোমার বাবার নাকের সম্মুখে এই কাণ্ড হইসে, আর সে কিসুই খবর রাখে নাই। আইজ আমি তো আব্দুলরেই চোর ধরবাম। সেই ওইখানে আসিল, সেই বেচছে।'

—'বলিস কি!' মাতুল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে থাকেন। একটু চিন্তা করে বলেন, 'তিনি তো কলকাতায় বসেই খবরটা রাখতেন, তিনি কেন আব্দুলকে চিঠি দিয়ে জানান নি?'

এর উত্তর কে দেবে?

—'তোদের বাড়ীতে এত শরিকী আছে, বাইরে থেকে তো বোঝা যায় না?'

বললাম, 'এসব কথা কাউকে বলা যায় মামু? ওপর দিকে থুথু দিলে যে নিজের মুখেই পড়বে!'

মাতুল আর আমি যে যার ব্যক্তিগত চিন্তায় বিভোর হয়ে বাকী পথটা পাড়ি দিই।

৫৩

সেটা অনেকদিন আগের কথা। ডিস্ট্রিক্ট টাউনের গেস্ট হাউসে কিছু-কাল আছি। দেশ থেকে ব্যবসায়ীরা সদরে এলে, বাবার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতোই।

আধাকান্দার সাহা-রা খুব বড় ব্যবসায়ী। মনে আছে, ঠাকুরমার পারলৌকিক কাজে কিছু মোহর গচ্ছিত রেখে টাকা ধার করা হয়েছিল। এটাই রেওয়াজ। বাবা যখন ধার শোধ করে দিয়ে দস্তখৎ করা দলিলটা ফেরৎ চাইলেন, তখন বৃদ্ধ শচীন সাহা কেঁদে ফেলেছিলেন! বলেছিল, 'আমি কি আফ্‌নারে তাগীদ্ দিসি? ক্যান্ এইডা ছাড়াইলাইন্? আফ্‌নার জিনিস, আমার ডাইন গচ্ছিত আসে, এইডা তো আমার গৌরব।'! বাবা অনেক কষ্টে তাকে বোঝালেন, জমিদারী চলে গেছে, উনি আর কারো কাছে ঋণী থাকতে চান না। এতে পিতৃপুরুষের অকল্যাণ হবে······ ইত্যাদি!!

এদিনও সেই সাহাদের বাড়ীর কজন এসেছে বাবার কাছে। এরা এলে বাবা কদিন আনন্দে সময় কাটান। সেটাই স্বাভাবিক। পুরানো দিনের কথা উঠতে, শচীন সাহার ভাই বলল, 'মহারাজ কি কাম্‌ডা করলাইন্! না হইলে আমাগোর এই দশা হয়!'

বাবা বললেন, 'না, মহারাজ আর কি করবাইন্, র‍্যাডক্লীফ্‌-এর

লোকটা যে ম্যালা টাকা চাইল ! তখন স্টেটের আয়ও কম—মহারাজ অতো টাকা পাইবাইন্ কই ?'

সাহ-ত্রয় একই সঙ্গে চীৎকার করে বলল, 'কন কী কুমার সাহেব, আফনে জানুইন না ? !' বিস্ময়ে চোখগুলো বড় বড় করে বৃদ্ধ সাহামশাই বলল, 'এই খবর শুইন্‌না আমরাই তো গিয়া মহারাজের ধরসিলাম্ ! যেমন কইরা হউক্ আমরারে ইন্‌ডিয়াতে ঢুকাইন। কইলাইন—টাকা নাই। আমরা আধা-কাইন্দার সাহা-রা, এক রাইতে এক লাখ টাকা তুইল্লা দিসি ! কন কী কুমার সাহেব, আফনে জানুইন না ?'

বাবা নিশ্চুপ, হতবাক্ হয়ে শুনছিলেন। ওরা বলল, 'সেই টাকা কই ? আইজ যদি কই, মহারাজ টাকাটা নিজেই রাখসেন, যেইখানে দ্যাওনের দ্যান নাই ?'

বাবা, বড় জ্যাঠামশাইয়ের প্রতি অশ্রদ্ধাবান হতে পারেন না। তিনি সেই মুহূর্তে এমন কটা কটু কথা বলেছিলেন, যার ফলে বাবা যতদিন ছিলেন, পাকিস্তান আমলে, তাঁর কাছে সাহারা আর কোনদিন আসে নি !

টাকাটা সত্যিই কোথায় গেল, খোঁজটা আমিও পরবর্তী যুগে জ্যাঠামশাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

'কাম্ কিসু হইসিল। শ্যামাপ্রসাদের ধইরা মুভ করানি হইসিল, দিল্লীত্। তখন নেহেরু গভ্‌মেণ্ট, নিজেরার গদি লইয়া ব্যস্ত ! হাতের মোয়া পাইসে। তখন কি আর, কোন চিপায়, একটুক খাইন ট্রাইবাল স্টেট্ পইরা রইসে ভাবতে ঢুকে নাই—এইডা ভাবনের টাইম আসিল—রে ?' সত্যিই হয়তো তাই।

স্বাভাবিকভাবেই,—'আনডেভলপড, এ্যাণ্ড ট্রাইবাল এরিয়াজ উইল ফল ইন ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়ন,—এই আশায়ই চেষ্টা চালিয়েছিলেন। অথচ র‍্যাডক্লীফ-এর লোকটা যে পথ বাৎলেছিল, তার কথামত চললে, ম্যাপের একটা ছোট্ট বক্রগতির দাগে, পরগণাটার একটা হিন্দু-প্রধান অংশ, ভারতে চলে আসতো ! ভাগ্য ! অথচ, মুর্শীদাবাদ চলে গিয়ে-ও ফিরে এলো, খুলনা প্রভৃতি থেকে গেল ! ভাগ্য !

৫৪

বাড়ীর স্টপেজে নেবে গেলাম। মাতুল জানালায় মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'একটা লোক ঘোরাঘুরি করতাসে। তোর সঙ্গে পরে কথা কমু। চলি—।' ! মিনিবাসটা ডিজেলের ধোঁয়া ছড়িয়ে, চলে যায়।

বাড়ীতে ঢুকেই, সেই চতুর্থ চিঠিটি পাব ভেবেছিলাম। লেটার-বক্সের দিকে, সেই উদ্দেশ্যেই তাকিয়েছিলাম। মা একটু মুচকী হাসলেন। 'হিয়ারীং কল' আসবে বলে আমরা হা-পিত্যেশে বসে আছি! লেটার বক্সের দিকে তাকালেই মা ওইরকম হাসেন!

৫৫

চিঠি নয়, রবিবার সকালটা বিস্ময় নিয়ে এলো বাড়ীটায়! ফ্যাকটরীর জনা পাঁচেক ওয়ার্কার, সুপারভাইজার, তাদের অনেককে আমি চিনিও না! সঙ্গে গড়িয়ার, রঙীন প্রলয়!

—'কি ব্যাপার?'

—'খেতে এলুম আমরা!' সহাস্য অভিব্যক্তি। চায়ের ব্যবস্থা করতে বলে এসে, যুৎ করে বসলাম এদের আগমনের হেতুটা কি।

চায়ের উত্তাপ কখন সবাইকার কথায় অথবা ভাষায়, প্রবেশ করে ফেলেছে, খেয়াল-ই হয়নি। চোখের সম্মুখে রাশি রাশি অভাব, অভি-যোগ। দূরদৃষ্টি দিয়ে যে সমাধানের পথ দেখা যায়, সেটা ভয়াবহ।

—'সংস্থাটা আমরা এতো কষ্ট করে গড়লাম। এই ডিম্যাণ্ড, ম্যানেজ-মেণ্ট মেনে নেবে না। ক্লোজার হতে পারে। তখন অতগুলো মুখের অন্নসংস্থান হবে কি দিয়ে, ভেবেছেন?'

—'থামুন তো। চামচে মার্কা কথা বলবেন না। আপনাকে অন্ততঃ আলাদা জাতের ভাবি আমরা।' বিদ্রূপ করে ওঠে কানন।

—'ভেবে দেখুন আমরা কেউ চাই না,—সান্ত্বনা—বন্ধ হয়ে যাক। কিন্তু, ম্যানেজমেণ্ট মুনাফা লুটবে, আর আমরা বছর বছর, আঙুল চুষবো—এ হতে দেয়া যায় না। কোম্পানির গোড়ার দিকে, তোয়াজের অন্ত ছিল না। একটা বুলি সমান ভাগ করে খাব কোথায় গেল সে সব বুলি? বলুন?'

চুপ করে শুনে যাই। কান মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। প্রলয়, নিরুত্তাপ ভাবে কি করে বসে আছে কে জানে।

—'আমরা তো বিরাট কিছু চাচ্ছি না। আমাদের ইউনিয়ন-এর সাথে ওরা চুক্তিতে এসেছিল, প্রতিবছর বোনাস, এক পার্সেন্ট করে বাড়াবে। বাড়তে বাড়তে তেরো পার্সেন্ট অবধি এলো। আমাদের ইউনিয়নকে রাতা-রাতি পাল্টে দিল নয়া পয়সারা। তারা এসে বললে, যা বেড়েছে। ওই-খানেই থাকুক। আজ আমরা আবার ফিরে এসেছি। প্রথমে চাইব এবার

ষোল পার্সেন্ট দাও। ওরা রাজী হবেই। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরবো, ওই হারে গত পাঁচ বছরের টাকাটা ফেল, দাদু।' পান খাওয়া দাঁতে হেসে ওঠে নাতিটি।

বললাম, ধরুন, প্রথমটাই ওরা যদি না মানে?'

—'তাহলে, গলায় গামছা দিয়ে বলবো, ওইসব অশ্লীল ফেস্টুনের টাকা কোত্থেকে এসেছিল—তোমার পকেট থেকে চাঁদু?'

দীননাথবাবুর সামনে এরা এইভাবে কথা বলবে নাকি। আজ কোম্পানীর এতোটা ইমেজ, সবই তাঁর জন্য হয়েছে।

— আমায় কি করতে হবে?' সোজাসুজিই বলে ফেললাম।

—'এই তো লাইনে আসুন। দেখুন আমরা খোঁজ নিয়েছি বেশীর ভাগ রীপ্রেজেন্টেটিভরা আপনাকে ভালবাসে।'

—'তাই নাকি?' প্রলয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কি?' প্রলয় দুষ্টু দুষ্টু হাসছে।

কাশীনাথ বলল, 'তুমি ওদেরকে মোটিভেট করবে, চিনে চিনে।' আরও বলল, 'তোমার কথায় কাজ হবে বেশী। আর এটা বোঝাবে যে, সেলস যদি ফ্যাকট্রীর সাথে হাত মেলায়, মুভমেন্ট সাকসেসফুল হতে বাধ্য। দু'জনেই উপকৃত হবে। অন্যথায়, ফ্যাকট্রী তার সুবিধেটুকু ঠিক-ই নেবে, —সেলস আঙুল চুষবে।'

হঠাৎ বললাম, 'আমাকে চিঠিটা দাও নি কেন?

উত্তর দিল কানন, 'ওইটে একটা চাল। টেস্ট করে দেখলাম, আপনাদের ভেতর আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং কেমন। ওরা সবাই যখন দরজা বন্ধ করে আপনার সাথে বসেছে, শুনলাম তখন নিশ্চিন্ত হয়ে চলে এলাম।'

—'প্রলয়কে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন, বেশীরভাগ রেপ-কটাই ব্যাক-বোন লেস। তেলিয়ে, খোশামুদে এদেরকে এসব বলাও মুশকিল।' চিন্তিতভাবে বলি।

—'আপনি, যাদের ওপর কন্‌ফিডেনস আছে, তাদের শুধু বলুন। অথবা, আপনি তিনজন সুপারভাইজারকে কন্‌ভিন্স্ করুন। তারা, তাদের নিজেদের গ্রুপকে আলাদা, বোঝাক।' কথাটা মনে ধরল। একা কেন মরি। পড়লে সবাইকে নিয়েই পড়বো!

—'রীপ্রেজেন্টিটিভ্‌দের নয় দশ বছর বাদেও যা মাইনে, তাতে সুড়সুড় করে সব, নাম লেখাবে দেখবেন। কেউ খুশী নেই এটা নিশ্চিত। আপনাদের সেল্‌স্-ম্যানেজার তো একটি—! সবাই ফ্যামিলি ম্যান্। দুটো পয়সা সবাই চায়। বুঝতেই পারছেন, এটা পাইয়ে দেয়ার রাজনীতি। সবাই

আসবে।'

হাত মিলিয়ে সবাই চলে গেল। নির্বাক আমি. চিন্তার সমুদ্রে সাঁতরে সাঁতরে কুল-কিনারা দেখছি না। মাথায় মায়ের হাত আসতেই—চমকে তাকালাম!

—'মন যাতে সায় দেয় না, সে কাজ কখনো করিস না, আব্বা।' মা চলে গেলেন। আড়ালে দাঁড়িয়ে মা কি সব শুনেছেন? কিন্তু আমি যে ওদের কথা দিয়ে ফেললাম! এখন ফিরে আসলে, ওরা যে আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলবে!

রহিমীয়ার চৌধুরী—বিশ্বাসঘাতক?!! অসম্ভব। যা থাকে বরাতে। পেছন ফিরে আর তাকাবো না। দূর হোক চিন্তাজাল॥

৫৬

সমস্যা আমার কখনো একটা আসে না। তিন চারটে একসাথে জোট করে আসে। খুব সাবধানে থাকতে হয়। উত্তপ্ত মস্তিষ্কে বেফাঁস কিছু বলে, কাউকে না আঘাত করে ফেলি।

এ্যাপীল কেসটার ফাইনাল হিয়ারীং. অসম্ভব রকম কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে। দু-পক্ষের ডিবেট চলছে চার ঘণ্টা ধরে। অনেক লুপ্ত এবং নতুন পয়েণ্ট নিয়ে মারামারি চলেছে। ওদের উকিল বদ্যি, বাড়িউলী নিজে বদ্যি, জজ্ স্বয়ং ধন্বন্তরী। এই ত্র্যহস্পর্শ যোগ। তরিয়ে যাবেই। অপরদিকে আমার উকিল, মুখার্জী-ব্রাহ্মণ আমি তো বিধর্মী! এই হেটেরোজেনিয়াস্ বডি কি তরাতে পারে? শঙ্কিত হচ্ছি। বাড়িউলীর অবিবাহিত মেয়েটা প্রেতিনীর মত, ছাতে উঠে উলঙ্গ নৃত্য ও করতে পারে! আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। জজ্ও কেমন পাশ টেনে টেনে ওদের উকিলের সঙ্গে, ফালতু কথা বলতে লাগলেন। অতীনবাবু ব্যাপারটায় কেমন ঘাবড়েই গিয়েছিলেন। ও'র একটাই আমার সঙ্গে মিল। তর্কে যত উত্তপ্ত হন, তত বেশী বুদ্ধি খোলে।

ঘর্মাক্ত কলেবর, রক্তাভ মুখমণ্ডল নিয়ে অতীনবাবু কোর্ট-রুম থেকে বের হলেন। কথা বলছেন না। কি ভাবছেন! একথা অনস্বীকার্য; উনি ক্লায়েণ্টদের জন্য খুব মন দিয়ে কাজ করেন।

বললাম, 'হ্যাটস্ অফ্ টু ইউ।'

—'কেন?'

—'যা সুন্দর আর্গুমেন্ট করলেন না। আমি তো ওই শোনার জন্য-ই

আসি। এমনিতে তো আসার কোন দরকার নেই।'

উনি অনেকক্ষণ বাদে এই প্রথম হেসে বললেন, 'এ ছাড়া আর কি বলার ছিল বসুন!' এমন বিনয়ী এবং ভদ্রলোক-এর সংখ্যা, খু-ব কম এ শহরে!

৫৭

বাড়ীর একদম ছোট কাকা, হুট্ করে রাত ন'টার সময় এসে হাজির! আমি তখনই অফিসের কাজ সেরে ফিরেছি। বাড়ীর সবার ছোট বলে, ও'র নাম, 'আবু'। একটু হ্ইমজিক্যাল। খুব উত্তেজিত ভাবসাব!

—'আসুন কাকা।'

উনি ব্যস্তভাবে বললেন, 'না আমি বসতাম না। তর কাসে কি ডক্যুমেণ্ট আসে দিবি?' ধমকের সুর!

বললাম, 'কিসের ডকুমেণ্ট, কাকা? আপনার কোন ডক্যুমেণ্ট আমাদের কাছে তো নেই।'

'—না, না, তা কইতাসি না, জয়েণ্ট কাগজ-পত্তর কি আসে, বাইর কর।'

বললাম, 'আপনি বসুন। আপনার এ্যাফিডাভিট্‌টা সাজাতে হবে তো?'

—না, না, আমার পরশু ইয়ে-হিয়ারীং।'

শুনে আমি সারপ্রাইজড! 'দেখি আপনার ইয়েটা—।'

উনি হিয়ারীং-কল-এর নোটিশটা এগিয়ে দিলেন। ওটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, 'না, এ্যাফিডাভিটের কপিটা আছে? আপনার এ্যাফিডাভিটের সাপোর্টিং ডক্যুমেণ্ট চাই তো?'

উনি আর গোপন করা শ্রেয় মনে করলেন না। অতি কষ্টে, এ্যাফিডাভিট্‌টা ঘোরতর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বের করে দিলেন।

এগ্রিকাল্‌চারাল্ ল্যাণ্ড সাতাশ একর, ডিস্ট্রিক্ট টাউনের গেস্ট হাউস, আর দেশের বাড়ীটা। সাকুল্যে চার লাখ, আশি হাজার টাকার ক্লেইম্!

—'করেছেনটা কী? এটা তো সাজানোই হয়নি! সাতাশ একরের কাগজ আছে আপনার?'

—'না। ইয়ে যোগেন কর্তার হাতে লেখা একটা কাগজ আসে।'

—'তাতে তো কোন সীল্ নেই?'

—'না।'

—'তবে ওটা দিয়ে কি হবে?'

৩০

—'কি করবাম্। কোন ডকুমেন্ট-ই নাই।'

—'ফরেস্টে টাকা দিচ্ছে, ফরেস্ট ক্লেইম করলেন না কেন?'

—'ডকুমেন্ট আসে—দে? কি আগ্রহ গলায়!'

—'থাকলেও, এখন সেটা আর কোন কাজে আসবে না।'

—'ক্যান্? কমু, এই ডকুমেন্ট পাইসি। অতো নিয়ম-টিয়ম জানি না! মিলাইয়া মিশাইয়া যা হয় দাও। কিসু কাইট্টো না। পুরোটাই দাও।'

আমি কি কাঁদবো? বাবা ওপাশ থেকে হাসছেন!

—'তা কখনো দেয়, কাকা? আপনি টাইম নিন। আপনার কেস্ নতুন করে সাজিয়ে দিচ্ছি। টাইম নিলে কোন ক্ষতি হয় না; মামু তো আজ দেড় বছর ধরে টাইম-ই নিচ্ছেন। ডকুমেন্ট না সাজিয়ে হিয়ারীং-এ বসা উচিত নয়।'

ক্ষেপে গেলেন কাকা! বললেন, 'না, আম্‌রার তিন ভায়ের অতো বয়েস হইসে, মায়ের পঁচাত্তর বছর বয়েস—।'

বললাম, 'আমার তো এক কপি করে ডকুমেন্ট আছে। আপনাকে ন্যাশনাল্ লাইব্রেরী থেকে করিয়ে দিচ্ছি চলুন।'

—'তুই যদি আমায় বিশ্বাস করিস, তো তোর ডকুমেন্টগুলি দে। ওদের দ্যাখাইয়া আবার ফিরৎ দিয়া যাইবাম্।'

হেসে বললাম, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠছে না। আমার কপিগুলো এ্যাটেস্‌টেড্ করিয়ে এনেছি। ওগুলো তো প্যানেল আর ফেরৎ দেবে না, নিয়ে নেবে।'

—'আবার এ্যাটেস্ট্ করাইতে হইবো না কি?'

—'জেরোক্স বা ফটোগুলো এ্যাটেস্ট করালে ওরা এ্যাক্সেপ্ট্ করছে। ওরিজিনালগুলো তাহলে আপনার কাছে-ই রেখে দিতে পারেন। অবশ্য আপনার ক্ষেত্রে আলাদা, আপনি তো গেজেটের জেরোক্স কপি নিচ্ছেন, ও-আর এ্যাটেস্ট করতে হবে না।'

—'একদিনে কি দিবো?' ভেবে দেখলাম কথাটা ঠিক।

—'চলুন, ওদের সাথে আমার আলাপ হয়ে গেছে, বলে দেখি।'

অগত্যা পরদিন সকাল দশটায় কাকাকে নিয়ে গিয়ে, সোজা ফোটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে। মিঃ দে, সেনগুপ্ত ও'রা আমাকে দেখেই হেসে বলল, 'কি, হয়ে গেছে, পেয়েছেন। আমরা কিন্তু আর দেরী করতে পারবো না। আর কবে আপনার জমিদারী দেখাতে নিয়ে যাবেন বলুন?

হাসতে হাসতে বললাম, 'এতো শিগ্‌গিরই কি আর হয়? আপাততঃ

এ'র কাজটা করে দিন তো ?'

—'এখন তো বিরাট কাজ হচ্ছে। এই চোটে বাংলাদেশের সব জমিদারদের চিনে নিচ্ছি। পনেরোদিন পর আসবেন।'

বললাম, 'প্লীজ্, ইনি আমার ডক্যুমেন্টগুলোরই কপি নেবেন। কাল এ'র হিয়ারীং। টাইম্ ডেফার্ড্ করলে, মুস্কিল হয়ে যাবে যে ?'

ওঁরা বুঝলেন, এবং মাত্র পনেরো মিনিটেই, আমার বাছাই করা গেজেটের পাতা ক'টা, জেরোক্স করে দিলেন। গেজেটগুলো আর সাত্তলা থেকে নবাতে হয়নি। ওই ঘরেই পড়ে ছিল। জেরোক্স মেশিনটাও শীত পড়তেই ঠিক কাজ করছে।

আবুকাকা, মা-ভাইদের নিয়ে হিয়ারীং-এ গেলেন। যা এ্যাফিড্যাভিট্ করেছেন, তার ডক্যুমেন্ট্ নেই, যে কটা ডক্যুমেন্ট নিয়ে গেলেন, তার কথা এ্যাফিড্যাভিটে বলা ছিল না।

হিয়ারীং-এ প্যানেলের সবাই ইন্সিস্ট্ করেছেন, 'এ্যাফিড্যাভিট্ সাজিয়ে আবার আসুন - এটা হয়নি।'

কাকা, নিজেদের এবং মায়ের বয়স দেখিয়ে বলেছেন 'কিসু কাইট্টো না, যা ক্লেইম করসি, সবটাই দাও ?'

বাড়ীর প্রথম কেসটা এমন মিস্-রিপ্রেজেন্টেশন হলো বলেই মনটা খুব খারাপ লাগছে। এই কেসের কথা আগে জানলে, এটাকেই কত ভাল করে সাজিয়ে দিতে পারতাম। তারপর অন্য সবকটি শরীক, ওটা দেখিয়েই নিজেদের কাজ হাসিল করতে পারতেন। আমার কেসটাও সহজ হয়ে যেত।

৫৮

কাঠের পার্টিশনের ওপার থেকে জলে ভেজা কাপড়ের ওপর, ভারী ইস্তিরীটার ধুপ্ ধুপ্ করে পড়ার শব্দ আসছে। মাঝে, ঠং করে, একটা ধাতব পদার্থের ওপর ও সেটা নাবছে।

নিরহংকার বাড়ীওয়ালা লক্ষ্মী চাটুয্যের পয়সায়, মোড়ের পল্টুর দোকানের চা, আর আলুর দম সাটা হচ্ছে। অমলবাবুর, যদি-ও বিল্টা স্ট্যাণ্ড করার কথা, তবুও লক্ষ্মীবাবু উপস্থিত থাকলে, আর কেউ আমরা পকেটে হাত ঢুকাই না। বাড়ীওয়ালার একটা সম্মান আছে তো ? তাছাড়া, বারেন্দ্রকুলে বিয়ে করে উনি নিজেও এমন ধন্য হয়েছেন যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এই শ্বশুরকুলের বন্ধু-বান্ধবকে খাতির না করে পারেন না।

অমলবাবুর তেজদীপ্ত কণ্ঠস্বর 'মেজভাই তো এখন কাউম্বাইতাসে। আয় আর পিসনে লাগবি ?'

বললাম, 'আপনার তো এই মউকা, ওদের কেসটা করে দিন ?'

বললেন, 'দুশ্—থাউক পইড়া—এইডাই ওগোর পানিশ্মেন্ট্।'

বললাম, 'ওরা আবার নতুন ক্লেইম করে লাইনে আসতে আরও দু-তিন বছর লেগে যাবে। ছোটভাই তো আপনার সাপোর্টার, ওরটা আপনার সাথে করে নিন।'

আশ্চর্য্য হয়ে অমলবাবু বললেন, 'হেইডা ক্যাম্নে হইবো ?' নিজে ক্লেইমটা আবার দুভাগ করার পরামর্শ দিচ্ছি কিনা, আশঙ্কা করছেন !

বললাম, 'খু-ব সোজা ! ওকেও, ঠিক আপনার মত একটা এ্যাফি-ড্যাভিট্ করে দিতে বলুন। সেই সাথে একটা আপনার ফেভারে, পাওয়ার-অব্-এ্যাটোর্ণী।'

—'ও, কত টাকার ক্লেইম করবো !'

—'আপনি যত টাকার করলেন—সাড়ে চার লাখ। সেম্ ফিগার ?'

—'কও কি ? তুমি একটা ডাকাইত দেখি ? দুই ভায়ে মিল্যা তো, নয়লক্ষ টাকার পেঁছাইয়া গিসে ! অতো টাকার সম্পত্তি আমার চৌদ্দ-পুরুষেও কেউ দেখে নাই ! তুমি তো ডাকাইত ! বাইন্দা ফ্যালাইবো, এমার্জেন্সীর সময়—না, না !'

—'এই সুযোগে মেজভাই আর তার বৌ-য়ের কাছে, একটা আইডিয়াল্ জেন্টেল্ম্যান হিসাবে দাঁড়ান ! ওকে বলুন, তোমার কেস্ এ-জন্মেও হবে না। বলুন, টাকা চাও তো এ্যাফিড্যাভিট তৈরী করে নিয়ে এসো, আর আমায় এম্পাওয়ার করো। নইলে গিয়ে কলা খাও।'

—'কইতাসো ?' চক্চক্ করছে, চোখদুটো ! 'কিন্তু,—তিনজনে মিল্যা, কতটাকার ক্লেইম হইয়া গেল, ভাবতাসো ?'

—'ওহ ! আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। বললাম না, আপনার ক্লেইমের এক-চতুর্থাংশ, আপনাকে দেবে না ? প্যানেল যা ধার্য করবে, তার এক চতুর্থাংশ পাবেন ? আপনার তো দাদা, ডক্যুমেন্ট-ই নেই আপনার ভয়টা কিসের ? কোনদিন যদি কোয়ারী হয় তো, বলবেন, সম্পত্তি সম্বন্ধে, আপনার ওইরকমই ধারণা ছিল।'

—'ঠিক আসে, তুমিই আমার পাড়ানির মাঝি, যেইদিকে বা-ও হেই-দিকেই যাইবাম। কিন্তু, ইয়ে......' খুব চাপা গলায় বললেন, 'বাইন্দা ফেলবো না তো ?' বেচারী !

এতক্ষণ বাদে লক্ষ্মীবাবু, পর্দার ওপাশ থেকে বের হলেন, সহাস্য

বদনে ! অমলবাবুর স্ত্রী, অসূর্যম্পশ্যা !

৫৯

চারদিন বাদে হিয়ারীং-এ বসেছেন অমলবাবু। একদিকে আমি, অন্যদিকে স্বয়ং লক্ষ্মী (চাটুয্যে)। দুই সাক্ষী একজনের থিওরেটিক্যাল্ নলেজ। অন্যজন, জীবনেই পাকিস্তান যান্নি।

ট্রাইবুনাল জজ্ মিঃ এস. কে. দত্তগুপ্ত, উল্টোদিকে। পরনে হাফ-সার্ট। শ্যামউজ্জ্বল রঙ! সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বে ভরা। স্বাস্থ্যবান। ডাইনে, প্রৌঢ় রিটায়ার্ড জজ্ মিঃ এ এম. ভট্টাচার্য! শ্বেতশুভ্র কেশদামে, উজ্জ্বল হাইলেন্সে আর কপালের বলিরেখায় অভিজ্ঞতার ছাপ। এঁদের মাঝখানে কোণাকুণি খুব ক্যাজুয়ালী বসে আছেন, আমার পূর্ব-পরিচিত, চতুর্ভুজ ভাগ্যবিধাতা, মিঃ কাস্টোডিয়ান।

প্রতি মাসে এখানে হিয়ারীং করতে এসে, কত সেট্ লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, নিয়ত! আমাকে মনে করে রাখা স্বাভাবিক নয়। কথার মাঝখানেই মিঃ স্বামী উঠে ভেতরের 'কিউবিক্‌ল্‌স্' থেকে ঘুরে এসে বসলেন। কোশ্চেন আওয়ারস্-এর মাঝখানে হঠাৎ আমার সাথে চোখাচোখি হতে একটু ভুরু তুলে নাচিয়ে বললেন, 'হাউ ইয়ু কাম্ ইন্টু দ্য পিকচার?'

হেসে নমস্কার করে বললাম, 'ইউ রীমেম্বার! আই অ্যাম ওয়ান অব হিজ উইটনেসেস্।'

—'দ্যাড্ আই নো।' উনি যে কিউবিক্‌ল্‌স্-এর ভেতর গিয়ে মিঃ কাচ্চ্ওয়ালার টেবিলের খাতায়, আমার সই-টা দেখে এসেছেন, সেটা বুঝলাম।

বললাম, 'আই নো এ্যাবাউট হিজ প্রপার্টীজ।'

—'হাউ? ইউ ডোন্ট কাম্ম্ অব ফরিড্পোর ডিস্টিট্রক্ট?' কবে বোম্বে গিসলাম, ওর স্মৃতিতে আমার জন্মস্থানটা কোথায়, সেটা পর্যন্ত রয়ে গেছে!

হেসে বললাম, 'আই হ্যাভ বিন টু হিজ প্লেস, ইন পূজা ডেজ।'

উনি ইঙ্গিৎ করতেই, মিঃ দত্তগুপ্ত এবং মিঃ ভট্টাচার্য্য আবার তাঁদের প্রশ্নবাণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ডক্যুমেন্ট না থাকার দরুন পাঁচ মিনিটেই কাজ শেষ!

সেই মুহূর্তে অমলবাবুকে পা দিয়ে ঠেলতেই, উনি দুভায়ের জয়েন্ট এ্যাফিড্যাভিট আর পাওয়ার অব এ্যাটোর্নীর কাগজগুলি এগিয়ে দিলেন,

খুব কিন্তু, কিন্তু ভাবে, এবং সভয়ে!

মিঃ ভট্টাচার্য এক ধমকে বললেন, 'এগুলো, এখন দিচ্ছেন?'

—'একটা ফ্যামিলির কেস্ কমপ্লিট হয়ে যায়'—এই গ্রাউণ্ডে দেড় মিনিটেই ওটা সারা হলো।

কাস্টোডিয়ান, মধ্যম ভ্রাতার পাওয়ার-অব-এ্যাটোর্নী দেখে, বিদ্রূপ করে বললেন, 'ওয়াণ্ডারফুল! দি সেম্ জেন্টেলম্যান, রোট এ লেটার এগেন্সট্ ইয়ু। নাও হি হ্যাজ গিভন ইয়ু দ্য পাওয়ার? ওহ; দিজ থিংস্ আই হ্যাভ নট ফেস্‌ড্ ইন দ্য ওয়েস্ট।' হাত নেড়ে নেড়ে হাসতে লাগলেন! অপাঙ্গে মিঃ দত্তগুপ্ত-ও!

বাইরে অনেক ক্লেইমেন্টের ভিড়ে, শুধু দু জোড়া চোখে, আশার আলো দেখলাম না!

—'আমগোরটা এ্যাক্সেপ্ট করসে?' একটা চড় কষাতে ইচ্ছে করছিল মদ্যপ মধ্য ভ্রাতার গণ্ডে।

ছোটভাই আমায় ডেকে নিয়ে খুব খাতির করে কোকাকোলা খাওয়ালেন।

চোদ্দ নম্বর নেতাজী সুভাষ রোডের ন্যাশানাল্ ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তানের পোড়ো বাড়ীটায়, প্রথম পদার্পণেই, কনফিডেন্স আরও বেড়ে গেল আমার। একটা 'ফার্স্ট হ্যাণ্ড নলেজের' যে কি দাম, সেটা আহরণ না করে বোঝা যায় না।

৬০

মাতুলের অফিসে তখন একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। মাতুলের উলু বেড়িয়ার সেই 'বড়দা' এসেছেন। না-বোঝেন কাস্টোডিয়ান, না বোঝেন কোর্ট। যা বোঝেন সেটা মুখে হয়তো বা বলা যায়, কাগজে কলমে হাজির করা দুষ্কর! উনি ৺প্রদ্যোৎনারায়ণের এক আত্মীয়র বাংলো প্যালেসের গাইড।

প্রতিটি কথা ভুল বুঝছেন, বুঝে ভুল লিখছেন। অগত্যা মাতুলকেই নিজের হাতে সব লিখে, টাইপ করিয়ে ঠিক করে দিতে হচ্ছে। অসম্ভব ক্ষিপ্ত দেখাচ্ছে মাতুলকে।

আমাকে দেখেই বললেন, 'কি, কল আইসে? কবে?' কি ব্যগ্রতার এক্সপ্রেশন্!

বললাম, 'না। এখনো আসেনি। আপনার এসে গেছে মনে হচ্ছে।'

—'হ্যা, পরশু হিয়ারীং ডেট ছিল। গিয়ে টাইম নিয়ে এসেছি।'

—'কেন ?'

—'আরে আমার উইটনেস। কি পার্টির কাজে দিল্লী গেছে। সে না আসলে হিয়ারীং-ই হবে না যে। তখনই ভাবলাম এত ব্যস্ত মানুষকে নেয়া ঠিক হবে না। তা, উনি নিজে থেকেই উইটনেস হতে চাইলেন; না করতে ভরসা পাই নি। বুঝলি না, ইনফ্লুয়েন্সিয়াল্ লোক? ওঁর নাম বলতেই প্যানেল রাজী হয়ে গেল। তিন তারিখ ডেট দিসে।' মাতুলের উইট্‌নেস্ তাহলে সেই, ওদো-দা?! নাম করা বিলাতের পাশ করা আইনবিদ্। আইন ছাড়া আর সমস্ত বিষয়ে বৃহস্পতি। গঙ্গাজল দিয়ে ধোয়া, এক-একটা শব্দ ব্যবহার করেন। খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি। কাগজে নাম-ও বের হয়।

—'তাহলে তো আপনার বেশ জোরদার কেস হবে? শচী বলেছিল, উইট্‌নেস্ যত ইম্পর্টেন্ট হবে, কেস ততো তরাবে।'

—'দূর! ডক্যুমেন্ট্ না থাকলে, শুধু ওদো-দারে, খাড়া করলে, হইবো না কি?' মনে মনে হাসলাম। মাতুল সত্যি কথাটা বলতে লজ্জা পাচ্ছেন! 'এইদিকে বড়দার এ্যাফিডাভিট্ তৈরী করতে হচ্ছে।' খুব চাপা গলায় বললেন, পাছে কণ্ঠি সেনের ঘর থেকে, 'বর' মামু শুনতে পায়, 'দুটো চিঠি নিয়ে এসেছে। তাল নেই তো, পকেট থেকে ধীরেনের চিঠি বের হয়ে পড়ল। সবশুদ্ধু-ই রাখলো। ও ঘরে যেতেই পড়ে দেখলাম। একটা ডি. পি-র অন্যটি আচার্য গোপালনের! রেফারেন্স লেটার। কাস্টোডিয়ানকে লেখা, যাতে ওর কেসটা এখনই হয়ে যায়। এক্সপিডাইট করা আর কি! 'বর'-দা আবার প্যানেলকে চিঠি লিখে আমার সঙ্গে একদিনে কেসটাকে নিয়ে এসেছে। ওরাও তো, একটা পুরা ফ্যামিলি একসঙ্গে পেলেই, খুশী হয়? ভালোই হইল। এখন ওদো-দা আসলে 'বর'-দার উইটনেস কইরা নিতে হইবো তো? একসঙ্গে হিয়ারীং হলে তো আর আলাদা উইটনেস্ নেয়া যায় না—ঠিক-ও না।'

মাতুলের সলিলোকির ধারা দেখে বুঝলাম, এতক্ষণ এই কথাগুলো কাউকে বলতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছেন।

—'তোরে এখনো কল দিল না ক্যান্? স্বামী-তো এইখানে আসে যা-যা-এখুনি গিয়া ধর। তোর সঙ্গে তো আলপ্-ই আসে, যা, এখনই যা, দেরী করিস্ ক্যান্?'

বললাম, 'দেখা হয়েছে।'

—'হয়েছে! তো আগে বলবি তো? কি বলল? কবে দেবে, কল্?'

—'ক্যান্ ?'

—'একথা জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করল। কেমন নিজেকে লোভী, লোভী মনে হচ্ছিল।'

—'লজ্জা ? দূর—এখনো তুই সোমেশ্বর স্টেটের কুমার সাহেব রইয়া গিসিস্। তা হইলে বোম্বে গেলি ক্যান ?'

—'বাঃ। সেটা তো নর্মাল প্রসিডীয়র ? ক্যানসেল্ করে দেবে লিখে-ছিল,—উত্তরে, চিঠি না দিয়ে, ব্যাপারটা বুঝতে সশরীরে হাজির হয়ে ছিলাম।'

'আমি তো আর গিয়ে বলিনি, আমার টাকার খুব ঠ্যাকা, এক্ষুনি হিয়ারীং-এ বসাও ?' —কথাটা অবশ্য মাতুলকে আর বললাম না।

মাতুল বললেন, 'তা হলে দেখা করলি ক্যান্ ?'

বললাম, 'আমি একজনের উইটনেস হয়ে গিস্লাম।'

—'কস্ কী! তুই যে একধাপ আগাইয়া গেলি। তোরে চিন্লো ?'

অতঃপর মাতুলকে পুরো ইন্টারভিউটাই ভাল করে বলতে হয়।

'বর'-মামু হঠাৎ ঘরে ঢুকে আমায় দেখে বললেন, 'কীরে, তোদের নবাব-মহারাজদের খবর কি ?' মাতুল, দেখলাম গম্ভীর হয়ে গেলেন হঠাৎ।

বললাম, 'গেছো বাবা, কেমন আছেন ভাল ?'

অবাক হয়ে বললেন, 'সে আবার কে রে ?'

—'সে কী চেনো না ? উলুবেড়িয়ার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, জানতাম! ওই তিব্বত না কোথা থেকে এসে ক্যাম্প করেছেন ওখানে, শুনলাম!' মাতুলের হাসি লুকোনোর অপচেষ্টা দেখতে পেয়ে, 'বরমামু ধমকে বললেন।

—'তুই খুব জ্যাঠা হয়েছিস তো! হ বাবা, নে সীগারেট খাবি ?'

—'আঃ বর'-দা নিজে ঠিক থাকো।'

—'আরে কি আছে ? চাকরী করে! ছেলে লায়েক হয়েছে, বিড়ি ফোঁকে না ?'

আমিই বললাম, 'না স্যার, আমি ধূম্র পান করি না।'

—'আমার বয়স এই কার্তিকে তেষট্টি পূর্ণ হবে। আমি দিনে, গুণে গুণে কুড়িটা সীগারেট খাই। ডাক্তার বলেছে কি জানিস ? আমার ভেতর কুড়ি বছর বয়সের যৌবন আছে। মানে, আই এাম্ ফুল উইথ্ ইউথ্ফুল-নেস্। ওখানে, কলেজের একটা পঁচিশ বছরের মেয়ে ঘুরঘুর করছে। তুই যদি ভরসা দিস, তো তোর মামী করে নিয়ে আসি।'

—'বর'-দা!' চীৎকার করে ওঠেন মাতুল। 'হচ্ছেটা কী এসব ? ছেলের বয়সী, ভাগনের সঙ্গে যা-তা ইয়ার্কী ফাইজ্লামী! একদম পছন্দ

করি না। যাও নিজের কাজ তো বোঝ না—এক ফোঁটা—।' রাগে ফুঁসতে থাকেন মাতুল!

'বর'-মামু নির্বিকার! বললেন, 'যাঃ বকিস না। ধীরেন যা কাগজ দিয়েছে, ওতে হবে তো? তুই করে দে ভাই, খালি সইটা কোথায় করতে হবে বল্। আর নয়তো টাকা-টাই যদি দিয়ে দিস্ তো তোকে লিখে দিচ্ছি।'

মাতুলকে ওই অবস্থায় রেখে উঠে আসবো, 'বর' মামু বললেন, 'তোদের মেঘবর্ণ চৌধুরী আমাদের ওখানে যাচ্ছেন।'

—'জানি।' প্রদ্যোৎনারায়নের এক আত্মীয়ের বিরাট জমিদারীর 'জি. এম' হয়েছেন শুনেছি।

—'ও'র আণ্ডারে চাকরী করবো না। একবছর এক্সটেনশন্ পাবার কথা আছে। এর জন্যে ওকে গিয়ে হাত জোড় ক'রে বলতে পারবো না। 'বস্'-তো, হাত জোড় করে থাকা উচিত, খু ব কষ্ট হবে। কত বাচ্চা দেখেছি। আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। ওর মা-কে দিদি বলি। নাঃ। কেমন লোক রে? নিজে রীকোয়েস্ট্ না করলে কি চাকরীর এক্স-টেন্শন্টা দেবে না?'

—'চেনেন বলছেন? আবার আমায় জিজ্ঞেস করার মানেটা কি?'

—'না—তোর কি মনে হয়?'

বের হয়ে যেতে যেতে বললাম, 'সোমেশ্বরের কেউ অন্যের ক্ষতি করে না। যতটুকু পারে নিজেদের সর্বনাশ করে।'

—'রাজু!' মাতুলের ধমকের উত্তরে একটা হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বললাম,

—'সরি মামু!'

মাতুল আমার সাথে বাইরের করিডরে এসে বললেন, 'তোকে বলে-ছিলাম না, একজন লোক ঘুরছে? পার্সেন্টেজ চায়। অনেক পাইয়ে দিতে পারে। অফিসে এসেছিল। ওদো-দার টাইপীস্ট-ও। ওই লোকটার কথা বলছে। কি করবি?'

বললাম, 'ওতো পার্সেন্টেজ্ নেবে? ওর জন্যেই যে বেশী পেলাম তার প্রমাণ! যে টাকা পাব, সেটা নর্মাল্ এ্যালোট্‌মেণ্ট-ও তো হতে পারে? বুঝবো কি করে?'

—'কি করি বলতো? বড্ড ভয় করচে।'

বললাম, 'না মামু, আমার ও-পথ পছন্দ হচ্ছে না। এতে, আনফেয়ার-মীন্স্ ঢোকাতে মন চাচ্ছে না'

মাতুল পিঠ চাপড়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইয়ু। ঠিক বলেছিস।'

৩১

৬১

তৃষিৎ কাঁদছে। বিছানায় উবু হয়ে শুয়ে, বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, ওর পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললাম, 'তোর আর দোষ কী? তুই তো আর এ কাণ্ড করিস নি। শচী তো সেদিন বলেই নি, কি করে ছাপা হবে কবিতাটা! চুপ কর; ওঠ্, উঠে বস।'

তৃষিৎ একসময় উঠে বসে। খুব আপ্‌সেট হয়ে গেছে।

—'আমি কাকাবাবুকে বুঝিয়ে বলি?'

—'না, না, তাহলে আবার শচীকে টেলিফোনে কি বলবেন, তার ঠিক নেই। ভারী ভারী নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলে ও।

—'কাকাবাবুর চোখে পড়ল কি করে, এটা?' কবিতাগুচ্ছর পাতাটা বের করা, স্বাধীন বাজার-এর 'আস্বাদন-সংখ্যা'টা দেখিয়ে বলি। 'উনি বুঝলেন কি করে, এটা তোর লেখা! কবিতাটা কি ও'র আগে পড়া ছিল?'

— না রে। বাবার সামনেই পিওন ওটা আমার হাতে দিল যে! আমি স্বাভাবিকভাবেই আগে কবিতাগুচ্ছর পাতাটা উল্টেছি। প্রথমেই চোখে পড়ল, আমার সেই কবিতাটা, তলায় নাম কবিতা রায়ের! খুব স্বাভাবিক ভাবেই চম্‌কে বলে ফেলেছি 'এ-কি?' বাবা আমার ভাবান্তর দেখেই জিজ্ঞেস করলেন। ওটা আমার কবিতা শুনেই ফায়ারীং শুরু হলো!'

—'কি বললেন?'

—'কি নয়? বললেন, 'আমার বংশে, তুমি চোর! ঈশ্বর, আমার জন্যে এই শাস্তি রেখে দিলেন? অন্য লেখকের নামে নিজের লেখা ছাপিয়ে বাহাদুরী--!' ছিঃ ছিঃ করতে লাগলেন। মা ঘরে আসতে মা-কে বকলেন। বললেন, 'এই চোর তৈরী করলে? আমি আজ কি করে মুখ দেখাব?' আমাকে বললেন, 'তোমার হাত দিয়ে যেন আর কোনদিন কবিতা না বের হয়।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বাবার কথার জীবনে নড়চড় করি নি। কবিতা লেখা আমার শেষ, রাজা।' বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা জানা নেই।

৬২

ওদের ওখানে খাবার নিমন্ত্রণ। কাকাবাবুই আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। এ'দের বাড়ীতে দুপুর দেড়টা-দুটোর আগে খাওয়া হয় না।

আমি এসেছি শুনে, কাকাবাবু আমায় ডেকে পাঠালেন।

—'এসো রহিমীয়ার।' পরম স্নেহে ডাকলেন। তৃষিতের ওপর ক্ষোভের এখন আর কোন চিহ্ন দেখলাম না।

উনি ইজিচেয়ারে বসে কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছিলেন। আমি পাশের একটা শান্তিনিকেতনী মোড়ায় বসে পড়লাম।

—'ওটা কি বই কাকাবাবু?'

—'এটা বৈষ্ণব-ফিলজফির একটা পার্ট। সদ্‌গ্রন্থ পাঠে মন নিষ্কাম, নিষ্পাপ থাকে। তুমি ধর্মগ্রন্থ পড়?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না। কখনো হাতের কাছে আসে নি। তবে টুকরো গল্প কিছু পড়েছি, এখানে, সেখানে।'

—'কার জীবনী তোমাকে সবচেয়ে আকর্ষণ করেছে?' বুকের ওপর বইটা উল্টিয়ে রেখে আমার সাথে কথা বলে চলেছেন।

—'নরেন দত্তর এক্সপেরিয়েন্স বেশ ভাল লাগে।'

—'ঈশ্বর শরীর ধারণ করে, মানুষকে পথ দেখিয়ে দিয়ে যান। এ'রা বেশীদিন শরীর ধারণ করে, থাকতে পারেন না। মায়ার বন্ধন কাটিয়ে আবার ঈশ্বরেই বিলীন হয়ে যান!'

—'এটা তো কাকাবাবু, ইমোশনাল্ কথা হলো।' সাহস করে একটু তর্ক লাগিয়ে দিই।

—'ঈশ্বর তো সবার মধ্যেই আছে, বলে দেবেন! বিবেকানন্দ তো রামকৃষ্ণের কর্মযজ্ঞের প্রচারক মাত্র। পথ-প্রদর্শক ঠিক-ই, সেটা অস্বীকার করছি না, কিন্তু তাই বলে তিনি-ই ঈশ্বর আর সবাই মানুষ, এ-ধারণাটা একটু ইমোশনাল, মনে হয়।'

খুব মন দিয়ে আমার কথা কটা শুনলেন! হেসে ফেলে আমার কথাটা ছোট করে ফেললেন না। বললেন, 'হ্যাঁ, সবাই ঈশ্বরের অংশ নিয়েই জন্মায়। কিন্তু সংসারের মায়ায়, দেবভাব হারিয়ে, পশুত্বে অবস্থান করে, সব কর্তব্য বিস্মৃত হয়। মায়ার বাঁধনে, স্বয়ং ঈশ্বর-ই বিস্মৃতির জালে জড়িয়ে পড়েন। যে প্রজন্ম, আত্মা, তাঁর আদেশ নিয়ে এই পৃথিবীতে দেহী হন; কঠোর সংযমে নিজেকে তৈরী করে, সেই দেবত্বলাভ করেন, বা সেই দেবত্ব হারিয়ে ফেলেন না—তিনিই ঈশ্বর। মহামানব! বিবেকানন্দ এই রকম একজন।' একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'এমনি আরও অসংখ্য বুদ্বুদের মত ছোট ছোট নরেন দত্ত জন্মান। কিন্তু, পারিপার্শিকতার অমোঘ প্রতিকূল পরীক্ষাগার থেকে, একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে, 'বিবেকানন্দ' আর হয়ে উঠতে পারেন না।'

—'বললেন তখন, ভাল বই পড়লে নিষ্পাপ থাকা যায়?' অন্য

কথায় ফ্লোট্ করালাম।

—'হঁ্যা।'

—'পাপটা কি? এক-একজন এক-একটাকে পাপ কাজ বলছে! গোমাংস ভক্ষণ, গো-নিধনে কেউ পাপ দেখছে, অথচ পৃথিবীর বিরাট অংশ তাতেই জীবন ধারণ করছে, তাদের ধর্ম-ও স্বীকৃত। তাদেরও মহামানব এসেছেলেন?'

বললেন, 'ঠিক। তবে পাপ পূণ্যের কথাটা অন্য ব্যাপার। গো-মাংস ভক্ষণ যা বললে, সেটা সংস্কার॥ কোন এক সময় হিন্দু-ও যজ্ঞে ধেনু বধ করে হোম করত। হিন্দুস্থানে যখন অন্য ধর্মালম্বীরা-ও এসে গো-মাংস ভক্ষণ করতে শুরু করল তখন অবলুপ্তির ভয়ে, তৎকালীন হিন্দু শাস্ত্রকার, হিন্দুদের গো-ভক্ষণ নিষিদ্ধ করলেন। কৃষির কাজে, এবং দুগ্ধ-সরবরাহটাই গো-মাতার প্রথম এবং একমাত্র ভূমিকা দেখা দিল।'

—'আর পাপ কি জান? যে কাজ করে ফেলে, অনেক যুক্তি-তর্কের পর-ও তোমার মন নামক চেতনা সেটা মেনে নিতে পারে না, সেটাই তোমার কাছে পাপ।

আর যে কার্য তোমার পশুত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত করে বলে তোমার মন সায় দেয়, তাই পূণ্য।'

বললাম, 'আপনার মতো এমন সহজ করে আর কেউ বলেনি তো!'

সহাস্যে বললেন, 'এ আমার কথা নয়। এ হিন্দু ধর্মের কথা। পৃথিবীর অন্য যে কোন ধর্ম যা বলেছে, তার বহু আগেই হিন্দু ধর্মেতে সে কথা বলা আছে। নতুন কেউ, কোন কথা, আজও বলতে পারে নি। হিন্দু ধর্ম, সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করে। অন্য সকল ধর্ম, অন্য ধর্মের লোককে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করেছে এই কথা বলে, যে, তাদেরটাই সবচাইতে বড়। আরও মজা দেখ, সব ধর্মের একজন প্রবর্তক আছেন। যীশু! মোহাম্মদ। কিন্তু, হিন্দু ধর্মের কোন একজন' প্রবর্তক নেই কিন্তু!! জন্মসূত্রেই তুমি হিন্দু। কিন্তু ক্রিশ্চানের ঘরে জন্মেই তুমি খৃষ্টান নও, তোমাকে ব্যাপ্‌টাইজড করা হবে, কিম্বা ধর তোমার ক্ষেত্রেই, তোমার বাবা মুসলমান বলেই, তুমি মুসলমান, একথা জোর করে বলতে পারো না। একটা বিশেষ বয়সে একটা নিয়ম-অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তুমি মুসলমান হলে, যার মধ্যে একজন শল্য-চিকীৎসককেও দরকার। ধর্মের লড়াই, ইস্‌লাম ধর্মেও হয়েছে, ক্রিশ্চান ধর্মেও হয়েছে, হিন্দু ধর্মে --তা কিন্তু, হয় নি। কারণ, যে কোন ধর্মই, ঈশ্বরের কথা বলেছে, দেবত্ব লাভের উপায় বলেছে, অন্যায় থেকে বিরত থাকতে বলেছে। তাই, হিন্দু

ধর্মে, আবাহন-ও নেই, বিসর্জন-ও নেই। যদিও কোন এক সময়, অন্ধ ব্রাহ্মণ-শাসন, ক্ষমতার অপব্যবহার করে, অনেককেই বহিষ্কার করেছে, এই ধর্ম থেকে। সংস্কার-মুক্ত না হলে, ঈশ্বর লাভ হয় না, রহিমীয়ার!'

অনেক নতুন কথা এক সাথে শুনে, কেমন মাথাটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে!

উনি আরো বললেন, 'সৎ-চিন্তা, সৎ-সঙ্গ এবং সৎ-গ্রন্থ পাঠের মজা এই, তোমার অজান্তেই তুমি দেবত্বে উন্নীত হতে থাকবে। মানুষ বড্ড অণুকরণ প্রিয়! যা দেখে, পড়ে, তাই শেখে। তাই, ভাল দেখতেও শিখতে হয়। বাইরের আবরণ দেখে মানুষকে ভুল বুঝো না। তার ভেতরটা সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারে। সুন্দর মুখ. কুৎসিৎ মনের আধার হয়। আবার, কুশ্রী মুখ-মণ্ডল-এর অধিকারী, ঈশ্বরও হয়।

সমস্ত জীবন ধরে কর্ম করে চল। যদি নিজে সৎ থেকে, কোন কার্য সমাধা করতে না পারো, অন্য কাউকে সেই পথ দেখাতে অসমর্থ হবে। মনের জোর হারিয়ে ফেলবে।' আমার দিকে চমকে তাকিয়ে বললেন, 'কি হলো? কিছু বলবে? হাসছ যেন।'

হাসিটা মুছে ফেলে বললাম 'আপনার এই কথাটা, আমি উপলব্ধি করতে পারি।'

—'কি রকম?'

—'আমার চাকরীটা কি, আপনি হয়তো জানেন! ডাক্তারদের কাছে গিয়ে, নিজের কোম্পানীর ড্রাগ্‌গুলোর গুণাগুণ, এ্যাক্‌শন-রী-এ্যাকশন, খুব সায়েন্টিফিক্‌ ওয়েতে, ডিটেইল্‌ করতে হয়। কাজটা বুদ্ধির যুদ্ধ, কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন বোর-ডোম্‌ আসে! তখন, প্রতিদিন কাজে বের হতে ইচ্ছে করে না। অন্যদিন বের হয়ে, সেটা সহজেই কম্‌পেন্‌সেট্‌ করা যায় হয়তো। কিন্তু প্রতিদিন যে রীপোর্ট পোস্ট্‌ করতাম, তাতে হয়তো ভিজিট্‌ করা হয় নি, এমন ডাক্তারের নাম বসিয়ে দিয়েছি, কল্‌ এ্যাভারেজ্‌ দেখাতে! ধরা পড়েনি, কারণ, এক্ষেত্রে 'সি'-ক্লাস্‌ ডাক্তারদের নামই ঢোকাতাম। আজ তো প্রোমোশন পেয়ে সুপারভাইজার্‌ হয়েছি, গোটা আটেক মেডিকেল্‌ রীপ্রেজেন্টেটিভ্‌-এর কাজ দেখি। তাদের অন্ততঃ ছ'জন রেগুলার ফল্‌স্‌ রীপোর্ট দিয়ে যায়; বুঝতে পারি। কিন্তু ভাল করে কিছু বলতে পারি না। মনের ভেতর থেকে জোর পাই না।'

—'ঠিক একথাই বলতে চাইছিলাম আমি। আজকে আমার কাছে তোমার নিজের ফল্‌স্‌-রীপোর্ট-এর কথা স্বীকার করে নিশ্চয়ই মনটা হাল্কা লাগছে? লাগবেই। অপরাধ স্বীকারের একটা 'রীলিফ' বোধ আসে, অবশ্য যদি শাস্তি পাওয়ার ভয় তেমন না থাকে! ঈশ্বরের কাছে এমনি

অপরাধের মার্জনা চেয়ে মানুষ 'রীলিফ' পায়। কিন্তু, পরে তাঁর কথা আর মনে রাখে না।'

—'এখন থেকে বাকী জীবনটায় আর ফল্স্ কিছু আসতে দিও না রহিমীয়ার। তোমার অনেক কাজ বাকী, মনে রেখ, তুমি এমন একটি প্রজন্ম-আত্মা যার ওপর ঈশ্বরের কিছু দায়িত্ব অর্পিত আছে। সে দায়িত্ব কী, সেটা খোঁজাটাই, উপলব্ধি করাটাই, তোমার উদ্দেশ্য থাকুক।'

—'কিন্তু কাকাবাবু, আমার যে সবসময়েই মনে হয়, কোন কাজ নেই, এখন ছুটি!' অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছেন কাকাবাবু! আমি অকপটে মনের ভাব বলে চলেছি,—

—'কেমন যে একটা ভাব। ধরুন, এখন তো বাবার ওই কাস্টোডিয়ান্ এ্যাফেয়ার নিয়ে ব্যস্ত! তবু মনে হয়, এই তো কাজ শেষ হয়ে গেছে; এরপর কত ছুটি—শুধু ছুটি, ছুটি!'

উনি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তোমার এ ভাব কেন হয়, রহিমীমার? আশ্চর্য, খুব আশ্চর্য! তুমি, তুমি আমার একটা কথা রাখবে, রহিমীয়ার?

—'বলুন?'

—'না, আগে কথা দাও।'

—আমার দ্বারা কি সম্ভব? তাহলে কথা দিলাম, কি করতে হবে বলুন?'

উনি উঠে দাঁড়ালেন। একটু কেমন যেন উত্তেজিত, অথচ অন্যমনস্ক! বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে।' অবাক হয়ে ওঁকে অনুসরণ করলাম। ঠাকুরঘরে ভোগারতি হয়ে গেছে। ঘরে কেউ নেই। আমাকে সেই কৃষ্ণ মূর্তির দিকে তাকাতে বললেন। তাকালাম।

—'আজও কি শুনতে পাচ্ছ, সেই ধ্বনি?'

কান পেতে খানিক শোনার চেষ্টা করে বললাম, 'কই না তো!'

—'তাই নয়। তিনি একবার ধরা দেন। এবার তোমার কাজ তাঁকে ধরা।'

—'আমার এসব পূজো টুজো তো আসে না কাকাবাবু?'

—'দরকার নেই। আমার একটা কথা রাখো। তুমি কৃষ্ণনাম করো।'

—'কৃষ্ণনাম!'

—হ্যাঁ। হাজারবার, একশোবার করতে হবে না। দিনে বা রাতে, যে কোন সময়, একটু মন দিয়ে, একটু কন্সেন্ট্রেট্ করে শুধু একবার বলবে, কৃষ্ণ। পারবে না?'

—'যদি ভুলে যাই?'

—'শুধু একবার উচ্চারণ করতে ভুল হবে? বেশ তুমি আমাকে কথা দিয়েছ, সেই অঙ্গীকারে, অন্ততঃ, একবার—? কী? বল?'

—'বেশ, তাই হবে।'

আমি দাঁড়িয়েই থাকলাম। উনি প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'ওই একবারেই হবে। তোমার পূর্বপুরুষ যে শক্তি অর্জন করে গেছেন, তা তোমার অণুতে অণুতে, বিরাজ করছে। একটু চেষ্টা করলেই পেয়ে যাবে। তুমি যে তাঁর সখা!'

প্রৌঢ় ঈশ্বর-প্রেমিক, আমার মাথায় হাত রাখলেন॥

৬৩

খেতে বসে দেখি, তৃষিতের আসনটা খালি! ওর খাবার বাড়া হয়েছে। হঠাৎ বললাম, 'তৃষিৎ কিন্তু কোন অন্যায় করেনি, কাকাবাবু!'

চম্‌কে আমার চোখের দিকে মর্মভেদী দৃষ্টি তুলে বললেন, 'তুমি সব জান? ঠিক বলছো?'

বললাম, 'দোষ বা অন্যায় যদি কারোর থেকে থাকে, সেটা স্বাধীনবাজার পত্রিকার।'

উনি হঠাৎ একদম পাল্টে গেলেন। ছেলেমানুষের মত চীৎকার করে বাড়ী মাথায় করলেন, 'এই খোকন, খোকন, কি-রে কোথায় গেলি, খেতে আয় একসঙ্গে বসে খাই!' কণ্ঠ শুনে কাকীমা এবং তৃষিৎ একসাথে ঢুকল। একটু পরে কে বলবে তৃষিৎ সকালে বকুনি খেয়েছিল। আমি আর তৃষিৎ বহু রকমের মাছ-মাংস ইত্যাদি দিয়ে ভোজন করলাম। কিন্তু পাশে বসেই কাকাবাবু খেলেন, দু মুঠো ভাত, আর ডাল। প্রসাদ!! এই খেয়েও কি সুন্দর চেহারা!

৬৪

তিন দিনের প্রবল জ্বরের পর, আজ হঠাৎ জ্বরটা ছেড়ে গেল। বলাই ডাক্তারের ডায়োগ্‌নোসিস্ ভাল। বলেছেন, এটা নাকি এ্যালার্জিক্ ফিভার্। হুট্ করে চার ডিগ্রী উঠে যাওয়ায়, বাড়ীর সবাই ঘাব্‌ড়িয়ে গিস্‌লো! বাথরুমে গা-হাত-পা গরমজলে তোয়ালে ভিজিয়ে, নিজেই স্পঞ্জ্ করছি। দুপুরে ভাত, না রুটি, জানিনা! মাথাটায় ঝি-ঝি' পোকার অবিশ্রান্ত তর্জন! বাইরের ঘরে কেউ একটা এসেছে। বাবার গলা শোনা যাচ্ছে। কথাগুলো

বোঝা যাচ্ছে না। একটু চুপচাপ। তারপর দ্রুত পায়ের শব্দ ভেতর দিকে এগিয়ে এলো। বাবা ব্যস্তভাবে বলছেন 'কমল! কমল! আমাদের সুদিন বোধহয় সত্যিই ফিরে এলো! ও পাশের ঘরে মায়ের সাথে কি কথা হচ্ছে শোনা যাচ্ছে না। বাবা, মা-কে আমার সামনে কখনো নাম ধরে ডাকছেন, শুনিনি! এরপরই মায়ের আনন্দ-জড়িত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'রাজু তোর কল্ এসে গেছে, তাড়াতাড়ি বের হ।' মা এমনভাবে বলছেন, যেন আমি স্নান করে বের হয়েই, হিয়ারীং-এ বসবো।

ধীরে জামা পাল্টে, বাহিরে এসে, অপেক্ষমান জনতার দু'জন মেম্বরের আনন্দে উদ্ভাসিত দৃষ্টির সম্মুখে, তাঁদের হাত থেকে, দেশবরেণ্য নেতার কপি-বুক ঢং-এ, চিঠিটা নিলাম।

সম্পূর্ণ চিঠিটা না পড়ে, প্রথমেই তলার দিকে তারিখটা কবে পড়েছে, দেখে নিলাম। 'পনেরোই ডিসেম্বর-দুপুর দুটোয়' এই কথাটা কালিতে লেখা। বাকী সবটা চিঠি, সাইক্লোস্টাইল্ করা।

হাতে তিন দিন সময় আছে। যদিও করার কিছু নেই। বাবা সাথে যাচ্ছেন-ই। রাজী করিয়েছি। যাঁর সম্পত্তি, তাকেই ওরা প্রশ্ন করতে চায়; এটা শচী বলে দিয়েছিল।

উইট্‌নেস্ দুজনকে খবরটা দিতে, বাবা নিজেই বের হলেন। একজন তো বাড়ীর কাছেই থাকেন। দাদাকে, পি এম্ জি অফিসে ফোন করে জানিয়ে দেয়ার কথা। দাদা, ডাইরেক্ট্‌লী ন্যাশ্‌নাল ব্যাংক্ অব্ পাকিস্তানের বাড়ী পৌঁছে যাবেন বেলা একটার ভেতর। আমরা দ্বিতীয় সাক্ষীকে নিয়ে তখনই উপস্থিত হ'ব।

ভিড় হচ্ছেই। লাইনে না দাঁড়িয়ে, প্রথম কেসটা আমাদের করিয়ে নিতে পারলে সুবিধে হয়। প্যানেল্-এর সবাই লাঞ্চ্ সেরে আসবেন। তাঁদের মনটাও প্রফুল্ল থাকবে। এই সময়, আমাদেরটা দিয়েই শুরু করা চাই।

৬৫

'আব্দুল্ রেহমান চৌধুরী—৭—৭—৭' রোদে পোড়া, শুকিয়ে যাওয়া, রুগ্ন একটি দেহ থেকে, ঘর কাঁপানো, শব্দটা বেমানান হলেও, শংকাজনক! মিঃ কাচ্চওয়ালাকে, ঢুকেই চিঠিটা ধরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার দেখাদেখি উপস্থিত আর-ও অপেক্ষমান দাবীদাররা, ওটাই সীস্‌টেম বুঝতে পেরে, চিঠি-গুলো বের করতে লাগলেন। অমলবাবুর দিন-ই কাচ্চ্‌ওয়ালার সাথে আলাপ করে গিয়েছিলাম। ওর খেরো খাতায় প্রথম অটোগ্রাফ্‌টা সেদিন বাবাই

দিলেন। তারপর সাক্ষীদ্বয়!

—'উইশ্ ইউ অল্ দ্য বেস্ট।' মাতুল তার ভগ্নিপতিকে কালো পর্দা ঝোলা, কাঠের পার্টিশন অবধি এগিয়ে দিতে, দিতে বললেন। উইটনেস্ দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বাবা নিজেকে ইনট্রোডিউস্ করতে শুরু করেছেন। মাতুল আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন,

—'খুব সাবধানে, ভেবে উত্তর দিবি। নার্ভাস হবি না। কাগজগুলো তুই সাজিয়েছিস; যে-কোন ছুতোয়, কথাবার্তায় ঢুকে পড়বি। ও'রা কিছু বলবেন না। খুব এ্যাকোমোডেটিং। যা ঢোক্। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। ভয় নেই।'

মাতুল আমাকে মনে মনে, এখনো, একটা স্কুলের ছেলের মত ভাবেন! কন্‌ফিডেন্স, তখন আমার স্পাইনালকর্ড বেয়ে উর্দ্ধে উঠে, মাথাটাকে সজোরে আকাশের দিকে ঠেলে রেখেছে!

—'আপনার জমিদারীটা যেন কোথায় ছিল? ফরিদপুরে না?' মিঃ দত্তগুপ্ত তাঁর সাইকোলজিক্যাল টেস্ট শুরু করেছেন। মিঃ স্বামীর দিকে তাকিয়ে, একটু হেসে ব্যাগ থেকে একটা একটা ক'রে ফাইলগুলো বের করে টেবিলে রাখছি। আমার বসার চতুর্থ চেয়ারটা এখানে নেই।

বাবা উত্তর দিলেন 'না তো! সোমেশ্বর স্টেট হচ্ছে যাস্ট্ এ্যাট্ দ্য ফুট অব—'

—ও, হো ভেরী সরি, ভেরী সরি।' অভিনেতার মত অপ্রস্তুত ভঙ্গি করলেন মিঃ দত্তগুপ্ত।

বাবা একটু গুছিয়ে বসলেন। এ্যাফিড্যাভিটের পাতা ওল্টাচ্ছেন মিঃ ভট্টাচার্য। —'আপনার এই সম্পত্তিটা কিভাবে পেলেন? কিনেছেন? না, ইনহেরীট্ করেছেন? আর সবাইকার সঙ্গে জয়েন্ট-এস্টেটটা লিখে, তারপর তার কত অংশ আপনার, এইভাবে ক্লেইম করেছেন? না, কি, আপনার নামেই আলাদা সম্পত্তি গেজেটেড্ আছে?' মিঃ দত্তর এমন সুন্দর কম্পাউণ্ড কোশ্চেন-এর সম্মুখীন হয়ে, বাবা কোন প্রশ্নটার প্রাধান্য দেবেন, তাই ভাবতে শুরু করলেন! এই সুযোগ! উত্তরটা দেব কিনা ভাবছি।

ভট্টাচার্য মশাই একেবারে ধমক দিয়ে বললেন, বাবাকে, 'বুঝতে পারছেন না কেন? আবার ভাল করে শুনুন!' দ্বিতীয়বার, দাঁড়ি, সেমিকোলন শুদ্ধ, ঠিক একইভাবে, কোশ্চেনটা প্লেস করা হলো।

—'দুরকমই আছে। যেটা যেমনভাবে পাওয়া, সেটা সেভাবেই ক্লেইম করা হয়েছে।' পাশ থেকে হঠাৎ গম্ভীর গলায় উত্তরটা শুনে, স্বয়ং কাস্টো-

৩২

ডিয়ান-সহ, তিনজন জাজ ই মাথা উঁচু করে আমার দিকে দৃষ্টি দিলেন। শুভদৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, আরেকটু কথা বলে নিলাম, 'আমায় পারমিট করলে, আমি বাবাকে একটু হেল্প করতে পারি ?'

—'শীওর ! আসুন না ! কাম এ্যাণ্ড হেলপ আস টু ফাইণ্ড আউট দ্য টুথ।'

প্রথমে চট্ করে সবকটা ফাইল খুলে, মেলে ধরলাম। যখন যে-রেফারেন্সটা লাগে, হাতের কাছে যেন পাই। ভিস্যুয়াল ফোল্ডার থেকে এক-একটি গেজেটের জেরোক্স বা ফোটো-কপি বের করছি আর তার এক্স-প্লানেশন দিয়ে যাচ্ছি পরপর। বাবার সম্মুখে এ্যাফিডাভিটের কপিটা দেখে দেখে কথার উত্তর দিচ্ছি, কখনো আমি, কখনো বাবা নিজেই।

মাঝে ও'রা আমাকে ধমক দিয়ে থামিয়েই দিলেন, 'প্লীজ, আপনি চুপ করুন। আপনি এসব চোখেই দেখেন নি ?'

আমি মাথা নিচু করে হাসি গোপন করছি। বাবা বললেন, 'না ওর খুব ভাল মনে আছে। চোদ্দ বছর বয়সে ও কলকাতায় এসেছে।'

তাও একটু নজরে উঠলাম।

প্রশ্ন করার টেকনিক ও সাংঘাতিক। সাত নম্বর আইটেম ফায়ার আর্মস্-এর ছোট্ট চিরকুটের 'রসিদ' দেখে বললেন হয়তো, 'একি ! এতে কোন অফিশিয়াল সীল ই নেই ?' পরক্ষণেই ব্যাক করে চলে এলেন দু-নম্বর আইটেম ; বললেন, 'এখানে দেখাচ্ছেন, বাহাত্তর বিঘা হোমস্টেড ল্যাণ্ড, আর আপনার অংশ যখন ওয়ান-ফোর্থ অব দ্য হোল। পৈত্রিক বাড়ীটাই তো পার্টিশন করে চার ভাগ করেছেন ? তাহলে, সম্পূর্ণ বাড়ীর সীমানাটা কি দুশো আটাশী বিঘার ?' মিঃ স্বামী, ফাইলটা হাতে নিয়ে, মিঃ দত্তগুপ্তর কানে ফোড়ন কাটলেন বলেই এই প্রশ্ন !

মিঃ ভট্টাচার্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন কথাটায়। তিনি-ই ডকুমেন্টগুলো হাতে নিয়ে, তার বিবরণ পাঠ এবং এ্যাফিডাভিটের সঙ্গে মিলিয়ে, কত করে দাম ধরা হয়েছে, তার হিসাব লিখে যাচ্ছেন।

বললেন, 'আরে, এইটে তো এস্কেপ করে যাচ্ছিল দেখি ? এটা কি করে লিখলেন ? এতো বড় বাড়ীর সীমানা আপনাদের ?'

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই স্বয়ং বাবা-ই কাণ্ড করে বসলেন। টেবিল টপ্কে প্যানেলের দলে চলে গিয়ে, আমাকেই ধমকে বললেন, 'ঠিক-ই তো, এ কখনো হতে পারে ? ভুল হয়েছে, দিস ইজ এ্যাবসার্ড।' বাবার টেবিলে রাখা হাতের ওপর ফাইলের আড়াল দিয়ে, কতো টিপে চুপ করতে ইঙ্গিৎ করছি— ! বাবা ভাবলেন, রাজুর বোধহয় অসুবিধে হচ্ছে, তাই

হাতটা সরিয়ে নিয়ে পুরো কথাটাই শেষ করলেন!

জজেরা 'হাস্য-চোখে' আমার দিকে তাকিয়ে। অপরাধটা যে আসলে আমারই, সেটা ও'দের বুঝতে কোন অসুবিধে নেই!

এগ্রিকালচারারাল্ ল্যাণ্ডের শীড্যুলটা ওদের কাছ থেকে ফেরৎ চেয়ে দেখালাম, 'এই দাগ নাম্বারগুলোর পাশে লেখা আছে, এই কটা প্লট হচ্ছে, এ্যাডজয়েনিং গার্ডেন। এ্যাকচুয়াল হোমস্টেড ল্যাণ্ড হচ্ছে পঁচিশ বিঘা বাকী সাতচল্লিশ বিঘাই হচ্ছে গার্ডেন।'

—'তাহলে সেটা হোমস্টেড্ ল্যাণ্ড-এর হেডিং-এ ঢুকিয়েছেন কেন?'

একটু বোধহয় রেগেই গেলাম, বললাম, 'আমার দিক থেকে তো কোন তফাৎ নেই! বাগান গুড়িয়ে ফেলে, ওখানে তো আমি বাড়ী-ও বানাতে পারতাম? বানাইনি, ওটা আমার ইচ্ছে। ল্যাণ্ডটা তো একইরকম; হাইল্যান্ড!'

—'তা অবশ্য হতে পারে।' মিঃ ভট্টাচার্য মেনে নিলেন। চোখে কৌতুকের ছিটেফোঁটা! ও'রা কি ইচ্ছে করেই এরকম ধাঁধায় ফেলে, মজা দেখেন?

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হলো, 'আপনার, কো-শেয়ারার কারা?' বাবা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কোন শরিকের নামোচ্চারণ করবেন না। গেজেটের যে খোলা পাতাটার ওপর মহারাজা আত্মচেতন থেকে আবু কাকা পর্যন্ত সবাইকার নাম ঝক্‌ঝক্ করছে; সেটা উল্টিয়ে দেখিয়ে দিলেন। সেই নামগুলো যদিও ও'দের আগেই দেখা, তবুও ট্রাইব্যুনাল্ জজ বললেন,

—'মহারাজার সাথে আপনারা কো-শেয়ারার হলেন কি করে?'

মিঃ স্বামী তৎক্ষণাৎ বললেন, 'লীভ ইট, আই নো দ্য ম্যাটার।'

কিন্তু ততক্ষণে আমি এফ এ. স্যাক্সির ডিস্টিক্ট গেজেটিয়রের জেরোক্স কপিটা, মেলে ধরেছি। সাতশ বছরের ইতিহাসের পাতায়, এক ছোট প্যারাগ্রাফে, ঔরংজেবের টেকনিক ও অনুতাপ। এবং পরিশেষে হিন্দু-পরিবার থেকে একটি মুসলীম উয়িংস্ আলাদা হয়ে যাওয়ার কাহিনীটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি। মিঃ দত্তগুপ্ত পড়ে নিচ্ছেন।

বাবা তার মধ্যেই বললেন, 'এই সীস্টেমটা তখন থেকেই চলে আসছে যে-জেনারেশনে যিনি ক্রাউন এবং টাইটেল ইনহেরীট্ করবেন; তাঁর সম্পত্তির সঙ্গেই, আমাদের সম্পত্তির দেখাশোনা হবে। এই, থারটি ফোরে, কোর্ট অব ওয়ার্ড্স-এ যাবার আগে এগুলো পার্টিশন্ড হয়।'

ধীরেন বাঁসুর নামাঙ্কিত 'ইনফরমেশন্ স্লিপ'টা ও'রা চেয়ে নিলেন। বললেন, ওটার ওরিজিন্যাল চাই। ফোটোতে চলবে না। এটা নাকি দিল্লী

যাবে পাশ হতে ! আমি ইনসিস্ট্ করছিলাম এ্যাটেস্টেড্ ফোটোটাই দিতে। মি: স্বামী হঠাৎ বিদ্রূপ করে ওরিজিন্যালটা হাওয়ায় দোলাতে দোলাতে বললেন, 'কেন, ওটা কি বাড়ীতে বাঁধিয়ে রাখবে ?'

তাজ্জব ! অন্য সুর হলেও, কি পরিষ্কার বাংলা উচ্চারণ ! আমি বোকার মত তাকিয়ে, বাবা এবং উইট্নেসদ্বয় সহ সবাই হাসছেন।

—'দিজ পিপ্‌ল আর ইগার ট্যু কিপ দ্য ওরিজিন্যাল্স্ ডক্যুমেন্ট উইথ দেম্। সারপ্রাইজিং। আই হ্যাভ্ নট্ মীন্ দিজ থিংস্ ; ইন দ্য ওয়েস্ট।' এই কথাটা দিয়েই আমাদের প্রায় দু-ঘণ্টাব্যাপী ঐতিহাসিক ইন্টারভিউ শেষ হলো।

খালি ভিসুয়াল্ ফোল্ডারটা দেখিয়ে, বললাম, 'ডক্যুমেন্টগুলো এতে ভাল থাকবে, এতে ভরে দেবো ?'

—'ওটা, আমাদের দিচ্ছেন ?' মিঃ ভট্টাচার্য শিশুর মত আনন্দে উদ্ভাসিত চোখে বললেন, 'ভেরী গুড, ওটা দিন, তাহলে আপনার কেস্টা ভাল হবে আদার-ওয়াইজ ইউ উইল্ গেট এ জিরো।'

পরের ক্লেইমেন্টকে ডাকা হয়েছে। অনুমতি নিয়ে মিঃ কাচচওয়ালার ঘরে এসে, সীরিয়াল্ নাম্বার মিলিয়ে ডক্যুমেন্টগুলো ভরে ভরে নিচ্ছি। মাতুল দেখতে পেয়ে, কাছে এসে আমার পিস্তুতো দাদাকে বললেন,

—'আপনার মামার জন্য নয়, আমি, আমার মামার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলাম। কেমন উত্তর দিয়েছে, ও'রা স্যাটিস্ফায়েড তো ?'

দাদা হেসে বললেন, 'ও'রা প্রতিটি কাগজ খুঁটিয়ে দেখে, খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন খু-ব ভালোই তো হলো মনে হয়।'

বাবা হাসতে হাসতে বললেন, 'প্রায় আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম আর কি ? বাইরে এসে, রাজাকে বলতে হোত, 'কিছু মনে করিস না, তোর কেসটা বোধহয় নষ্ট করলাম, 'আমি তাকে ভালবাসি ?' মাতুল, প্রথমে লিঙ্কটা ধরতে পারেন নি ! পরেই, মনে পড়ে যাওয়ায়, উচ্চহাস্য করে উঠলেন।

'বর' মামুকে নাভিশ পেয়ে, মাতুলকে ছেড়ে দিয়ে, 'বর'-মামুকেই কাস্টোডিয়ান্ প্রশ্নবানে জর্জরিত করেছে। বর-মামুকে কথা বলতে বারণ করা ছিল। কে শোনে কার কথা ! তার কাছে আচার্য গোপালন-এর, আর ডি পি-র চিঠি ! তাকে পায় কে ! বের হয়ে এসে মাতুলকে ওই-কথাটা, তিনিই প্রথম বলেছিলেন। 'আমি তোকে ভালবাসি।' মাতুলের ; কথা বলতে অবশ্য অসুবিধেই হচ্ছিল। বাঁধানো ঢিলে দাঁতটা, প্রশ্নের উত্তর দিতেই ছিটকে কাস্টোডিয়ানের সম্মুখে, টেবিলের ওপর

পড়ল। পড়েই দু-টুকরো! এতো করে বলেছিলাম রীপেয়ার করে নিন্।

সারাক্ষণ অপ্রস্তুত মামু, চুপ করে বসেছিলেন।

দ্বিতীয় ইন্টারভিউ-টি চলছে। তার মাঝেই কাস্টোডিয়ানের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতে, উনি আমাকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। ঘুরে, পাশে গিয়ে, হাতে দিতে, মিঃ দত্তগুপ্ত তাকিয়ে বললেন, 'সব ডকুমেন্ট ভরে দিয়েছেন তো?'

হেসে বললাম, 'হ্যাঁ।' মিঃ স্বামী, ফোল্ডারের ওপরের লেখাটায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে্ মিঃ দত্তকে দেখালেন। বড় বড় চোখ করে মিঃ দত্তগুপ্ত কথা কটি পড়লেন। অপাঙ্গে হাসির আভাষ।

আমি হেসে, নমস্কার করে, বের হয়ে এলাম, হল্ ঘরে। অপেক্ষমান জনতা বড় বড় চোখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে। 'আরে, এরা তো বেঁচেই আছে!' বেয়ারাকুলের ব্যূহ ভেদ করে, বাইরে বের হলাম ॥ ছুটি ॥ ফাইলের ওপরে লিখেছিলাম, 'মাই ডকুমেন্টস আর এ্যালাইভ হিয়ার, টু স্পীক্ ইন্ সাপোর্ট অব্ মাই ক্লেইমস্ ; টু দ্য কাস্টোডিয়ান্।'

৬৬

চারদিন চলে গেছে হিয়ারীং-এর পর। হঠাৎ খবর পেলাম, মহারাজার হিয়ারীং হয়েছে ষোল-ই ; অর্থাৎ আমার পরের দিন। দেখা করতে গেলাম।

ঢুকে, প্রণামাদি সেরে, অনেকক্ষণ আজেবাজে কথার পর-ও যখন নিজে থেকে কিছু বললেন না, প্রশ্নটা আমিই রাখলাম ; সোজাসুজি, —'আপনার ষোল-ই হিয়ারীং হয়েছে শুনলাম— ?'

জ্যাঠামশাই নন, জ্যাঠাইমা ব্যস্তভাবে ঘরে এসে বললেন, 'তুই কি করে জানলি রে ?'

জ্যাঠামশাই প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদেরডা কত্দূর।' কেমন রীলাকট্যান্ট সুর!

বললাম, 'বাবারটা, পনেরই হয়ে গেছে।'

—'ও! তোমাদের হিয়ারীং হইয়া গিসে। ও তবে তো হইসেই। ভাল, ভাল খু-ব ভাল, তুমি টাকা পাও।'

—'হ্যাঁ রে, তোরা টাকা পা,—এটা আমি কেন, উনি-ও মন থেকেই চান।'

জ্যাঠাইমাও শুভেচ্ছা জানালেন।

—'আব্দুল্ নিজে গিসিলো, নাকি তুমি রীপ্রেজেন্ট্ করলা ?'

বললাম, 'না, বাবাই গিস্‌লেন। আমিও সাথে ছিলাম। ওখানে আপনার নাম বারবার বলেই, বের হয়ে গেলাম।'

—'সে তো তোমারে কইতেই হইব। আমার নাম না নিয়া তোমার উপায়ই নাই।' ইচ্ছে করেই মিথ্যেটা বলে দিলাম। বৃদ্ধ খুশী হবেন; এই আশায়!

—'আপনি কি দাদার সাথে গিস্‌লেন?'

—'আমার যাওনের ইচ্ছা আসিল্‌ না। তবুও গেলাম। মেঘুরে এন্‌-কারেজ্‌ করন্‌-ই উদ্দেশ্য আছিল্‌। বাইরেই খাড়াইয়া আস্‌লাম। একটু পরে দেখি মেঘু বাইর হইয়া আইয়া কইল, তোমার কথা কইয়া ফ্যালাইসি, তোমারে কি, জিগাইতে চায়! বোকৃলাম। আমি আইসি এইডা কইতা গ্যালা ক্যান্‌?'

'ভিতরে ঢুকতেই তাঁরা দুই-তিনজন আস্‌লাইন্‌, উইঠ্যা দাঁড়াইয়া নমস্কার করলাইন! আমি এইডা আশা করি নাই! আইজ্‌কার দিনে রাজাদের কেউ সম্মান জানায়, শুনি নাই! যাউক্‌ গা, তাঁদের নমস্কার কইরা কইলাম, আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে। আমার আর অর্থের প্রয়োজন নেই। আমার ছেলে, সে কৃতী লোক। বোধহয় নিজের কেসটা দাঁড় করানোর জন্য, আমাকে নিয়ে এসেছে—আপনাদের দেখাবে বলে। যেমন লোকে একটা দামী ফসিল্‌ দেখায়—যেমন একটা ঈজিপ্‌শীয়ান্‌ মামির ইম্‌পটেন্স্‌—' আমার কথা থামাইয়া দিয়া কস্টোডিয়ান কইলাইন, 'নাঃ নাঃ ছিঃ ছিঃ একি বলছেন। আপনি আগে বসুন, বসুন।' বইলাম। একজন, বোধহয় অবাঙালী কেডা আসিল্‌, নাম জানিনা, কইল 'ইয়োর্‌ সান্‌ হ্যাজ্‌ রিপ্রেজেন্টেড্‌ দ্য হোল্‌ ফ্যামিলি, ভেরী নাইস্‌লী। বাট্‌ ফেইল্‌ড্‌ টু্‌ সে, এনিথিং এ্যাবাউট্‌ হিজ্‌ ও-ন্‌।'

কইলাম, 'সেটা তো আমিও বলতে পারবো না। সম্পত্তি ছিল, কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডস্‌-এ। ফর লাস্ট্‌ ফর্‌টি ইয়ারস্‌; আই হ্যাড্‌ নট্‌ গন্‌ থ্রু এনি পেপারস্‌। যা ছিল তা তো সাব্‌মিট্‌ করেছে নিশ্চয়ই। আপ-নারা ওই কাগজ দেখে যা বোঝেন তাই দেবেন। যদি মনে হয় কোন প্রাপ্য হয় না, তাহলে দেবেন না। আমার টাকার দরকার নেই।'

—'হোয়ের ইজ ডকুমেণ্ট্‌!' কে একজন কইল। তারে মেঘু কি য্যান বুঝাইল। ওই সব কোনাকাঞ্চির ব্যাপার আমি বুঝি না। আমি চির-কাল স্টেট্‌ কাট পলিসি নিসি, অখন ওই পারে পাও ঠেকাইয়া আর অন্য কাট্‌ শিখনের কাম্‌ নাই।'

ডক্যুমেন্টের ব্যাপারে একটা কিছু হয়েছে, সন্দেহ নেই! সেটা কি,

ভাবতে ভাবতে উঠে পড়লাম। জুতোর ফিতে আঁট্‌ছি দেয়ালে ঠেস দিয়ে।

জ্যাঠামশাই বললেন, 'তবে, টাকা তো আবু, ফিক্স্‌ড্‌ কইরাই দিসে। একলক্ষ পনেরো হাজার! ওর বেশী আর পাইবা না।' হাসতে হাসতে বললেন, 'আমর কথা আলাদা, মেঘু কি করতাসে জানি না। তার একটু জাম্প দেওনের অভ্যেস। আমি কত পাইবাম্‌ সেইডা, অখন-ই কওন যায় না! তবে তোমরার ভাগে, সব ঠিক-ই হইয়া গিসে।'

বললাম, 'আবুকাকা, না সাজিয়ে ক্লেম সাবমিট করলেন। ডকুমেন্ট তো আমিই দিলাম। উনি যদি একলাখ পনেরো পান, তাহলে সাজানো কেসে তো—?'

বাধা দিয়ে বললেন, 'দূর ওই সব কিছু না রে। আবুর লগে ডি পি-র জানাশোনা। ডকুমেন্ট লাগে নাই। ক্লেইমের চার ভাগের এক ভাগ পাইয়া গিসে। গভর্ণমেন্টের ঘর থেইক্কা টাকা পাওনের দুইটাই রাস্তা। তার, একটায়, আবু পাইয়া গিসে। বাড়ীর একভাগ, যা পাইবো, বাকী ভাগ-রে কি আর বেশী দেওন সম্ভব—রে। তারাও তো অফিসার। তাদেরও তো হিসাব দেওন লাগবো!'

মাথায় আগুন জ্বলছে! এতো পরিশ্রমটা এমন বিফলে গেল! মাতুলের সেই লোকটাকে ধরলেই ভাল হতো দেখছি! দ্বিতীয় রাস্তায় পাওয়া যেত! আবু কাকা, তাঁর সু-খবরটা দিলেন না, আমাদের! খুব ব্যস্ত?

৬৭

একটা পক্ষ, খারাপ কাটলো না। প্রথম শুভসংবাদ কোর্ট-এর। এ্যাপীলে বাড়ীউলী টে'সেছে। ফাইনের অঙ্কটা একটু খালি বেড়েছে। বন্ধ স্টপার খুলে দিয়েছে। বাড়ীতে, অনেকদিন পরে, কর্পোরেশন-স্বয়ং এলেন।

দ্বিতীয় খবর, ইউনিয়নের। ষোল পার্সেন্ট—বোনাস, মেনে নিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। প্রেস করার পর, বেশী কথা বলতে হয় নি দ্বিতীয় চালটা ইউনিয়নের তরফ থেকে কবে দেয়া উচিত, সেটা পল্টু আর প্রলয় ঠিক করবে।

খবর, তৃতীয়-ও একটা আছে। অবশ্য সেটা আভাসে আগেই জানা ছিল। হলুদ খামের ইশারায়, তার তারিখটাও জানা হয়ে গেল। রাধা-শঙ্খের বিয়ে, উনিশে জানুয়ারী। খামের ভেতর বোম্বের প্যাথ মাসীমার একটা বিশেষ আলাদা চিঠিও ছিল। বিশেষ আমন্ত্রণ। একমাসের ছুটী

সহ যেন উপস্থিত হই।

কাস্টোডিয়ানের ব্যাপারটা মিটে যাওয়ায়, নিষ্কর্মার ধাড়ী এই রাজা চৌধুরী অমন নিমন্ত্রণটা কখনই উপেক্ষা করতে পারে না। ওকে এমন একটা কিছু প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, যেটা শঙ্খ আর রাধা, দু'জনেরই কাজে লাগে! কি হ'তে পারে সেটা?

৬৮

অমলবাবুকে দেখেই আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়লাম!

—'কি মশাই বণ্ড্ এলে আমাদের আড্ডায় না একটা ফিস্ট হবার কথা?'

উনি লালচে মুখটা ফ্যাকাশে করে বললেন, 'কে, কে কইল? তোমার ডাও আইসে নাকি?'

বললাম, 'আমার কথা ছাড়ুন। সবে তো হিয়ারীং হলো। আপনার কথাটা চেপে যাচ্ছেন কেন?'

—'না, না, চাপনের কি? সামান্য ব্যাপার আমার!'

—'কত টাকা এ্যালোট করেছে?' কেসটা আমার করা, তাই জিজ্ঞেস করার কৌতূহল।

—'খুব ই সামাইন্য, মোটে দুইলাখ, পঁচিশ হাজার!'

—'বলেন কি। দারুন হয়েছে তাহলে? এবার বলুন কেমন দিলাম। এবার গুরু-দক্ষিণাটা দিন।'

—হেঁ; হেঁ; সেইডা তো তোমার পাওনা-ই। খাড়াও, সবে বণ্ড আইসে। এখন আবাব চিঠি লিখসি কাস্টোডিয়ানরে।'

—'কেন? কিসের চিঠি। বণ্ডটা লিখে পাঠিয়েছেন তো?'

উনি বললেন, 'আগে উত্তরটা আসুক দেখি।'

—'কিসের চিঠি লিখলেন।' খুবই অবাক হই।

—'নাঃ লিখসি যে, টাকাটা সবডাই আমার, না তিনভাগ হইব। বণ্ডে তো আমি একা সই কইরা পাঠাইসি। আবার একটা বিলও রেভিনীউ স্ট্যাম্প লাগাইয়া পাঠাইসিলাম। অখন পুরা টাকাটাই তো আমার নামেই চেক আইসে।' শেষ পর্যন্ত কথাগুলো বেরিয়েই পড়ল। আমার কাছে, কেন এটা গোপন করছেন। ভাবছি না। ভাবছি, টাকার হিসাবটা ভদ্রলোক বুঝছেন না কেন?

বললাম, 'এ আবার চিঠি লিখতে গেলেন কেন? আপনার ভাইরা আপনাকে পাওয়ার অব এ্যাটোর্ণী দিয়েছে। তাই টাকাটাও আপনার নামেই

আসবে। চেকে কি মিঃ অমল ভাদ্দুড়ী এণ্ড হিজ ব্রাদারস এইভাবে লেখা যায় নাকি ?'

—'না, তবুও যাচাই কইরা লই। আমি উকিলের লগে পরামর্শ কইরাই লেখসি। এ্যামত্‌ও তো হইতে পারে, ভাইয়েদের একই এ্যামাউন্ট, আলাদা আলাদা পাঠাইবো ?' লোকটা বলে কি ?

বললাম, 'পাগল না পেটখারাপ ? ক্লেইম তিন ভাইয়ে মিলে দিলেন, পনের লক্ষ টাকার। আপনার কথাই যদি ধরা যায়, তো তিনজন মিলে, ছয়লাখ পঁচাত্তর হাজার পাবেন তো ? আপনার পাওয়ার কথা কিন্তু এ্যালোট ভ্যালুর এক চতুর্থাংশ, পনের লাখের কিছু না কাটলেও, তার এক চতুর্থাংশ হয় তিনলাখের কিছু ওপর।' যতই প্রাঞ্জল করে এক্সপ্লেইন করতে থাকি, তত অমলবাবুর মুখটা পাল্টে যেতে থাকে। অবশেষে ল্যাট্রিন থেকে বের হওয়া ; ক্রণিক্ কন্‌স্টিপেশন রুগীর মত মুখটা ভেটকিয়ে, অতি ধীরে ধীরে বললেন, 'তা হইলে তো বড়ই কম দিসে—।'

এই লোকটাই, যখন তিন ভাই মিলে, সাকুল্যে আটানব্বই হাজার টাকার ক্লেইম দিয়েছিলেন, তখন আমার সাজেশনের উত্তরে বলেছিলেন 'বাইন্দা ফেলবো নাতো ?' সময়ে সবাই বদলায় : পাঠকমশাই !

৬৯

শচীকান্ত, দৌড়ঝাঁপ করে শেষ পর্যন্ত ফরেস্টের জন্য আরও লাখ—ছয়েক আদায় করে ছাড়ল। মাতুল আর বড়-মামু মিলে সাড়ে চারলাখ টাকা পেয়েছেন।

শচীকে বললাম, 'মামুরা এত কম পেল কেন বলতো ?'

শচী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করে বলল, 'আরে, ওদের কতগুলো শেয়ার, তারা তো, ক্লেইম ই দেয়নি ! সেই হিসেবে কত বেশী পেয়ে গেল বল ! অতো টাকার প্রপার্টী তোমার মামারবাড়ীর ?' একটু চেয়ারে দুলে নিয়ে বলল, 'তাও পেয়েছে, রাগ করলে তো চলবে না, ওদো-দা সাক্ষী ছিল বলেই, ওই ফিগার এসেছে। বর-র আবার দুটো চিঠি-ও ছিল, হ্যাঁ।'

মাতুলকে শচীর কথাটা বলতেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'শচীর এসব কায়দা-মার্কা কথা শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়। ওর কথাবার্তার ধরণ-ই ওই। টাকা, যা পাওয়ার সে-ই পাবে ? আর সবাই একটু-আধটু পেলেই হলো ! ফুঃ ! আমায় বলে কি জানিস—থাক তোকে আর বলে কি হবে। শচীকে একদিন কথা শুনিয়ে দিয়ে আসবো। ছেড়ে দেব না।'

৩৩

অথচ কেসের গোড়ার দিকে মাতুলই শচীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন !

৭০

কুমার কিশোর চৌধুরীর বাড়ী গেলাম। কোন রোববারে যেন যাবার কথা ছিল। নানান্ তালে ভুলে গেছি।

আমার ডকুমেন্টের ভেতর যেগুলো ওদের লাগবে, সেগুলোর কপি করিয়ে সঙ্গেই নিয়েছিলাম। নানা অলোচনায়, কিভাবে কেস্‌টা প্লেস্ করা উচিত, বললাম। নেক্সট্ জেনারেশনের একটি ছোকরার কাছ থেকে শুনতে ও'র মোটেই ইচ্ছে নেই। এক-একটা অবজ্ঞা মিশ্রিত ভঙ্গীতে, এটা-ওটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে যাচ্ছেন। যেন 'এ ব্যাপারটা কিছুই নয়—ও রেখে যাও দেখে নেব'খন !' ধ্যুৎ ! আমার কি ! ডেকেছিলেন, তাই বলে দিতে এলাম। একজায়গায় বললেন, 'এগ্রিকাল্‌চারাল্ আমাদের প্রায় দশহাজার একরের মত আসিল। মুজ্‌রাই ল্যাণ্ড-ই খাস ল্যাণ্ড। দারওয়ান্ থেইক্কা আরম্ভ কইরা ঠাকুর, চাকর, পাঙ্খাপুলার, সবাইরে জমি দেওয়া আসিল—।'

তিনশ পঁচাত্তরের জমি কোথা থেকে এলো, তার বিবরণ দিচ্ছেন উনি !

বললাম, 'না, জ্যাঠামশাই, ওই জমি আপনাদের ছিল না। নাইনটিন ফর্‌টিনাইনে 'চাক্‌রান্ এ্যাক্টে ওটা পারমানেন্ট টেনিওর হয়ে গেছে, ওদের নামে। আপনার নয়, ওদের খাস্‌ল্যাণ্ড হয়ে গেছে সব।'

উনি শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। জমিদারী একসময় উনি-ই দেখাশোনা করতেন ; এবং খুব প্রশংসাও পেয়েছিলেন, শোনা যায় !

শচীকান্তর তো খুব বুদ্ধি ! যখনই গেজেটে নোটিফিকেশন্ বের হলো, চাক্‌রান্ এ্যাক্ট-এ সব মুজরাই জমি চলে যাচ্ছে, ও চট্ করে করলো কি, সব লোকজনদের ডেকে এনে মিটিং করে বলল, 'তোরা যে, যে, জমি ভোগ করছিস, সেটা তোদের নামেই করে দিচ্ছি। এখন জমির যা দাম, তার অর্দ্ধেক দাম দিয়ে যা।' ওরা ভেবেছিল অমন হৃদয়বান জমিদার হয় না। পাকিস্তান গভর্মেণ্ট যেটা আইন করে ওদের দিচ্ছিল, ওরা সেটা গাঁটের কড়ি ফেলে নিয়ে গেল !

৭১

বড়ীউলী আবার স্টপার বন্ধ করল, ওদের উকীলের পরামর্শে। এরিয়ার বোনাস্, ষোল পারসেণ্ট হারে চাইতেই, ম্যানেজমেন্ট ব্যাক-আউট

করেছে। সেলসের ব্যাক বোন্-লেস ছেলেগুলো মাথা উঁচু করে ফ্যাক্টরী ওয়ার্কারদের পাশে এসে দাঁড়াবে, এটা ওদের কল্পনার অতীত। ফোন্ করে, পার্সোনাল্ কন্ট্যাক্ট করে, সেলসকে সরিয়ে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, মিঃ ঘোষ। অবশেষে দীননাথবাবু ইউনিয়ন-রেপ্রেজেন্টেটিভদের সাথে বসতে সম্মত হয়েছেন।

ফ্যাক্টরীর হয়ে, কানন আর পল্টু, সেলসের হয়ে প্রলয় এবং আমি। উনি ও'র স্বভাবসিদ্ধ বক্তৃতায় আন্তর্জাতিক প্রেম আর সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলি বিশ্লেষণ শুরু করেছেন। আমরা স্বভাবতঃই অন্যমনস্ক। বাইরে দরজার ওপারে, জোড়া জোড়া হাত আর বুদ্ধির সমঝোতায় সোচ্চার, জোয়ারের উদ্বেলিত সমুদ্র-আস্ফালন।

দীননাথবাবু শেষ চেষ্টা করলেন, 'কোম্পানীর এক্সপ্যানশন স্কীম রয়েছে, একটা বছর তোমরা ধৈর্য ধরো।'

পল্টু বলল, 'অনেকদিন অপেক্ষা করে, করে, ধৈর্যে ঘুন ধরে গেছে স্যার!' দীননাথবাবুর মুখের ওপর কথা বলা, আমা'র অভ্যেস নেই। আমি নিশ্চুপ বসে। প্রলয় গোপনে হাই তুলছে বারবার। কানন পান চিবুচ্ছে।

একচুল নড়লাম না। দাবী অস্বীকৃত হলো। দরজা খুলে বাইরে আসতেই, ঝড়ের পূর্বাভাসের মত স্তব্ধ হলো জনসমুদ্র। সবাই আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে। নির্দেশের অপেক্ষায়।

—'বয়কট।' শুধু একটা শব্দ বলল পল্টু ভট্টশালী।

সাতশ' কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হলো 'বয়কট'॥ 'বয়কট'॥ বয়কট'॥

পরদিন দেখা গেল, অফিসে আর ফ্যাক্টরীতে ঢোকার সবকটা পথের মোড়ে মোড়ে ফেস্টুন ক্যাম্প। অফিসারদের গাড়ী অবরোধ। ফেরৎ! শুধু ডাইরেক্টরদের ছেড়ে দেয়া হচ্ছে, কিছু না বলে। অফিসের দারওয়ান আর কটা ড্রাইভার ভিন্ন সবাই মুক্ত আকাশের তলে। রৌদ্রে স্নান করছে আনন্দধারায়।

তার পরদিন, রৌদ্র ওঠার আগেই দাবানলের মত খবর রটে গেল। মাঝরাতেই ফ্যাক্টরী, হেড অফিস এবং সেলস অফিসেও তালা ঝুলছে। বিরাট বিরাট তালা! শ্রমজীবীদের কণ্ঠরোধ করে দেয়া, তালা॥ ছুটী॥ সময় বদলায় পাঠকমশাই!! ছুটী॥

৭২

অখণ্ড অবসর ।। সারাদিনে বারচারেক ক্যাম্পে ক্যাম্পে ডিউটি। দল-ভাঙানীর চেষ্টা চলছে কিনা, খবর রাখা। আর বন্ধুদের মরাল ধরে রাখা লেকচার দিয়ে এবং দিইয়ে সর্বক্ষণ একটা উত্তেজনা প্রবাহকে তুঙ্গে ধরে রাখা। তারপর ক্লান্ত, শ্রান্ত, ঘামে ভেজা দেহটাকে এনে তক্তপোষে ছুঁড়ে দেয়া। ভুলে থাকা! আগামী মাসের মাইনেটার চিন্তা, কুরে কুরে খায়। কোত্থেকে টাকা যোগাড় হবে? হাত পাতবো? নাঃ নাঃ অসম্ভব। হয়তো শ'খানেক টাকা ব্যাঙ্কে আছে। তা দিয়ে ক'ঘন্টা চলবে!! তারপর? ভাবতে পারি না।। ক্যাডাররা রাস্তার মোড়ে মোড়ে কৌটো ঝাঁকিয়ে, সান্ত্বনার শ্রমিক ঐক্যের চাঁদা ভিক্ষা করছে,—সম্পূর্ণ উদাসীন, এবং বিরক্ত, পথচারীর কাছ থেকে। প্রোফেশনাল কলিগদের কাছে কুপন বিক্রী করে, সেলসের ছেলেরা ভাল টাকা তুলছে। যাদের মাইনেটা খুবই কম। তাদের ডিম্যাণ্ডটাই বেশী হবে। টাকাটা সেই খাতে জমা হচ্ছে। পল্টুই সেক্রেটারী।

৭৩

একটা মাস চলে গেল। ম্যানেজমেন্ট নীরব। এদিকে, টাকা চাই যে! বটলিং লেবেলিং সেকশনের দু'টি রোগা রোগা ছেলে এসে খুব লজ্জায় মাথা নীচু করে দাঁড়াল। কথা বলার সাহস নেই।

—'কি ভাই, কিছু বলবে?' ক্লিষ্ট মুখটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি।

—'নাঃ।' একটু হাসল। একটু পরে, যখন আমি একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ভাবছি, ছেলে দুটো আবার এলো।

—'চৌধুরী দা, একটা কথা ছিল।' দ্বিধায় জড়ানো কণ্ঠস্বর।

—'হ্যাঁ, বল। এতো হেজিটেট্ করছো কেন?'

—'মানে—ইয়ে, কটা টাকা হবে?' চট্ করে বুঝলাম অবস্থাটা সঙ্গীন। বললাম, 'টাকা তো পল্টুদার কাছে থাকে, ওখানে বল!'

ওরা একটু ইতস্তুতঃ করে বলল, 'বলেছিলাম—ইয়ে—উনি বললেন—ইয়ে—টাকা—নেই।'

—'নেই? মানে?' অবাক হলাম।

ওরা শুধু বলল, 'হ্যাঁ।'

বললাম, 'আচ্ছা, আমি দেখছি। আমি এখন ফ্যাকট্রীতে যাচ্ছি।

ওখানে পল্টুকে পেয়ে যাব। কাল যাতে টাকা পেয়ে যাও—বলে দেব।'

—'চৌধুরী দা—ইয়ে, আমাদের দু'জনেরই বাড়ীর অবস্থা খু-ব খারাপ। অনেকগুলি ভাইবোন। আর তো কেউ রোজগার—!' আস্তে মাথা ঝাঁকাল। রাস্তার ধুলোর দিকে তাকাল।

—'কি বলতে চাও বল।'

—না। যদি দশটা টাকা দেন। রেশনটা তুলে, ওকে অর্ধেকটা দেব!'

ওর ঠেকাটা বুঝতে কষ্ট হলো না। আমি কি করতে পারি! বুঝতে পারি, এম্ পরদীপ্, শৎপথী বা প্রলয়ের পোষাকের চাকচিক্যের কাছে ওরা মুখ খুলতে সাহস করে না। তাই……। টাকা, পকেটে ওই দশটাই আছে। ভেবেছিলাম পরিচিত কোন ডাক্তারকে দিয়ে চেক্ আপ্ করিয়ে ওষুধ কিনবো। ক'দিন থেকে দারুণ কাশি। রাতের দিকে জ্বর হয় বোধহয়। টেট্রাসাইক্লিন্ খেয়ে নিজেই ট্রিট্মেন্ট করা যেত, হয়তো। কিন্তু নিঃশ্বাসের কষ্টটা ভাবিয়ে তুলল। বুকের ওপর একটা ভারী পাথর চেপে রয়েছে, সারাক্ষণ।

তক্ষুণি একটা ট্যাক্সি এসে পাশে দাঁড়াল। সেল্স্ম্যানেজার স্বয়ং! রীপ্রেজেন্টটিভ্দের অনেকে এগিয়ে গেল। উনি নেবে এসে দাঁড়ালেন। বিদ্রূপের মত একটুখানি হেসে বললেন, 'তোমরা ভুল করলে হে! একটু মাথা ঠাণ্ডা রেখে স্টেপ্টা নিলে পারতে। আমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করলে পারতে! তোমাদের ব্যাপারটা আমার মাথায় ছিল। এ বছরটা যাতে আমরা ফেসিলিটিসগুলো বের করে নিতে পারি, তার সমস্ত স্কীম্, আমার মাথায় ছিল। কিন্তু এটা তোমরা করবে, আমি ভাবতেও পারিনি! এ ভাবে কি চলতে পারবে! —আর ক'দিন?'

—'আপনার কি খুব-ই কষ্ট হচ্ছে স্যার? পার্টিফাণ্ডে কিছু দিয়ে যান না?'

প্রলয় কখন এসেছে, দেখতেই পাই নি। ও চুপচাপ থাকে। মাঝে মাঝে এমন এক একটা কথা বলে, না হেসে পারা যায় না।

প্রলয়ের দিকে তাকিয়ে কথাটা একদম গায়ে না মেখে বললেন, 'বাবা কেমন আছেন? আমার প্রণাম জানাবে। ওঁর মত একজন এ্যানার্কিস্ট্-এর সঙ্গে জীবনে কোনদিন আলাপ হবে, ভাবতেও পারতাম না। তোমার বিয়ের দিন উনি যেভাবে দাঁড়িয়ে থেকে খাইয়েছিলেন, ভোলা যায় না।'

প্রলয় ঝট্ করে বলল, 'হ্যাঁ, বাবাও তো আপনার কথা খুব বলেন। বাবাদের সময়ে কে একজন এস্-ডি-ও ছিলেন, এ্যানার্কিস্ট্-দের ধরে ধরে

ইংরেজের কারাগারে পুরতেন ; তার সঙ্গে নাকি আপনার চেহারার অদ্ভুত মিল।'

উনি একটা বেশ্ এ ঠেস্ দিয়ে বললেন, 'ও তাই নাকি, তাই নাকি ?' হাসলেন ! যাকগে, এসো আমার বাড়ীতে একদিন।' সবাইকার উদ্দেশ্যেই কথাটা বলে ট্যাক্সিতে উঠতে যাবেন, বললাম, 'পঞ্চাশটা টাকা দিন তো !' একেবারে দশটাকা চাইলে, উনি হয়তো ভাবতেন, আমাদের অবস্থা খুব সঙ্গীন !

আমার দিকে একটা বিষাক্ত সাপের মত দৃষ্টির ছোবল্ দিয়ে তাকালেন। বললেন, 'কেন ?'

বললাম, 'না। ফাণ্ডের জন্য চাচ্ছি না। পার্সোনাল লোন্—ফেরৎ দেব !'

উনি একহাত ট্যাক্সির দরজায়, আর অন্য হাত আমার কাঁধে রেখে বললেন, 'এখন তো নেই সঙ্গে। তুমি আমার সাথে চলো বাড়ীতে, দিয়ে দিচ্ছি।'

অসম্ভব বুদ্ধিমান লোক। কাজের অজুহাতে ওঁকে বিদায় দিলাম। ওঁর সাথে ট্যাক্সি চড়ে যাওয়ার অর্থ ; সহকর্মীরা কি করতো—!

প্রলয়ের পেটে একটা গুঁতো মেরে বললাম, 'খুব সাহস হয়েছে না ? বস্-কে লেগ পুল ?' ওর সাথে আর সবাই হাসতে থাকে। দু নম্বর ক্যাম্পে যাবার আগে, ফ্যাক্টরির ছেলে দুটোকে ডেকে, পকেট থেকে দশটাকার নোটটা বের করে দিয়ে, চলে এলাম।

৭৪

পল্টুর সাথে দেখা হতেই বললাম কি হে, ফাণ্ডে টাকা শর্ট ?'

—'তোমরা আমাকে সন্দেহ করছ নাকি ?' রেগে উঠল ব্রাহ্মণ !

—'হলোটা কি ?'

—সবাই এমনভাবে টাকার খোঁজ করছো ; যেন আমি-ই সব মেরে দিয়েছি। এই তো হিসাব, দেখ না।'

এক্সারসাইজের যেখানে সেখানে পাতায়, পাতায়, টাকার অঙ্ক ঠিকই লেখা। তবে কোনটা কোন খাতে, বোঝে, এমন কোন এ্যাকাউন্টেন্ট্ আমাদের দলে নেই ! কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার ফেস্টুন, ব্যানার আর লিফলেট তৈরী করা-টা কি ঠিক হলো !

তৃতীয় মাস এলে, অবস্থা কোথায় দাঁড়াবে, তার ভয়াবহ মূর্তিটা চোখের

সম্মুখে ধ্বক্ ধ্বক্ করছে। পার্টির একজন নেতা ভরসা দিয়েছিলেন তাঁর কোন পাত্তাই দেখছি না।

৭৫

—'একি রে? তোর গায়ে যে জ্বর?'

তৃষিতের চীৎকারে কাকিমা ঘরে ঢোকেন। বলেন, 'একি চেহারা করেছো রাজা? তোমায় যে চেনাই যায় না?'

হাসলাম। 'ও কিছু না, কদিন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মতন হয়েছে, সেরে যাবে।'

কাকিমা চলে যেতে, তৃষিৎ চেপে ধরল আমায়, 'কি হয়েছে বল? তুই অসম্ভব রকম রোগা হয়ে গেছিস। তোকে খু-ব ক্লান্ত দেখাচ্ছে রে।'

বললাম, 'স্ট্রাইক্ করে অফিস ক্লোজার হলো। কাজ বাড়লো তার-পর। বড্ড স্ট্রেনুয়াস্ রে, এই বক্তৃতা দেয়া? হাঁপ ধরে যায়। আর হয়েছে একটা কাশি, জ্বালিয়ে খেলে।'

ও একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তোদের এনিমিপ্রপার্টীর টাকা এখনো পাস্‌নি না?'

বললাম, 'দ্যুৎ। মেলা দেরী। অনেকে আবার খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাচ্ছে। আমি একটা কেসে উইট্‌নেস্ ছিলাম। হিয়ারীং-এর এক মাসের মধ্যে চেক্ পেয়ে গেছে।'

—'তোর মামাবাড়ীর, ও'রা?'

— হ্যাঁ, পেয়েছেন।' দাঁতের কথা মনে হতেই বললাম, 'একটা ভারি মজা কি জিনিস! এই কাস্টোডিয়ানের ব্যাপারে যে যত তার পিতা, পিতা-মহর সম্পত্তির ডকুমেন্ট্ দেখছে, সে ততো পুরোনো দিনে ফিরে যাচ্ছে।'

— মানে?'

— মনে, মনে, হ্যাঁরে! কেউ হয়তো দু-জেনারেশন আগে, ব্রিটিশের দয়ায় রাজা ছিল, তার নাতিটি এখন নিজেকে রাজা ভাবছেন। সেই রকম কথাবার্তা, অভিব্যক্তি। আবার কারো বাবার বা নিজের আমলেই অন্য শরিকের সঙ্গে ঝগড়া বা মতান্তর ছিল, সেইসব ব্যাপার কবে চুকে বুকে গেছে—এখন আবার স্মৃতিতে ফিরে এসেছে। এক শরিক, অন্য শরিক সম্বন্ধে যা-তা বলে বেড়াচ্ছে!'

—'বলিস কি?'

—'আরে শোন, মজাটাই বলা হয় নি তোকে। যারা সেন্সে আছে,

এরকম ঠিক করছে না, কিন্তু, অন্যরকম ব্যবহার করছে। যেমন আমার দাদামশাইয়ের দাঁত-জোড়া বাঁধানো ছিল। কথা বলতে গেলেই খুলে আসতো। উনি আবার সেটা জিভ দিয়ে চেপে দিয়ে কথাটা শেষ করতেন। তাঁর ছেলে অর্থাৎ মাতুলের ও সামনের দাঁতজোড়া বাঁধানো; খুব ঢিলে। ও'কে কবে থেকে বললাম ওটা ঠিক করুন, ঠিক করুন। কিছুতেই করলেন না। কেন জানিস? ওই ঢিলে দাঁতের মধ্যেই উনি নিজের ভেতর ও'র বাবাকে খুঁজে পাচ্ছেন। কাণ্ড-ও হলো। হিয়ারীং এর সময়।' আমার কথা শুনে তৃষিৎ-ও হাসতে শুরু করল। আমার তো হাসতে গেলেই কাশির দমকটা চলে আসে। কাশতে কাশতে আমার নীল হয়ে যাওয়া মুখটা সভয়ে ধরে তৃষিৎ বড় বড় চোখ করে বলল, 'রাজা, রাজা, একি করছিস? তোর তো এক্ষুণি ডাক্তার দেখানো দরকার। একটু আগেই লক্ষ্য করেছিলাম তুই কথা বলতে বলতে হ'াপিয়ে উঠছিস।'

—'ও কিছু না, আজ সন্ধ্যেয় যাব ডাক্তার-এর কাছে।' চা খেয়ে উঠবো। ও বলল, 'রাজা, আমি তোর বন্ধু। তুই লজ্জা করিস না—তোর কি টাকার দরকার আছে?' আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে। ও বলল, 'অরে দূর আমি তোকে ছোট করতে পারি? তোকে ধার দিচ্ছি সময় মত ফেরৎ দিস?'

টাকাটা তক্ষুণি দরকার। তবু বললাম, 'জানা রইল, সময়মত চাইব।' রেডী রাখিস। তোর কাছে লজ্জা করার কি-ই বা আছে! তুই, তোরা তো সবই জানিস।'

৭৬

খুব সকালে বের হবো, মা বললেন, 'পিছু ডাকবো না, দাঁড়া।' দাঁড়ালাম না, দরজার কাছে, টুলটায় বসে পড়লাম। শরীরটা বইতে পারছি না। অথচ ফ্যাক্ট্রীতে যাওয়া দরকার। দারুণ খবর আছে। আজ সকালেই ওরা পুলিশের সাহায্যে নিয়ে র-কেমিক্যালস বের করে, সান্ত্বনা কেমিক্যালসে নিয়ে যাবে। পথরোধ করা চাই।

—'এদুটো চিঠি কাল ডাকে এসেছে, বিকেলে, বইয়ের ফাঁকে রেখে-ছিলাম, অনেক রাতে মনে হলো।' একটা চিঠির ওপর লণ্ডনের ছাপ। দ্বিতীয়টি কলকাতার। কলকাতারটাই আগে খুললাম। ডেপুটি কাস্টো-ডিয়ান অব্ এ'নমি প্রপার্টী' ফর্ পাকিস্তান, মিঃ বিশ্বাসের সই করা একটা চিঠি। এক নম্বর কিরণ শঙ্কর রায় রোডে, ইণ্ডাস্ট্রীয়াল্ ট্রাইবুনাল্ জজ্

মিঃ এস. দত্তর সঙ্গে, বাইশে ফেব্রুয়ারী সকাল এগারোটায় দেখা করার নির্দেশ। মানে, সেই নিউ-সেক্রেটারীয়েট্ বিল্ডিংস্! তলব কেন বাবা! আবার কেউ কাঠি করলেন নাকি? দেরী হয়ে যাচ্ছে। ওটা বাবাকে দিতে বলে, দ্বিতীয় চিঠিটা নিয়ে দৌড় লাগালাম। ডাউন বাসে জায়গা পেয়ে গেলাম। এবারে লণ্ডন থেকে কে আবার লিখল! চিঠিটা খুলে পড়তে পড়তে আতঙ্কে শিউরে উঠতে লাগলাম। নিঝুম হয়ে বসে থাকলাম। কতক্ষণ, বহুক্ষণ হবে? জানি না। যখন তন্ময়তা ভাঙল শুনতে পেলাম বাস আর এগোবে না। সামনে পুলিশের গুলি চলেছে। কোন ফ্যাক্টরীতে কি যেন হয়েছে। বাইরেটা দেখে, বাসের অবস্থানটা বুঝেই, একটা ঝাঁকুনি দিয়ে, বাস থেকে নেবে পড়লাম! দৌড়ে এগোচ্ছি। পাশের একটা সংকীর্ণ গলি থেকে একটা হাত এসে; আমাকে এক ঝট্‌কার টেনে নিল। কানন!

—'কি হয়েছে, কানন?'

—'আর বলবেন না। চুপ। এদিকে আসুন। আসুন। আপনি যাবেন না ওদিকে। আপনাকেই পুলিশ খুঁজছে।

—'কেন?'

—'জানি না। জিজ্ঞাসাবাদ করছিল আপনার সম্বন্ধে।'

—'ওদিককার খবর কি?'

—'দুজন শহীদ হয়েছে।' নিস্পৃহ কন্ঠ।

—'কি বলছটা কি?' চীৎকার করে ওর কলারটা চেপে ধরি।

—'ধীরে সাহেব। এই তো মর্য়াল্ দেখাবার মুহূর্ত।'

—'কে মারা গেছে?' মাটির দিকে শক্ত হয়ে তাকিয়ে প্রশ্নটা ঠেলে দিই।

—'কানু, শচীন।' সেই মানিক-জোড়। বট্‌ল্ আর লেবেলিং সেক্-শনের। রেশনের জন্যে দশটাকা চেয়েছিল!

—'কি করে হলো?'

—'যে করে হয়। ওরা বাধা দিতে গিস্‌লো। লরিটাকে বের হতে দেয় নি। পুলিশ রেডী-ই ছিল। গুলি চালাবে কেউ ভাবেনি। ও-পার্টির লোক আছে গাড়ীতে, দেখেছি।'

আমি এগিয়ে যাচ্ছি। কানন প্রাণপণে আমার হাতটা ধরে রেখেছে।

—'ওদিকে গেলে মরবেন। মাথা ঠাণ্ডা করুন।'

—'আমি বেঁচেই বা কি করব বল তো। আমি একটু আগেই যে খবর পেয়েছি, তাতে বুঝে গেছি কানন, আমার বেঁচে থাকার কোন মানে

৩৪

নেই। কাজ ফুরিয়ে গেছে। ছুটী।'

কাননের গায়ে দারুন শক্তি। ওকে ছাড়াতে না পেরে, ওর সাথেই বাধ্য ছেলের মত, অসংখ্য অলি-গলির মধ্য দিয়ে, অনেক অনাহারে ক্লিষ্ট বস্তির অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে, পথ করে করে হারা উদ্দেশ্যে চললাম। এর মধ্যেই হয়ত কানু-শচীনের পথ চেয়ে রয়েছে, ছোট ছোট ভাই বোন-গুলো। দুঃখী-মা—পঙ্গু বাবা। শচীন-কানু আর কোনদিন রেশন তুলে দেবে না।

একটা চায়ের দোকানের পেছনের একটা অপরিসর ঘরে, একটা তক্তপোষে বসিয়ে রেখে, কানন চলে যায়। বাড়ীতে পুলিশ নাকি যাবেই। কিন্তু কেন? ন্যায্য দাবী করাটা কি অপরাধ? আমি কেন ফেরারী আসামীর মত পালিয়ে বেড়াবো? দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ! কানন আমার জন্য ভাবে!

রাত নটায় ফিরেছি। গো গ্রাসে ভাত কটা গিলেছি। কখন বিছানায় শুয়েছি খেয়াল নেই। বাড়ীতে পুলিশের ভ্যান এসেছিল, সকাল এগারোটায় আবার দুপুর দুটোয়! মাকে কিছু বলার মত অবস্থা ছিলনা। ঘুম—ঘুম—ঘুম॥

অনেক রাতে মাকে ডেকে তুললাম। নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। বাবা ছুটলেন বলাই ডাক্তারকে কল দিতে। বুকে যেন বিরাট একটা পাথর চেপে বসে রয়েছে।

৭৭

বাবাকে নিয়ে, নিউ সেক্রেটারীয়েট্-এর সম্মুখে যখন ট্যাক্সিটা ছাড়লাম, তখন কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা। একতলার স্বল্পালোক করিডর ধরে এগোতে এগোতে ডানদিকে হঠাৎ-ই চোখে পড়ল, নেম্-প্লেট্টা। ভেতরে ঢুকে পেশকার বাবুকে বলতেই, উনি বেয়ারা-মারফৎ ভেতরে খবর দিলেন। মিঃ দত্তগুপ্তর পার্সোনাল চেম্বারে ডাক পড়ল। বাবাকে নিয়ে গিয়ে দেখি এপাশে মিঃ ভট্টাচার্যও বসে আছেন। এখানেই বোধহয় ও'দের ক্লেইম-কেসগুলোর ফাইন্যাল শেপ দেয়া হয়।

বাবাকে ইন্ট্রোডিউস করতেই মিঃ দত্তগুপ্ত বললেন, 'ও। আপনারা আজ যান, ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী এই সময় আসবেন।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ইতস্ততঃ করে বললাম, 'কেন ডাকছেন যদি বলে দেন।'

—'ও, হ্যাঁ। আপনাদের আর মহারাজার তো একই শেয়ার, তাতে, অনেক ডিস্‌ক্রিপেন্‌সিস্‌ দ্যাখা দিচ্ছে! আপনারা তো পরামর্শ করে কিছু করেন নি, না?'

বললাম, 'না। বাড়ীর সবার আলাদা, আলাদা ক্লেইম্‌ করা হয়েছে।'

—'মহারাজার ছেলে, মেঘবর্ণ মস্কো গেছেন, তাই আসতে পারেন নি। আপনাদের দু'জনকে আমরা একসাথে বসাতে চাই। উই ওয়ান্ট্‌ মহারাজা হিয়ার্‌।'

এ'রা এতো খবর রাখেন! কেমন একটা ভয়, দানা বেঁধে ওঠে। খবর রাখাটাই হয়তো স্বাভাবিক। দাদা ওপর তলার লোক। প্রাইম্‌ মিনিস্টার-এর সাথে ডিনার খান!

অসুস্থ দেহটাকে মনে মনে চাব্‌কে দিয়ে বল সঞ্চয় করে বললাম,

—'দেখুন, বাবা অসুস্থ। আজকে নিয়ে এসেছি, সেদিন যদি না আসতে পারেন, তাহলে তো আবার মুস্কিল হবে! বাবাকে যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে তো, আজই ছেড়ে দিলে ভাল হয়।'

—'আপনিই আসবেন! ইউ আর ইকোয়ালী কনভার্সেন্ট—' মিঃ ভট্টাচার্য ওপাশ থেকে বললেন।

বাবা হেসে বললেন, 'হি ইজ থরোলী কনভার্সেন্ট।'

হঠাৎ মিঃ দত্তগুপ্ত বলেই ফেললেন, আচ্ছা বসুন। আপনাদের কটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ক্ল্যারীফাই করে নি-ই।' মিঃ ভট্টাচার্যকে, মিঃ দত্তগুপ্তর পাশে একটা চেয়ার এনে দেয়া হলো। আমরা উল্টোদিকে পাশাপাশি দু'টো চেয়ারে বসলাম। স্বল্প পরিসর ঘর। মালিক পক্ষ আর শ্রমিক পক্ষকে ডেকে, এখানে মিটমাট করানো হয়। চট করে মনে হলো, সান্ত্বনাকে এখানে আসতে হবে না তো?

আমার ভিসুয়াল ফোল্ডারটা, আর মহারাজার ফাইলটা এলো। একসাথে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। এই ব'াধনটা ছাড়াতে পারলেই মুক্তি!

মিঃ দত্তগুপ্ত বললেন, 'আপনার এই কাজটা, আমাদের পাঁচ-ছ'জন পরিচিত লোকদের দেখিয়েছি। একটা ওয়ার্ক হয়েছে। এতো সুন্দরভাবে প্রতিটি ঘটনার সীরিয়্যাল ডক্যুমেন্ট দিয়েছেন যে বুঝতে কোন অসুবিধেই হয় না।'

মিঃ ভট্টাচার্য বললেন, 'এতো ডক্যুমেন্ট যোগাড় করলেন কি করে! আশ্চর্য!'

বাবা বললেন, 'ও-ই দিনের পর দিন, ন্যাশনাল লাইব্রেরী ঘে'টে, এগুলো বের করেছে। নইলে আমার পক্ষে এ অসাধ্য ছিল।'

মিঃ দত্তগুপ্ত ততক্ষণে ফাইল খুলে, দুটো এ্যাফিডাভিট পাশাপাশি রাখলেন। 'এই মৌজাটায় আপনি দিয়েছেন একশ চুয়াত্তর একর। অথচ মহারাজা দিয়েছেন, মাত্র আশি একর। এরকম কি হতে পারে?'

বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার আর মহারাজার তো সব কিছুই সমান?'

—'হ্যাঁ।' ঘাড় নাড়লেন বাবা।

—'তাহলে কারুর এটা ভুল হচ্ছে। প্রমাণ না করতে পারলে; কেটে দুটোই আশি একর করে দেব! এমন কি হতে পারে, এইটেতেই শুধু আপনার বেশী অংশ, মহারাজার কম?'

বাবা উত্তর দেবার আগেই আমি শরিকী হিন্টস ধরতে পেরে, লাফিয়ে জবাব দিলাম, 'না, না, মহারাজা ক্যান্নট হ্যাভ লেস। ইফ ইট ইজ নট ইকোয়্যাল, ইট ক্যান বী মোর?'

মিঃ দত্তগুপ্ত আমার দিকে স্নেহ-সুলভ হাসি হাসছেন।

মিঃ ভট্টাচার্য হঠাৎ বলে ফেললেন, 'সেইদিনও মার্ক করলাম। আজও দেখছি, আপনি খুব স্মার্ট। জমিদারের ঘরে এমন ইন্টেলিজেন্ট ছেলে, আগে দেখি নাই!' বাবা পাশে বসে ঘামছেন! ভট্টাচার্য মশাই আমায় প্রশংসা করতে গিয়ে, সমস্ত জমিদার রেস-কে ইনসাল্ট করে ফেললেন। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বললেন, ভেবে কথাটা বলেন নি। অবশ্য ও'কে-ও দোষ দেয়া যায় না। প্রতিদিন হিয়ারীং-এ বসে যাঁদের দেখছেন তাঁদের কাছ থেকে এমন অদ্ভুত সব কথা পাচ্ছেন আর শরিকী মনের প্রকাশ দেখছেন, তাতে জমিদারকুল সম্পর্কে ও'র ওই ধারণাটা হওয়াই স্বাভাবিক!

মিঃ দত্তগুপ্ত চট করে, অন্য টপিকে নিয়ে গেলেন, 'আচ্ছা, অন্য বাড়ীর শরিক: যেমন, মধ্যম তরফ, ছোট তরফ এদেরও কি আপনাদের সমান ফরেস্টই ছিল?'

বাবা কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিলেন। আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'এই কথাটার উত্তর না দেয়াই ভাল। মহারাজার কথার একটা দাম থাকবে।'

ও'রা সেটা মেনে নিলেন।

—'আপনার রীজার্ভড ফরেস্ট নিয়ে গোলমাল হচ্ছে। ওটা ভেস্টেড্ হয়ে গেছে বোধহয়।'

বললাম, 'এই দেখুন, এ্যাক্টটা আমি কিনে এনেছি, এর এই কটা সেকশনে দাগ দিয়ে রেখেছি, একটু পড়ে দেখুন। আই অ্যাম নট-এ ম্যান্ অব্ ল। তবে কমন্ সেন্স এ্যাপ্লাই করে মনে হয়, এটা ভেস্টেড হয় নি। আমাদেরই আছে। তাছাড়া মহারাজার স্যার এ্যাণ্ডারসনের

চিঠিটাও তো কন্‌ফার্ম করবে, এর এগেন্সটে আমরা কিছু টাকা পেতাম।'

—'নাঃ মহারাজা তো কোন ডক্যুমেন্ট-ই দেন নি। শুধু এ্যাফিড্যাভিটের ওপর বলে গেছেন।' মিঃ ভট্টাচার্যর কথা শুনে আমি থ!

দাদার এতো দামী দামী ডক্যুমেন্ট। সাবমিট-ই করলেন না? কেন? কি সুবিধে হলো তাতে? কিছুমাত্র বোধগম্য হলো না!

মিঃ দত্তগুপ্ত, মিঃ ভট্টাচার্য দুজনেই ব্রিটিশ আমলে পুব্‌বাংলা ঘুরে এসেছেন পোস্টিং নিয়ে। হয়তো ওদেশেরই লোক! বাবার সাথে ওদিককার তৎকালীন অবস্থা নিয়ে খানিক আলোচনার পর আমরা উঠলাম।

—'নেক্সট্‌ দিন-এ মহারাজার সাথে ডিস্‌কাস্‌ করে একেবারে আসবেন। দুজন একই আন্‌সার দেবেন। তাহলে কাজের সুবিধে হবে।' এর থেকে পরিষ্কার কথা আর কিছু হতে পারে না ও'দের নমস্কার করে বিদায় নেবো। উনি আবার বললেন, 'অনেক দেরী হয়ে গেল। আপনার কেস্‌টা তো আমরা ফাইন্যাল্‌ করে কবেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ ওই কেসটা আসাতে আর আরও একটা ইন্‌ফর্মেশন্‌ পাওয়াতে একটু বেশী করে স্ক্রুটিনি করতে হচ্ছে।' কি ইন্‌ফর্মেশন্‌ পেয়েছেন উনি? কেউ কি শেষবেলা, একটা শরিকীয়ানার শেষ ল্যাং এগ্‌জিবিট্‌ করেছেন?

৭৮

পার্টী থেকে ডেড্‌বডি নিয়ে প্রসেশন্‌ করতে চেয়েছিল, পুলিশ দেয় নি।

এমন একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য মালিকপক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। এবং নিহতদের পরিবারবর্গের হাতে কম্‌পেন্‌শেশনের টাকা তুলে দেওয়া হবে, বলা হয়েছে। সেলসের বেশীরভাগ ছেলে তাদের বস্‌শুদ্ধু কম্প্রোমাইজ করে নিয়েছে। দীননাথবাবু স্বয়ং ক্যাম্পে ঘুরে সবাইকার কাছে হাত জোড় করে কাজে জয়েন্‌ করতে রীকোয়েস্ট করেছেন। ফ্যাক্‌টরীর তালা খুলে দেয়া হয়েছে। পুলিশ-গার্ডে নয়জন কর্মী কাজে যোগদান করেছেন।

লজ্জা। হেরে যাওয়ার লজ্জায়, নিশ্চুপ বসে আছি গোলপার্কের ঘাসের ওপর। কানন, প্রলয় আর আমি। আমাদেরকে সাস্‌পেন্‌ড করা হয়েছে। ভীতি-প্রদর্শনের দ্বারা আমরা নাকি ওয়ার্কারদের এতোদিন কাজ করতে দিই-নি!

পার্টী তার নীতি পাল্টেছে। আমাদের কথা তারা নাকি আর ভাবতে

পারছে না। দু-ধার থেকেই পরিত্যক্ত হয়ে, দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। ছুটী!!

৭৯

জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ীতেই দাদার সাথে বৈঠক। ঘটনাটা বোঝালাম। বললাম, 'আপনার সাথেই বসতে চান ও'রা। অন্য শরিক বাড়ী সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'এইডা ওরা ক্যান্ চাইতাসে? আই হ্যাভ নো অথরীটি ট্যু স্পীক এ্যাবাউট মাই কো-শেয়ারার্স্। আমি কইতাম্ যাই কেনে?'

বললাম, 'আপনার কেসের সাথে, বাবার কেসটা ও'রা এক করে দেখছেন। তাতে অনেক ডিসক্রিপেন্সিস্ পাওয়া গেছে। তাই, পাশা-পাশি বসিয়ে কিছু প্রশ্ন করবেন ও'রা। যেমন আড়ংপাড়ার একশ আশি একর বাবার কিন্তু, আপনার ওটা আছে আশি একর।'

—'আমি বইতাম্-ই না! বইলেও কইবাম, আব্দুল পাকিস্তানে আসিল্ সে ইনফ্লুয়েন্স কইরা, গেজেটে ওইগুলাহ ছাপাইসে। একশ' আশির যে প্লটনম্বর-গুলাইন দিসে, সেই গুলাইন, প্রায় সবই আমার। সে নিজের নামে লেখাইয়া লইসে?' উনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন!

দাদা ঘরে এলেন। তাঁকে জ্যাঠামশাই-এর কথাটা বুঝিয়ে বললাম, 'সমস্ত আড়ংপাড়া মৌজাটা পাঁচশ' একর। বাবা যদি নিজের নামে লিখিয়েই নেবেন তাহলে পুরোটা না লিখিয়ে একশ' আশি একর লেখাবেন কেন? ওই প্লটগুলিতে কি পেট্রোলিয়াম পাওয়ার কথা, ডায়মণ্ড ছিল?' শান্ত কণ্ঠে কথাটা শেষ করি।

দাদা চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন, 'দেখ, রাজু, তুমি টাকা পাও, তাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এর জন্য আমি আর কোন হেল্প্ করতে পারতাম না।'

অবাক হয়ে বললাম, 'কোন্ হেল্পটা করলেন?'

দাদা বললেন, 'তোমার বাড়ীতে যখন গিয়া এ্যফিডাভিটের কপিটা চাইলাম, তোমরা দিলে তো না ই, দেখালেও না পর্যন্ত! অথচ, আবু কাকার কাছে যেতেই উনি সব খুলে দেখালেন: আমার কোন অসুবিধেই হয় নি!'

অবাক হলাম আরও, 'বলছেন কি দাদা? টিভোলি কোর্টে আপনি

যে ডায়েরীতে সব লিখে নিলেন, আমি বলে গেলাম। আবু কাকারটাতো আগাগোড়া ভুল। ওটা আপনি এ্যাফিডাভিটে তুলেছেন? কিন্তু; আপনার রীজার্ভড্ ফরেস্ট-এ দেখলাম, চল্লিশ লাখ টাকার ক্লেইম রয়েছে?'

—'হ্যাঁ, ওটা তুমি জোড় দিয়ে বলেছিলে বলে, তোমার কথামত লিখেছি।'

—'আর বাকীটা আবুকাকার মত? নষ্ট করে ফেললেন কেস্‌টা?' অনুশোচনায় মাটিতে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

—'নাঃ। তোমার এ্যাফিডাভিট্ যদি ঠিক থাকে, তুমি আগাইয়া যাও।'

হেসে বললাম, 'তা কখনো হয়? বাবা-জ্যাঠামশাই-এর এক ফিগার দেবে।'

দাদা বললেন, 'ডি পি.-কে আমি চিঠি লিখেছিলাম। আবুকাকার কেস নাম্বার দিয়া। রীকোয়েস্ট ছিল; আমাদের বাড়ীর একটা কেস্ টাকা পেয়ে গেছে। আমাকে আর হিয়ারীং-এ বসিও না। আমাকে ওই টাকা দিলে-ই আমি খুশী!'

—'এক লক্ষ পনের হাজার টাকা?'

—'হ্যাঁ। আর কি দরকার?'

—'ও। তাই, আবুকাকার স্টাইলে কেসটা করতে গেলেন? একটাও ডক্যুমেন্ট সাবমিট করেন নি?' কিছু না কেটে পুরো ক্লেমের ওয়ান-ফোর্থ পাওয়ার চেষ্টা।

—'না, না, তা-না।' অপ্রস্তুত হলেন দাদা।

জ্যাঠামশাই বের হয়ে গিস্‌লেন। আবার ঢুকে বললেন, 'আমি জানি, আবু-ও কইসে,—তার কাসে ডক্যুমেন্ট আসে। —আব্দুল যে টাউনের গেস্ট হাউসটা বেইচ্চা দিসে, এই খবরডা অনেক দিন হইলই পাইসি।'

বাবাকে চোর বানিয়ে দিলেন মহারাজা!

বললাম, 'আবুকাকা বা আপনারা যদি বিশ্বাস-ই করেন্ ওটা আপনার কোন কো-শেয়ারার বেচে দিয়েছে, তবে আপনারা দুজনেই সেটা, কাস্টোডিয়ানের আছে ক্লেইম করতে গেলেন কেন?'

গলার স্বর জীবনে এই প্রথম তুললাম। নিজের কানেই অবিশ্বাস্য লাগলো!

ননপ্লাসড হয়ে মহারাজা ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জন করে উঠলেন, 'দেখ, রাজু, তোমারে সোজাসুজি কইয়া দিতাসি, আমার একটা ইনফ্লুয়েন্স্ আসিল্, আইজ্-ও একটা স্টেটাস আসে। আমার পুত্র, মেঘুর-ও উঁচু-মহলে দারুণ ইনফ্লুয়েন্স। তারও স্টেটাস সে অর্জন করসে। তোমার

কেস-এর সগে এরে জড়াইও না। তোমার কেস ইজ এনটায়ারলি ডিফারেন্ট। ইট্ ইজ ব্যাকড বাই পেপারস! এ্যাণ্ড মাই কেস ইজ ব্যাকড বাই ইনফ্লুয়েন্স। তুমি আমাদের টাইন্‌নো না। আমরা তোমাদের লগে বইতাম না, আলাদা বইবাম।'

এই বৃদ্ধ, আমাকে জয়ী হতে আশীর্বাদ করতেন। সব মিথ্যে হয়ে গেল। স-ব! স্বার্থের সংঘাতে মানুষ এমন পাল্টে যায়?

ও'রা জজ্‌দের কাছে গিয়ে কি বলেছিলেন জানি না। ও'রা বের হয়ে যাবার অনেক পর, বারটা নাগাদ্ ঢুকলাম।

মিঃ ভট্টাচার্য ধমকে বললেন, 'আপনি দেরী করলেন কেন?'

মিঃ দত্তগুপ্ত রাগত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে।

জ্যাঠামশাইয়ের শেষ কথাটা কোট্ করে বললাম, 'মহারাজা আস্ক্‌ড মী নট ট্যু সীট উইথ দেম। এ্যাজ হি সেইড, হিজ কেস ইজ ব্যাকড বাই ইনফ্লুয়েন্স, এ্যাণ্ড মাইন ইজ বাই মেয়ার পেপারস ওনলী।'

ও'রা বুঝেই গিয়েছিলেন। তবুও সত্যতা যাচাই করলেন আর কি! আমার কথায় দু'জনেই দু'জনের দিকে দৃষ্টি মেলালেন। মিঃ ভট্টাচার্য চাপা গলায় বললেন, 'আপনার তো সা গেজেট নোটিফিকেশন আছে?'

ব্যস এর বেশী কিছু আর বললেন না।

সেদিন থেকেই হিয়ারীং শুরু হচ্ছে বোধহয়। মিঃ স্বামী বোম্বে থেকে এসে পৌঁছলেন। এখান থেকেই একসঙ্গে সবাই ও বাড়ী যাবেন।

আমাকে দেখেই বললেন, 'হাউ আর ইউ, হ্যাপী?' উনি বোধহয় ভেবেছিলেন, আমার টাকা এ্যালোট করে দিয়ে এসেছেন। আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই মিঃ দত্তগুপ্ত ছোট করে ব্যাপারটা বোঝালেন ও'কে।

মিঃ স্বামী বললেন, 'ওহ! দিস সোমেশ্বর-ফ্যামিলি ইজ কোয়ায়েট কনফিউজিফ হাউএভার, ইউ সেণ্ড ইট ট্যু মী। আই উইল সী ট্যু ইট।'

উনি একগাদা ফাইল নিয়ে এসেছেন। যাঁরা আগে কম টাকা পেয়েছেন তাঁরাই আবার শরিকদেরটা 'মোর-কম্প্রিহেনসিভ' হয়েছে বলে, 'কনসিডারেশন' চেয়েছেন। তাদের নিয়ে কি করা হবে তার মীটিং শুরু হয়ে যেতেই, আমি নমস্কার করে বিদায় নিলাম।

৮০

সমস্ত রাত দুঃস্বপ্ন দেখলাম। কাস্টোডিয়ান স্বয়ং চতুর্ভুজ বের করে আমায় কনগ্র্যাচুলেট করছেন! দু হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে বলছেন, 'ইউ

হ্যাভ ডান্‌নৃ ওয়েল, মাই বয় !' আর এক হাতে পিঠে মৃদু মন্দ চাপড় দিচ্ছেন। চতুর্থ হাতে, একটি 'সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া'র চেক্, আমার পশ্চাতে দাঁড়ানো হাসি মুখ, মেঘবর্ণ চৌধুরীর হাতে তুলে দিচ্ছেন।

৮১

সময় কত, বলা শক্ত। স্পেশ্যালিস্ট, রাউণ্ড দিয়ে যাবার পর, হাউজ্-স্টাফ্‌রা আর কেউ আসেন না। স্টাফ নার্স, ঘড়ি ধরে এসে চেক করে যান। গ্রাফ্ আঁকেন। যন্ত্রপাতিগুলো ঠিকমত কাজ করছে কিনা ঝুঁকে, ঝুঁকে দেখেন। তারপর গম্ভীর মুখে ফিরে যান।

কাঁচের শার্সী ভেদ করে মাঝে মাঝে এক একটা ছুটন্ত ট্যাক্সির আওয়াজ আছড়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়েও যায়। ঘরের ভেতরে ফুসফুস মেশিনটা চলছে, আর চলছি আমি! স্বাভাবিক টাইডাল ওয়েভ, অসম্ভব রকম কমে যাওয়ায়, এই ব্যবস্থা নিয়েছেন ডাক্তাররা।

বিনিদ্র মুহূর্তগুলো। কখনো হাপড়ের হা হা করা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবধান কমে যাওয়া, সে এক বৈপ্লবিক বিদ্রোহ। আবার কখনো পেথিডিন, মরফিনের মিলিত সকরুণ দয়ায়, আচ্ছন্ন, অব্যক্ত, কিছুটা তন্ময়তা। এরই ফাঁকে হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া বাইরের জগতের স্মৃতি রোমন্থন করে, সময় কাটে।

কতদিন বন্দী, মনে পড়ে না! মনে পড়ে সেদিন রাতটা! দুঃসহ নিঃশ্বাসের কষ্ট নিয়ে, টলতে টলতে উঠে, কোনরকমে তৃষিতের ফোন নাম্বারটা লিখে দিয়েছিলাম! তারপর কি করে হাসপাতালে এলাম, সেই রাতেই এসেছিলাম কিনা, এসব কিছুই মনে করতে পারছি না। যখন জ্ঞান হয়েছিল, তখন বুঝেছিলাম জায়গাটা অপারেশন থিয়েটার্। গলার কাছে ছোট্ট একটা অপারেশন করে লাঙ্-মেশিনের একটা টিউব্ আটকানো হচ্ছে। মুখে মাস্ক্ আঁটা, এ্যাপ্রন পড়া ডাক্তারদের কাউকেই চেনা মনে হয় নি। পরে বুঝেছি, তাঁদের একজন, ডাক্তার কোঙার, আর একজন পি কে সেন। বাকীদের আর দেখিনি এ ক্যাবিনে।

ওদের অস্পষ্ট কথাবার্তায় বুঝেছিলাম, অসুখটা, হচ্ছে নিউমোকোনিওসিস্! এ্যালভিওলাইজ, অর্থাৎ লাঙের এয়ার-পকেটগুলোতে ধূলো জমে অস্বাভাবিক ইনফেকশন হয়েছে! ডি-অক্সিজেনেটেড ব্লাড, ওই এ্যালভিওলাইজের মেমব্রেণে এসে, সহস্রবার মাথা খুঁড়েও এতটুকু অক্সিজেন পাচ্ছে না। ব্রঙ্কিউলস-এ যে টুকু কার্বন-ডাই-অক্সাইড এক্স্‌চেঞ্জ সম্ভব, সেটুকু পাঁচ হাজার সি সি রক্তের পক্ষে কিছুই নয়। এরকম হঠাৎ ধূলো থেকে ইন–

৩৫

ফেকশন কি করে হলো, ওদেরও জানা নেই। সন্দেহ করছেন, পুরোনো বাড়ীর দেয়াল থেকে, অথবা স্যাঁতা পড়া প্রাচীন পুঁথি থেকে, এরকম হতে পারে। সাধারণতঃ এ রোগ দেখা দেয় জুটমিল বা এ্যাসবেস্টস ফ্যাক্টির লেবারদের।

এম এস ডি-র স্টেরয়েড ইনজেকশনগুলোর অসম্ভব দাম। হাস-পাতাল থেকে দিচ্ছে, না বাবা কিনে দিচ্ছেন, জানিনা। বাড়ীতে কি করে চলছে দিন, জানিনা! মা-কে জিজ্ঞেসও করতে পারি না। মা-বাবাকে ক'দিন আগেও কাঁচের দরজার বাইরে থেকে, দেখতে দেওয়া হতো। এখন অবশ্য ঘরে অল্পক্ষণের জন্য আসতে দেয়া হয়, কিন্তু কথা বলা বারণ।

আমারও কথা বলার উপায় নেই। খাচ্ছি, তার টিউব আছে। বাতাস টানছি, তার টিউব আছে। যা ত্যাগ করছি তারও বোধহয় টিউব আছে দেখতে পাই না। কিছু প্রয়োজন হলে, কাগজে লিখে দিই। কষ্ট কিছু বাড়লে বা কমলেও লিখে দিই। ডান হাতের নাগালের কাছে একটা প্যাড আর পেন্সিল রাখা আছে।

বিকেল বেলাটা তবুও সময় কাটে। বাবা-মার মধ্যে অস্পষ্ট আলাপ-শুনতে পাই। তাতে বুঝতে চেষ্টা করি, সংসারের অবস্থাটা। আর আসে তৃষিৎ। ও সকালেও আসে। কাঁচের দরজার ওপার থেকে হাত নাড়ে। ইশারায় বোঝাতে চায় 'ঘাবড়াস না। ডাক্তার বলেছে তোর অবস্থা অনেক ভালোর দিকে—।' বিকেলে ও ঘরে আসে। মা বাবা এলে ও বাইরে চলে যায়। রোগীর ঘরে বেশী লোক থাকা নিষেধ।

৮২

মা-কেও ওই তৃষিতের কথাটাই বলি। যখন আকাশের বুক চিরে মানুষের করুণ মিনতি জেগে ওঠে। যখন দূরে থেকে ভেসে আসে আজান্‌-এর হৃদয়-ভাঙা উচ্ছ্বাস। তখন কেমন বুঝতে পারি, সূর্য অস্তাচলে গেল। কাজের মানুষ ঘরে ফিরল। জীবনের রঙ্‌ বদলালো। আর-ও একটা দিন, চলে গেল।

তখন বড় করুণ দেখায়, মায়ের মুখখানা। আশায় বুক বেঁধে বেঁধে, এতোগুলো বছর, মাস দিন ঘন্টা, মিনিট, ঠেলে, ঠেলে এসে, এখন বুঝি প্রতিটি সেকেণ্ডের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন মা!

বাবা মাথা নীচু করে যখন ধীরে বের হয়ে যান, আমি তখন প্যাডের কাগজে, একদম না দেখে, অভ্যস্ত হাতে মা-কে চিঠি লিখছি, 'কিছু

ভেবনা আম্মা। আমার এখন আগের মত কষ্ট নেই। আমি ভাল হয়ে যাব আব্বাকে একটু দেখ। আব্বার মনের জোর কম।'

মা চিঠিটা পড়ে বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। ও'র মনের কথাও আমি পড়তে পারি।

সবাই বোঝে, আমিও বুঝি। তবুও এতগুলো স্পেশ্যালিস্ট রোজ প্রবোধ দেন, 'ভালো হয়ে যাবে, চিন্তা নেই। এই আর আটচল্লিশ ঘণ্টা দেখি।' এমনি করেই অনেকগুলো আটচল্লিশ ঘণ্টা, তাদের পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে চলে।

আবার সন্ধ্যা নাবে। লাঙ্-মেশিনের ওঠা নামার সাথে তাল রাখে, আমার দুটো ফুস্ফুস্। পেথিডিন্-মরফিনের নীরব বন্ধুত্ব!

৮৩

সেদিন সত্যি-ই অনেকটা ভাল আছি। লাঙ্-মেশিনের সাহায্য ছাড়াই দম নিতে পারছি। অবশ্য নাকে অক্সিজেনের নলটা স্টিকিং প্লাস্টার দিয়ে ধরাই আছে। মা, বাবা, সীসটারের ভরসা পেয়ে একটু জোরেই কথা বলছেন। মুখে চোখে ক্লান্তি জয়ের আনন্দ। গলার ফুটোটা একেবারে বন্ধ করে দেয়া হয় নি। গজ্ দিয়ে, প্লাস্টার দিয়ে বন্ধ করা। খাচ্ছি মুখ দিয়ে। জিভে কি দারুণ স্বাদ!

একটু একটু কথাও বলছি। হ্যাঁ—না করে উত্তরই দিচ্ছি বেশী। —'তৃষিৎ এলো না কেন? বেচারীর ওপর সবচাইতে স্টেন্ গেছে।' মা বলছেন। 'আড়ালে দাঁড়িয়ে খালি কাঁদত। আমার সামনে কিছুতেই আসতো না। পাছে ধরা পড়ে যায়! ওর মত বন্ধু হয় না—রে।'

সত্যি! তৃষিৎটা এমন ছেলেমানুষ! আসলে, ও কবি তো! খুব ইমোশনাল্। তবু যাক, আমার জন্য কাঁদার একটা লোক পাওয়া গেল! ভাবতেও মজা লাগছে দারুণ! আসুক আজ-ও! আমি হাসছি দেখে, বাবাও হাসলেন।

বললেন, 'একটা কথা জিজ্ঞাস করি, ঘাড় নাইড়া উত্তর দে। তোরে কি কোন নার্সিং হোমে নিয়া যাইবাম্?'

চম্‌কে বললাম 'না, না। এখানে এত বিখ্যাত ডাক্তাররা সব দেখছেন। ও'রা ছাড়বেন কেন?' খরচের কথাটা আর তুললাম-ই না। ওইটুকু কথা বলতেই হাঁপ্ ধরে গেছে।

মা, তারপর অনেকদিন ফেলে আসা জীবনের মজার মজার কথা বলতে

লাগলেন। আমার মনটা প্রফুল্ল রাখাই উদ্দেশ্য।

—'তারার বিয়েতে, সেই পাহাড়ী মেয়েগুলো নাচ দেখাতে এসেছিল! তুই সেই লাফ দিয়ে গিয়ে ওদের সাথে নাচতে শুরু করেছিলি?'

সত্যি ভারী মজা হয়েছিল। লোকে কি বলবে ভেবে, মা আমাকে আড়ালে ডেকে কি বকুনি! যত বলি ওরা মেয়ে নয় ছেলে, মেয়ে সেজে এসেছে। মা বিশ্বাসই করেন নি! তারপর জিলিং নামে একটা পরিচিত ছেলেকে নাচের দল থেকে ধরে নিয়ে মায়ের সামনে দাঁড় করাতে, মার বিশ্বাস হলো!

—'তারা যখন পাল্কীতে চড়ে শ্বশুরবাড়ী রওয়ানা হবে! তোর কি কান্না! আমি আজও ভুলতে পারি না।' মা ছোট ছোট ঘটনগুলো মনে করাচ্ছেন, মা তো সারাক্ষণ ওগুলোই ভাবেন বসে বসে।

তারা, আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট হলেও, আমার একমাত্র খেলার সাথী ছিল। অথবা আরও ঠিক করে বলতে গেলে, খেলার পুতুল! আসলে, বাচ্চা মেয়েটা, বিয়ে হয়ে পরের বাড়ী কি করে থাকবে, এটাই আমার সবচাইতে কষ্টের কারণ হয়েছিল। আমার কান্না নিয়ে পরে সবাই আমাকে খুব ক্ষ্যাপাত ঠিকই। তারাবিবিও তার আড়াই বছর বয়সের অভ্যেস-বসে নাকটা তুলে, কুঁচকে বলতো, 'বোকা মেয়ে, কিচ্ছু জান না।' কথাটা ওকেই বলা হতো। কিন্তু পরে দেখা গেল, ও-ই বিশ্বশুদ্ধু সবাইকে ওই কথা বলে বোকাচ্ছে! বড় হয়েও। ওটা ওর লজ তখন!

মা, এতো তারাবিবির কথা বলছেন কেন? মন শঙ্কিত হয়ে উঠছে। নিজের অজান্তেই। সে কথা এ জন্মে আর মা-কে বলা হবে না। বাবাকে-ও না। ও'দের স্মৃতিতে তারাবিবি যেমন ছিল তেমনই থাকুক। কল্পনাটা ভেঙে দিতে পারি না! চিঠিটা, আমার স্যুটকেসের গোপন কোণে লুকিয়ে রেখেছি। যা জানি, সেটা না হয় আমার একারই থাকলো? আমার একান্ত নিজের।

দুশ্চিন্তাটা চট্ করে ঝেড়ে ফেলে দিই। গম্ভীর দেখলে, মা এখনই প্রশ্ন শুরু করবেন!

বাবা, মাকে প্রশ্ন করলেন, 'টাকাটা আইতে এতো দেরী হইতাসে কমল, যখন আইবো, তখন হয়তো আর দরকারই লাগ্‌তো না।' বাবা কেন অর্থে বললেন, বুঝলাম না। তবে সত্যিই দেরী হচ্ছে। জানাশোনার ভেতর আর কারো এতো দেরী হচ্ছে না। আবার কি হলো কে জানে! হঠাৎ মনে হতেই মাকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করে বললাম, 'তারা আমার

কাছে একটা বুবীর মালা চেয়েছিল, ছোটবেলায়—'

মা হেসে বললেন, 'টাকা, আসুক, তুই ওকে দিস্ ?

একটু ভেবে বললাম, 'যদিও না নেয়, ওর ছেলের বৌ-কে ওটা দি-ও কেমন !'

মা হেসে হেসে বললেন, 'নিশ্চয়ই সে ভারী মজার হবে !'

৮৪

তক্ষুণি উদ্বেগ মাখা মুখ নিয়ে ঘরে ঢুকলো, তৃষিৎ ! আমার প্রফুল্ল বদন দেখে কিছুটা স্বস্তি পেল যেন ! পেছন ফিরে কাকে যেন ভেতরে আসতে বলল। কাকাবাবু ! কেমন একটা বিহ্বল নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে, ধীর পদক্ষেপে, এগিয়ে এসে, আমার মাথার কাছে বসলেন। একটা লাল থলে থেকে, ছোট্ট একটা পাথরের পাত্র বের করে, তার থেকে চন্দন তুলে আমার কপালে লাগিয়ে দিতে দিতে বললেন,

—'রহিমীয়ার, ডাক খুব মন দিয়ে ডাক তাকে। যত কণ্টই হোক, বিস্মরণ হয়ো না যেন। কাল যে আমি শুনলাম, তুমি আকুল হয়ে ডাকছো ! আমি তার কাছে গিয়ে তোমার জন্যে প্রার্থনা করলাম যে। বললাম, 'ও তোমায় এতো করে ডাকছে, তুমি শুনতে পাচ্ছ না ?' মূর্তি যেন সরব হয়ে উঠল।' মূর্তি সরব হয়ে কি বলল, তা আর বললেন না কাকাবাবু। আমার বুকের ঠিক মাঝখানে আলতোভাবে ডান হাতটা রেখে জপ্ করতে লাগলেন বোধহয়।

আমি একেবারে লজ্জায় মরে যেতে থাকলাম। সেই কবে ওকে কথা দিয়েছিলাম ; আজ পর্যন্ত একবারও কৃষ্ণনাম নেয়া হয়নি ! সেই মুহূর্তে স্থির করলাম, যতক্ষণ একা থাকবো, ততক্ষণ কৃষ্ণনাম করবো। যতটা পারি কনসেন্ট্রেশন করেই নাম জপ্ করে যাব। এসব ঐশ্বরিক ব্যাপারে আমার কোন আস্থা নেই। তবুও আমি কাকাবাবুকে কথা দিয়েছি ! সত্যদ্রষ্টা ভক্ত মানুষ। হয়তো ঠিকই বুঝতে পেরে গেছেন, আমি ফাঁকি দিচ্ছি ! তাই আমার হয়ে কৃষ্ণনাম করতে এসেছেন। যতটা পরিশ্রম লাগব করে দিতে পারেন।

একটু পরে কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। মা-র দিকে চেয়ে বললেন,

—'কোন চিন্তা নেই দিদি, যা করার তিনিই করবেন।' আর দাঁড়ালেন না। বাইরে চলে গেলেন। তৃষিৎ যাবার আগে, চট্ করে আমার কাছে এসে আস্তে আস্তে বলল,

—'আজ বাবাকে পৌঁছে দিতে চলে যাচ্ছি। কাল রোব্‌বার সকালে আসবো। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে আরেকটু কাছে এসে হাতটা ধরে বলল, 'কাল সারারাত সমাধিস্থ ছিলেন, বাবা! সকালে আমি ঘুম থেকে উঠতেই বললেন 'তোর বন্ধু কেমন আছে, চল্ আমি একটু দেখে আসি।' যত বলি এখন দেখা করতে দেবে না, বিকেলে যাব খন। আমি বাইরে থেকে দেখে আসছি। শোনেন-ই না। পরে মা বলতে একটু শান্ত হলেন। তা-ও দুপুর থেকে রেডী হয়ে বসে আছেন, এখানে আসবেন।'

আমি একটু করুণ হেসে ওকে বিদায় দিলাম।

৮৫

আজান-ধ্বনি ভেসে আসতে থাকল। মা-বাবাও এখন চলে যাবেন। কাছেই বোধহয় কোথাও মস্‌জিদ আছে। যিনি আজান্ দেন, তাঁর কণ্ঠস্বরটি বড় মধুর। আজ যেন অন্যাদিনের চেয়ে অনেক স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

ঘরে সন্ধ্যা নাবতেই প্রথম উচ্চারণ করলাম, 'কৃষ্ণ।' তারপর দ্বিতীয়বার, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম……। কনসেনট্রেশন করতে রাধাকৃষ্ণের সেই যুগলমূর্তি, একই দেহে দুই রূপ, চোখের সামনে প্রতিভাত হলো। ভেসে উঠল দীপ্তিময় দু জোড়া চোখ আর সেই বাঁশি। ঘরের ভেতর সুরের মৃদু মৃদু পরশ। যেন, কোন অবচেতন মনের ধরে রাখা স্মৃতি!

কৃষ্ণ……কৃষ্ণ……করে প্রথমে গুণে যাচ্ছিলাম কড়ে। তাতে একাগ্রতার বাধা হতে সেটা ছাড়লাম।

স্পেশ্যালিস্ট্‌রা রাউণ্ড দিয়ে যাবার পর, স্টাফ্ নার্স তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক চেক্ শুরু করলেন। এইসময় রোজ কতগুলো ছুঁচ ফোঁড়া হয়। আজ হলো না। অব্‌জার্ভেশন এ আছি। সব কটা ড্রাগ বন্ধ।

মনটা একাগ্র করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আগে সেটা কখনও উপলব্ধি করার সুযোগ হয় নি।

বহুদিন পর ঘুমোলাম। নিশ্চিন্ত নিরুপোদ্রব নিদ্রা।

৮৬

ভোরের আলো ঘরে ঢুকতেই ঘুম ভাঙলো! ঘরে যেন চন্দন গন্ধ? কোথা থেকে আসছে এ গন্ধ?

আরও পরে তৃষিতের হাত ধরে বসে, বিছানায় হেলান দিয়ে কথা বলছি।

— 'ন্যাশনাল্ লাইব্রেরীর যে বইগুলোতে রক্তখনি দেখেছিলাম, তারা যে অমন বিষও বহন করতে পারে, সেটা ভাবিনি।'

তৃষিৎ হাসে বলে, 'শুধু তাই নয়, তুই ওইসব স্ট্রাইক্ নিয়ে, ভীষণ অত্যাচার করেছিস!'

বললাম, 'ঘরে এতো ধোঁয়া কেনরে?

ও অবাক হয়ে বলে, 'কোথায়! না তো! তোর কি নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে?'

বললাম, 'না। চোখে কেমন একটা হেজি ছায়া দেখছি। পেঁজা তুলোর মত।'

ও বলল, 'ডাক্তার রাউণ্ডে এলে বলিস তো। চোখের কোন ট্রাবল হতে পারে।'

বললাম, 'আজ রোববার না! আজ তো কেউ আসবেন-ই না। ডাকলে আসেন বোধহয়।'

দুপুর দুটোর সময় সিস্টারকে বললাম, 'আবার কষ্ট হচ্ছে কিছুক্ষণ হলো।'

—'ব্রীদিং ট্রাবল? এই সেরেছেন। দেখি, হাউজস্টাফকে খবর দিই।'

হাউজ-ফিজিশিয়ান এলেন আধঘণ্টা পর। ততক্ষণে কষ্টটা কয়েক ডিগ্রী বেড়ে গেছে।

লাঙ্ মেশিনের প্রয়োজনীয়তা হতে পারে ভেবেই, গলার ছিদ্রটা সেলাই করে দেয়া হয় নি! মেশিনটা যিনি অপারেট করেন, তাঁর ডিউটি আজ সন্ধ্যে ছ'টা থেকে। তাঁকে কোথাও ট্রেস করা যাচ্ছে না। স্পেশ্যালিস্টদের বাড়ীতে বাড়ীতে ফোন করে দেয়া হচ্ছে। তাঁরা ফিরলেই যেন পাঠিয়ে দেয়া হয়। ডাক্তারদের রবিবারটাই একমাত্র ছুটী তো।

৮৭

স্বাভাবিক এবং অনেক নিশ্চিন্ত এক-একটা মুখ নিয়ে, ক্যাবিনে ঢুকছেন, মা, বাবা এবং অবশেষে তৃষিৎ। আমি তখন অক্সিজেনের নলটা নাকে নিয়ে, বিছানায় বসে এপাশে-ওপাশে ছটফট করছি। হাপরের মত বুকটা উঠছে নাবছে। দারুণ কষ্ট বুকে। দু'পাশ থেকে আমায় ধরে রয়েছেন

দু'জন মমতাময়ী সিস্টার। এ কয়দিনে ও'রা আমার কত আত্মীয় হয়ে উঠেছেন। হাউজ্-স্টাফ্ ছেলেটি; দুটো পেথিডিন্ দিয়েও যখন আমায় শোয়াতে পারল না; তখন নার্ভাস্ মুখে একবার ঘরে ঢুকছে, লাঙ্-মেশিনটার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে, ছুটে ছুটে টেলিফোনের ঘরটায় চলে যাচ্ছে! বেচারী, একেবারে বাচ্চা, ছেলেটা!

এ দৃশ্য আজ দেখতে হবে, ও'রা কেউ ভাবেন নি। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সবাই তাকিয়ে আছেন।

মা আমার কাছে এসে বললেন, 'শুয়ে পড়্‌না আব্বা! বসে কষ্ট বেশী হচ্ছে তোর!'

অতি কষ্টে নীল হয়ে, অসাড় হয়ে যাওয়া ঠোঁট দুটোকে কন্ট্রোলে এনে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'শুলে, নাম নিতে ভুলে যাব আম্মা। কাকাবাবুকে কথা দিয়েছিলাম, —ক—ষ্ট হলেও নাম নেব ই।'

মা অবাক হয়ে বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বাবার চোখে জল! তৃষিৎ দেয়ালের দিকে তাকিয়ে। জানি ওর চোখেও জল।

মাকে ডেকে বললাম, 'আব্বাজানকে দেখ। — মনের জোর বড় কম!' মা আগের মতই তাকিয়ে থাকেন। ও'র মনের কথা বুঝতে পারি। মা মনে মনে বলছেন, 'আমাকে কার কাছে রেখে গেলি আব্বা; আমায় কে দেখবে?'

নর্থ ক্যাল্‌কাটা থেকে টেলিফোনে ডাক্তার সেন জানিয়েছেন, উনি আসছেন। দেরী হয়ে যাচ্ছে। সেটা বুঝতে পারছি। এতোদিন যুঝে, দেহটাও বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আর লড়তে পারছে না। সহস্র কোটি ছুঁচ্ বিঁধ্‌ছে ফুস্‌ফুসের প্রকোষ্ঠে। ক্লোরোফর্ম দিয়েও যদি অজ্ঞান করে দিত!

তৃষিৎ ছুটে বাইরে গেল! আজান্-দিয়ে উঠলেন ভক্ত মুসলমান। কি তার সুর! স্পষ্ট মনে হলো, সেই সাথে মুখর হলো বাঁশি। বসন্ত্ রাগ কি না এখন চিনতে পারছি না।

মা-ও শুনতে পাচ্ছেন, আজান্ ধ্বনি। আমার মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টি। দৃষ্টিটা যেন আমাকে ভেদ করে, কোথায় চলে গেছে!

ওই কষ্টের মধ্যেই মাকে বললাম, 'শুন্‌ছো—আম্মা—কে—কে বাঁ-শি বাজায়?'

মা জড়ানো কথাটা বুঝলেন কিনা জানি না, ঘাড় নাড়লেন। তখনই ঘরে ঢুকলো কারা! তৃষিৎ মাকে বলল, 'আপনাদের লোক বোধহয়

দেখুন।'

আমি ওদিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকাবার আগেই ঘরে ঢুকল বন্দনা! রাধা! আর, আর রুণা কুমার! ও এলো কেন? ওর তো আসার কথা নয়! পেছনে যেন কাকলিকেও দেখলাম। খেয়াল নেই।

৮৮

বিছানাটাকে খিম্‌চে ধরে রাখা হাতটার ওপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে রুণা! রাধা কাঁদছে? বন্দনা অবাক হয়ে দেখছে আমায়। আর বন্দনাকে অবাক হয়ে দেখছেন, মা! বন্দনার হাতটা সজোরে ধরে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছেন মা, আর সারা গায়ে হাত বোলাচ্ছেন!

বাবা মাটিতে বসে, বেডের একটা পায়া ধরে, কাঁদছেন! আর কোন দিকে মন দিতে পারছি না আমি। কোন শব্দ-ও কানে যাচ্ছে না আর। শুধু বাঁশি। শুধু আজান্ ধ্বনি।

৮৯

বাইরে কি ঝড় উঠল? কিসের একটা কল্লোলিত গর্জন? সেই সাথে মিশে গেছে বাঁশি আর আজানের ঐকতান। সেখানে বাঁশির ধ্বনি বা বা আজানের কোন তফাৎ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কি বুঝলেন কে জানে? ঘরের কোণে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন নমাজের ভঙ্গীতে। নীচের ঠোঁটটা থির্‌থির্ করে কাঁপছে। আজানের সাথে সুর মিলিয়ে আস্তে আস্তে মা তাঁর পুত্র-সন্তানের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা তুলে ধরছেন। নিশ্চল নিথর! চোখের ধোঁয়া ভাবটা আরও বেশী হলো!

দম্‌কা হাওয়ায় দরজাটা খুলে গেল। কে দাঁড়িয়ে!!? কোথায়, কিসের যন্ত্রণা? সব থেমে গেছে। নির্মূল হয়ে গেছে রোগ-ভোগ। অক্সিজেনের নলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, লাফিয়ে নাবলাম নীচে। দৌড়ে গেলাম দরজার দিকে।

—'একি রে, তারা? তুই! আম্মা—দেখ কে এসেছে।' মা তখনো ঈশ্বরের সাথে একাত্ম। কি আশ্চর্য, আমার চীৎকার শুনে কেউ তাকালো-ও না এদিকে। বাবা একইভাবে মাটিতে বসে।

হঠাৎ মনে হতে বললাম, 'জানিস, তোর শ্বশুরবাড়ীর লোকগুলো

কি-রে। 'লণ্ডন' থেকে তার ভাসুরপো চিঠি লিখেছে, জেনোসাইডের সময় তুই নাকি ঢাকায় ছিলি? তোকে নাকি ওরা মেরে ফেলেছে নৃশংস-ভাবে? কি আশ্চর্য সব খবর রটে দ্যাখ।'

সেই বিয়ে হয়ে যাওয়ার সময়কার চেহারা নিয়ে, তারাবিবি ঈষৎ নাকটা কোঁচকালো। কথা বলল না। যেন বলতে চায়, 'বোকা মেয়ে কিচ্ছু জানো না?'

বললাম, 'আয় ভেতরে। আমার তো ক'দিন খুব অসুখ ছিল—।' তাকিয়ে অবাক! আমার বিছানায় কার একটা দেহ? সাদা কাপড় দিয়ে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়ানো! কাছে গিয়ে দেখি হাতে একটা টিকিট! কে মারা গেল! কার শবদেহ এটা? টিকিটের নামটা নীচু হ'য়ে পড়তে গিয়ে চমকে উঠল'ম। আর্. আর্. চৌধুরী? বিকেল পাঁচটা পঞ্চাশ মিঃ? তারিখ, দুই দশ ছিয়াত্তর। কি কাণ্ড! কার নাম কার সাথে লাগিয়েছে দ্যাখো! সরকারী হাসপাতালের দুর্নাম লোকে করবে না কেন? আমার বাড়ীর লোক এখন হঠাৎ দেখলে, কি ভাবতো! যা তা একেবারে!

তারার দিকে তাকিয়ে, সে মা-কে, বাবাকে, গভীর করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। মুখটা কি করুণ দেখাচ্ছে! চোখাচোখি হতে ঈশারায় ডাকল। ও আমার আগে ঘর থেকে বের হলো। আমি অবাক! এতোদিন বাদে তারাবিবি ফিরে এলো, মা, বাবা কেউ তার সঙ্গে একটা কথাও বলল না! ও, কি রাগ করে চলে যাচ্ছে নাকি? ওকে ধরতে বাইরের করিডরে পা দিলাম। ও অনেকটা এগিয়ে গেছে।

ডাকলাম 'তারা, এই তারা।' ও পেছন ফিরে তাকিয়ে আঙুল নেড়ে ওকে অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করল।

সিঁড়ির বাঁকে দেখি, বিরাট ভারী ব্যাগটা হাতে চিন্তিত মাতুল, বিড়বিড় করতে করতে উঠছেন। আমার সাথে চোখাচোখি হলো। যেন চিনতেই পারলেন না। আমি যে ঘরটায় আছি, সে ঘরটায় ঢুকে গেলেন।

ও দিকে, তারা ব্যস্ত হয়ে ডাকছে। মাকে বলে আসা উচিত। কি করবো ভাবছি। তখনই কানে বেজে উঠল, সেই বাঁশি, আজান আর সমুদ্রকল্লোলের মিলিত ঐকতান।

তখন কেন জানিনা, সমস্ত কিছু মিথ্যা মনে হতে লাগল। কাউকে কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা, অবান্তর বলে মনে হলো। এ বিশ্ব সংসারের একটা মুখও মনের আয়নায় ভেসে উঠল না, যার প্রতি কোন দায়িত্ববোধ ছিল।

৯০

ফারাক্কা কালিম্পং, সিকিম, নাথুলা, চোখের পলকে পেঁৗছে গেলাম। আমার আশে পাশে, আর সামনে অসংখ্য অজস্র আলোক বুদ্বুদ্। আমারই সঙ্গে সঙ্গে ধেয়ে চলেছে।

কেউ গাঢ় নীল, কেউ ঈষৎ সবুজে। কারো আলো তীব্রতম, চোখ ধাঁধায়। কারো বা নিষ্প্রভ। এই বুদ্বুদের সমুদ্রে কি আমিও একটা ভাসমান আলোক-পিণ্ড। কে জানে। যাকে জিজ্ঞেস করা যেত, সেই তারাবিবি যে এখানে পেঁৗছে দিয়ে, কোথায় উধাও হয়ে গেল; তারও ঠিকানা করতে পারলাম না।

সকলের মাঝে থেকেও, একা একটা নিজস্ব সত্তা নিয়ে এগিয়ে চলেছি। নিস্তব্ধ নিঝুম, কোটি কোটি আলোকবর্ষ ধরে কোথায় যেন যাচ্ছি। যেতে হবে, সেটাই কথা। আর কিছু জানার নেই, আর কিছু জিজ্ঞাসা-ও নেই, এই অসীমতার সমুদ্রে।